

মতিউর রহমান মল্লিক
র•চ•না•ব•লী

৫ম খণ্ড

মতিউর রহমান মল্লিক রচনাবলী

৫



মতিউর রহমান মল্লিক রচনাবলী

পঞ্চম খণ্ড

দেশজ প্রকাশন

মতিউর রহমান মল্লিক রচনাবলী পঞ্চম খণ্ড

সম্পাদক

আবুল আসাদ

সম্পাদনা পরিষদ সদস্যবৃন্দ

ড. আ জ ম ওবায়দুল্লাহ

মোশাররফ হোসেন খান

সোলায়মান আহসান

তাফাজ্জল হোসাইন খান

সাইফুল্লাহ মানছুর

সাবিনা মল্লিক

কামরুন্নেসা মাকসুদা

ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ

নাসিম আল ইসলাম মাহিন

সহকারী সম্পাদক

আফসার নিজাম

ইয়াসিন মাহমুদ

প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর ২০২৪

গ্রন্থস্বত্ব : কবি পরিবার

প্রচ্ছদ : হামিদুল ইসলাম

প্রকাশক

মনোয়ারুল ইসলাম

দেশজ প্রকাশন, ক-১৫/২/এ, বি-১, (৩য় তলা),

জগন্নাথপুর, ভাটারা, ঢাকা-১২২৯

মোবাইল: ০১৭০৮১৬৯৩৩৮,

ই-মেইল : deshoz2017@gmail.com

ISBN : 978-984-98985-8-0

মূল্য : ৬২০/ (ছয়শত বিশ টাকা মাত্র)।

সম্পাদকের কথা

বর্তমান সেকুলার সভ্যতার অন্যতম জনক আর্নল্ড টয়েনবী বলেছেন, ‘জগতের মৌলিক মহৎ সৃষ্টি ও কাজ ঈশ্বরের ইশারা থেকে হয়’। একজন খুব বড় চিকিৎসক তাঁর মেটেরিয়া মেডিকায় বলছেন, ‘চিকিৎসা আমরা করি না, ঈশ্বর করেন। ঔষধ দিয়ে যাচ্ছি কোনো ফল হয় না। হঠাৎ একদিন মাথায় এসে নতুন চিন্তার উদয় হলো। ঔষধ দিলাম, রোগ চলে গেল। এই চিন্তা আমার নয়, ঈশ্বরের ইচ্ছা’। জগতের বিস্ময়কর সব মহৎ কর্মের ব্যাখ্যা এটাই। মহান আন্দোলন হোক, মহৎ মহাকাব্য হোক- সব মৌলিক চিন্তা ও সৃষ্টির পেছনে এবং মহৎ পরিবর্তনের মধ্যে থাকে দয়াময় আল্লাহর ইচ্ছা। বাংলা গানের জগতে মতিউর রহমান মল্লিকের রেনেসাঁর কথা যখন চিন্তা করি, তখন এটাই মনে হয় যে, বাংলা গানের এই রেনেসাঁ আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ইচ্ছা ও প্রেরণার ফল।

মল্লিকের লিখা গান, মল্লিকের গাওয়া গান বাংলা গানের চলমান ধারায় একটা বড় ঝড়, একটা বড় সয়লাব। কিন্তু এটা ধ্বংসের নয়, সৃষ্টির। বাংলা গানের চলমান ধারায় মল্লিকের গান নিয়ে আসে শক্তিমান ও সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা, লক্ষ্যকে করে সুনির্দিষ্ট। এই ক্ষেত্রে মতিউর রহমান মল্লিকের কোনো পূর্বসূরী নেই। মহাকবি কায়কোবাদের কাব্যে আমরা আজান শুনি, কিন্তু সেটা বিলাপের মতো। তা মসজিদের দরজা খোলে না, মুসলিম টানে না। দিকে দিকে পুনঃ জুলিয়া উঠিছে ধীন-ইসলামের লাল মশাল, ‘বাজিছে দামামা বাঁধরে আমামা শির উঁচু করি মুসলমান, ‘ধর্মের পথে শহীদ যাহারা আমরা সেই সে জাতি, ইত্যাদির মতো হাজারো যুগান্তকারী কথা আমরা মহাকবি নজরুলের কবিতা-কাব্যে পাই। এগুলো আমাদের জন্যে মূল্যবান পাথের, কিন্তু পথ আমরা পাই না, পথের ঠিকানা এখানে নেই। আধা-অন্ধকার সেই যুগে মহাকবি নজরুলের পক্ষে তা দেয়া সম্ভবও ছিল না। ইসলামের কবি মহাকবি ফররুখ তাঁর কাব্য-মহাকাব্য-কবিতায় হেরার রাজতোরণের স্বপ্ন দেখেছেন। চেয়েছেন সেই রাজতোরণের দিকে মুসলমানদের আবার নতুন অভিযাত্রা হোক। তাই তিনি ‘রঙীন মখমল দিন’ এর শেষ ঘোষণা করে ‘মাব্বি সিন্দাবাদ’কে ‘নতুন পানিতে’ সফরের জন্যে ‘হালখুলে’ দিতে বলেছেন। এখানে ফররুখ স্বাপ্নিক মহাকবি, বাস্তবের নায়ক তিনি নন। তিনি মঞ্চ পাননি, সামনে মানুষও পাননি। কিন্তু কবি মতিউর রহমান মল্লিক বাস্তবেরও নায়ক। তিনি গান লিখেছেন, সুর দিয়েছেন, আবার মঞ্চে তিনি তাঁর গানের গায়কও। তিনি স্বাপ্নিকমাত্র নন। তাঁর আহ্বান সুনির্দিষ্ট,

চাওয়া একেবারে সুস্পষ্ট। তাঁর গান দেশে ‘পূর্ণ ইসলামী সমাজ’ দাবি করে। বঞ্চিত মানবতার মুক্তির জন্যে ‘রাশেদার যুগ’ ফিরে পেতেও তাঁর গান উচ্চকণ্ঠ। সবার উপরে কবি মতিউর রহমান মল্লিক সৌভাগ্যবান যে, তাঁর অবর্তমানে তাঁর এই গানের পতাকা ভুলুপ্তি হইনি, ধারাবাহিকতা ধারণের জন্যে অব্যাহত পতাকাবাহীদের তিনি পেয়েছেন।

কবি রবীন্দ্রনাথ, কবি নজরুল, কবি ফররুখের মতো কবি মতিউর রহমান মল্লিকও গানের জগতে একজন যুগস্রষ্টা। সফল ও ক্রমবর্ধমান একটা নতুন ধারার তিনি জনক এবং এই ক্ষেত্রে তিনি কিছুটা অনন্যও। কবি নজরুল, কবি ফররুখ, গায়ক আব্বাস উদ্দিন মুসলিম জনতাকে যে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, যে জাগরণের বীজ তাঁদের মনে বপন করেছিলেন, সে জাগরণকে কবি মল্লিক ভাষা দিয়েছেন, পরিচয় দিয়েছেন, পথ-নির্দেশনা দিয়েছেন। একটা উপযুক্ত সময়ে, প্রয়োজনের মূল্যবান মুহূর্তে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের একটা ইচ্ছা তাঁর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর।

কবি রবীন্দ্রনাথ, কবি নজরুলদের বিশাল সাহিত্য-কর্মের মতো নয় কবি মতিউর রহমান মল্লিকের সাহিত্যকর্ম। তবে সংখ্যা দিয়ে সব সময় সাফল্য বিচার হয় না। ম্যাক্সিম গোর্কির এক ‘মা’ উপন্যাস রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ছিল মধ্যমণি। একটা গান, একটা কবিতা, এমনকি একটা কথাও বদলাতে পারে অনেক কিছুই।

অপরিণত বয়সে সবাইকে কাঁদিয়ে আমাদের মাঝ থেকে চলে গেছেন কবি মতিউর রহমান মল্লিক। এই যুগস্রষ্টা কবির সাহিত্য-কর্মকে সংগ্রহে আনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ উদ্যোগের ফল হিসেবে মতিউর রহমান মল্লিক রচনাবলী প্রকাশিত হলো। আমরা আশা করছি এতে মানুষের চাহিদা পূরণ হবে ইনশাআল্লাহ।

মল্লিক রচনাবলীর পঞ্চম খণ্ডে ২টি কবিতার বই— কবিতার মজলু, নন্দিত নদী; ১টি গানের বই— অশেষ সম্ভাবনার কুসুম; ১টি ছড়ার বই— লাল ফিতা; এবং ৪টি প্রবন্ধের বই— কুরআন ও হাদীসের আলোকে কবি ও কবিতা, ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলন রূপরেখা, ঘ্রাণ ও গৌরব, বাংলা সন : আমাদের ঐতিহ্য সংকলিত হয়েছে।

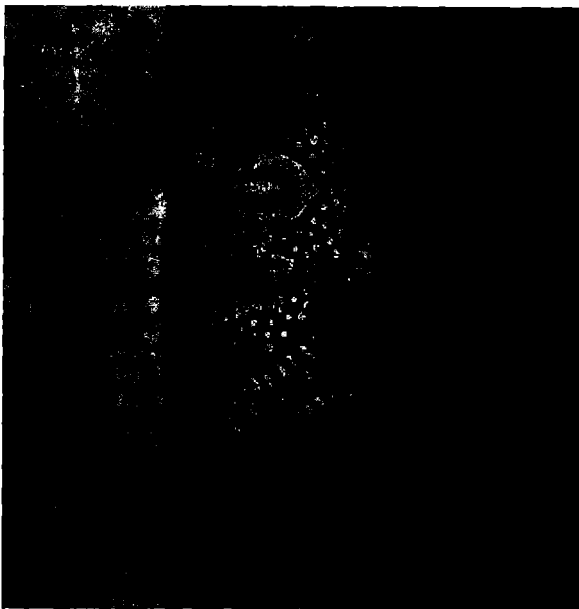
আবুল আসাদ

পঞ্চম খণ্ডে গ্রন্থিত বইসমূহ

কবিতার বই	
কবিতার মজলু	১১
নন্দিত নদী	৪৯
গানের বই	
অশেষ সম্ভাবনার কুসুম	৮১
ছড়ার বই	
লাল ফিতা	১১৭
প্রবন্ধ	
কুরআন ও হাদীসের আলোকে কবি ও কবিতা	১৪৯
ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের রূপরেখা	১৮৯
ভ্রাণ ও গৌরব	২৪৯
বাংলা সন : আমাদের ঐতিহ্য	৩৪৩

কবিতার মজলু

[অসংগঠিত]



কবিতায়
মত্তনু

মতিউর রহমান মল্লিক

প্রসঙ্গ কথা

‘কবিতার মজলু’ কবি মতিউর রহমান মল্লিকের একটি অসম্পূর্ণ কবিতার পাণ্ডুলিপি। এ পাণ্ডুলিপির অধিকাংশ কবিতা শুভেচ্ছা জ্ঞাপনমূলক। বিভিন্ন কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পীদের নিয়েই মূলত লেখা। অন্যান্য কিছু কবিতাও রয়েছে। অধিকাংশ কবিতা কবির জীবদ্দশায় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও স্মারক-সংকলনে প্রকাশিত হয়। আর কিছু লেখা কবির ডায়েরিতে সংরক্ষিত ছিল। পাণ্ডুলিপিটির প্রচ্ছদ এঁকেছেন আফসার নিজাম।

সূচিপত্র

তোমার অভাবে অলস ছন্দ/ ১৭
মহাকবি ইকবাল/ ১৯
শেষাবধি নজরুল/ ২০
ফররুখ আহমদ কবি/ ২১
সাজ্জাদ হোসাইন খান/ ২২
কবিতার মতো নাম/ ২৩
হে পাখি আমার ভাই/ ২৪
আসাদ বিন হাফিজ/ ২৫
কালের ফলকে হোক চির অক্ষয়/ ২৬
জাকিরের বিয়ে/ ২৭
আজমের নাম/ ২৮
শিমুল আগুন এবং ভাষার উচ্চায়/ ২৯
তোমাদের মতো/ ৩০
হেমন্ত/ ৩২
স্বচ্ছতা/ ৩৩
পবিত্রতা/ ৩৪
প্রেম/ ৩৭
বাংলাদেশের মানুষ আমি/ ৩৮
বড় করো অন্তর আকাশের মত/ ৩৯
এই অবরোধ/ ৪০
সাধারণ পদ্য/ ৪৩
আন্তরার মানে/ ৪৪
এক হৃদে/ ৪৬
কখনো জীবন যেন/ ৪৭

তোমার অভাবে অলস ছন্দ

[বিশ্বকবি আল্লামা ইকবালকে নিবেদিত]

তোমার অভাবে অলস ছন্দ

কবিতায় গানে-গানে

ছন্দিত হতো অনন্তকাল

প্রাচ্যের প্রাণে-প্রাণে

পৃথিবীর কানে-কানে।

আঙ্গিক ভরা গতির প্রবাহ

ভাবের বিজলি-দীপ্ত প্রদাহ

তুমিই এনেছো স্বপ্নের দেশে

তীক্ষ্ণ তুলির টানে।

খুদীর তীব্র কষাঘাতে তুমি

ভীকুচেতনার মূল পটভূমি

তছনছ করে দিয়েছো তাপস-

কোরানের কল্যাণে।

ইব্রাহীমের অস্ত্র দুহাতে

তুলে নিয়েছিলে আঁধারের রাতে

আলোকের মতো আলোকিত এক

জীবনের সন্ধানে।

তোমার অভাবে একত্ববাদ-

প্রাচ্যকল্যায় হতো না আবাদ;

হয়তো হতো না সত্যের চাম

কাব্যের সামাদানে।

তুমি চেয়েছিলে মুক্ত-স্বাধীন
একটি স্বদেশ- যেখানে সুদিন
সমাগত হবে সাম্য মৈত্রী
ঐক্যের আহ্বানে ।

পরধীনতার কষ্ট তোমাকে
করেছিল বিষদষ্ট তোমাকে-
সেই জ্বালা, সেই কষ্টের গান
গেয়ে গেছে সবখানে ।

আকাশের পরে আকাশ রচনা-
করতে করেছে তুমি উল্লনা
বলেছো যে দিতে দিগন্তে হানা
শাহীনের সাম্পানে ।

তুমি যা দেখেছো ওগো মহাত্মা;
আর কোনো কবি দেখেনি তো তা
তাই চেয়ে রয় সকল দৃষ্টি
তোমার দৃষ্টি পানে ।

বিশ্বকবির মর্যাদা তাই
বিশ্ব জগৎ দিয়েছে সদাই
হে কবি তোমায়- আজো দিয়ে যায়
সতত সসম্মানে ।

মহাকবি ইকবাল

জ্ঞানের পরিধি তুমিই ব্যাপ্ত করেছিলে
মেধার আঁধার দূর করবার দৃঢ়তায় ।
সূক্ষ্ম নিগূঢ় মাটি ও আকাশ পড়েছিলে;
কেবল চাওনি ঢুকে থাক জাতি মৃঢ়তায় ।

পূব-পশ্চিম তোমার দু'চোখে স্বচ্ছতায়
ধরা দিয়েছিলো আরেক নতুন নির্দেশে ।
সম্ভাবনার গাঢ় অভিধান রচনায়
তুমি ছিলে, আছো, আজো তাই সব পরিবেশে ।

পরকীয়া প্রেম তোমার মগজ কুরে কুরে
খায়নি যেমন খায় জড়বাদী ঘৃণ সবি ।
নিজেকে চিনেই চিনেছো পৃথিবী ঘুরে ঘুরে;
ছদ্মবেশের আড়াল চাওনি মহাকবি ।

তুমি দিগন্ত দূর নীলিমার পথরেখা
প্রজ্বলন্ত হৃদয়ে হৃদয়ে রও লেখা ।

শেষাবধি নজরুল

শেষাবধি নজরুল ছাড়া আর কে থাকে যুবক !

যৌবনের জমিদারী সাজে না তাই নাম
লেখায় পল্টনে এবং আশ্চর্য ঠিক
তখনই সৈনিকের ভেতর থেকে
স্বাধীনতা বলে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে
আরেক সৈনিক ।

বৈশাখ এবং বৈশাখের যুদ্ধংদেহী কলাকৌশল জানতেন নজরুলই
কিভাবে জ্বলে উঠতে হয়- দারিদ্র্যই শিখিয়েছিলো তাকে ।
নোবেলের চেয়ে জনগণের জন্যেই
অধিকতর প্রবাহিত হতে ভালোবাসতেন তিনি ।

আর দেখো, শোষকের সপক্ষে তাঁর কোনো পঙ্ক্তি নেই
স্বরলিপি নেই ।

সুতরাং নজরুল ছাড়া কে আর থাকতে পারলো
খাপখোলা তলোয়ার !

শেষাবধি নজরুল আগুনের মতো শুদ্ধতম বলেই
কিছু কিছু পদলেহী লতাপাতা
কিছু কিছু অঙ্ককার কীট পতঙ্গ
তাঁর বিরুদ্ধে শনিবারের চিঠির মতো লেগে থাকলো
লেগেই থাকলো ।

ফররুখ আহমদ কবি

অধিকাংশ সুসংবদ্ধতায় গলানো যৌনতা
এবং কবিতায় প্রায়ই গুঁড়িখানার রং;
বরং খসে পড়ে প্রগাঢ় পবিত্রতার কথকতা
অথবা নেশা আর ঘোরের মধ্যে প্রতিভার সন্ত !

তাছাড়া লালসার দুহাতে ধরা কাব্যের লাগাম;
লোল পড়ে নপুংস কবিতার আড়ালে কবির
ধুরন্ধর জিহ্বার; পিশাচের চেয়ে আগাম !
এবং মুদ্রার কাছে বেঁচে দেয় অস্তিত্বের নীড় ।

তাছাড়া হিংসার মেধায় জ্বালে কেমন নীকাশ-
লেখার ইম্পাত কেবল কয়েক শাণিত আঙুলে
অখাদ্য সবাই আর, অনিহিত সবার বিকাশ;
কারো আর কলম নেই- বলিতেছে লেঙুড় তুলে ।

বিভেদের জাল পেতে ঘোলা করে পানি আর নদী
কলহের কদর্য পতাকা হাতে বাইরে ও ভেতরে
কোনো-কোনো-কথা, কোনো-কোনো-কাব্য চলে নিরবধি
আর চলে শিকড়ের গোড়া কাটা খুব জোরে-শোরে ।

এই এক নিশ্চিন্দ আঁধারে বাক্যহীন বেদনায়,
এই এক ঐক্যহীন লক্ষ্যহীন নিস্তর্র সময়ে,
এই এক নিশ্চিত নির্দিষ্ট উদ্ধারের যজ্ঞণায়,
এই এক অপূর্ণ-অপরিপক্ক-উদ্ধত বলয়ে;

সম্মুখে দাঁড়ান এসে ফররুখ আহমদ কবি:
সাত সাগরের মাঝি এক তীব্রতায় তীক্ষ্ণতায় ।
পশ্চাতেই পড়ে থাকে দীর্ঘশ্বাস, অপাঙ্ক্তয়ে ছবি-
জেগে ওঠে দুরন্ত দুঃসাহস দুঃসহ যাত্রায় ।

সাজ্জাদ হোসাইন খান

শুধু কবি নন তিনি সত্য সাধক,
আলোয় আলোয় ভরা অন্তরলোক,
মিথ্যার সাথে তার নেইকো আপোষ-
চলনে-বলনে নন্ ছাপোষ-ছাপোষ ।

আত্মার বিনিময়ে স্বার্থের কাছে,
বেচেননি আপনারে কোনো উচ্ছ্বাসে,
লেখক গড়ার কাজ তাঁর কাছে দামী
যদিও বোঝে না তা বহু দামী নামী ।

যেমন চেহারা তাঁর ছিমছাম বড়,
তেমনি লেখায় খুব ধার খরতর,
ছন্দে ছন্দে তাঁর ভোরের পাখী
পাতার আড়াল ছেড়ে করে ডাকাডাকি ।

এসো তার লেখা পড়ি দিয়ে মনোযোগ,
মুক্ত মেথার কিছু করি বিনিয়োগ,
আর দেই তাঁর হাতে ফুলের তোড়া,
গলায় মালাও দেই জোড়ায় জোড়া ।

কবিতার মতো নাম

কবিতার মতো নাম আবদুল হাই
শিকদার-বিপ্লব ও কুলজিনামা
বহু দিগ-দিগন্ত যেখানে অথৈ
বহু প্রতিভার গাঢ় সাগর একাই।

কবিতার মতো নাম আবদুল হাই
অসম সাহস তাঁর মাথা থেকে পাও
ইতিহাস ধরে রাখে কালের কপোল
কবি এক- কবিদের মহান নেতাও।

কবিতার মতো নাম আবদুল হাই
বড় কবি তারপর ভাব ও ভাষার
তারপর বাগ্মী ও অমর কথক
কথামালা: শাস্ত্র সোনার সেলাই।

কবিতার মতো নাম আবদুল হাই
কবি সব দশকের; আশির রাজাই।

হে পাখি আমার ভাই

হিজল বনের হে পাখি আমার ভাই
হিজলের বনে সব আছে তুমি নাই
হলদে ডানার বিহঙ্গ ওগো তুমি
তুমি উড়ে গেছো পার হয়ে, মরুভূমি।

অভিমানী ভাই, বৃকের ভেতরে সব
জ্বালা-যজ্ঞগা চেপে রেখে, উৎসব
করে গেছো হায়! বাইরে বাইরে প্রিয়
তোমার তুলনা তুমিই; অতুলনীয়।

অভিমানী ভাই, অভিমান করে গেলে
সব ভালোবাসা-প্রণয় পেছনে ফেলে
কবি ফররুখ এভাবেই একা একা
বিদায় নিলেন লিখে রেখে শেষ লেখা।

হিজল বনের হে পাখি গায়ক পাখি
স্মরণে তোমার ভিজে ওঠে কেনো আঁখি।

আসাদ বিন হাফিজ

শিশুসাহিত্যে আমাদের কালে	সেই সেরা
নানাবৃক্ষের ছন্দের তালে	সেই সেরা
বিচিত্র কূট-কৌশলী-চালে	সেই সেরা
মিষ্টি কি ঝালে তালে কি বেতালে	সেই সেরা

ইসলামী কবি নামের খিতাবে	সেই সেরা
প্রকাশিত যতো বই ও কিতাবে	সেই সেরা
কড়া-গুয়ার জটিল হিসাবে	সেই সেরা
তেজারতিতেও জানি না কিভাবে	সেই সেরা

সংসার-বউ সুখ-সৌরভে	সেই সেরা
পরিবারগত গুণ-গৌরবে	সেই সেরা
দলিল-পর্চা-কলা-কৌশলতে	সেই সেরা
ছেলে-মেয়ে আর ধনে-দৌলতে	সেই সেরা

লাজে কি অলাজে কাজে কি অকাজে	সেই সেরা
শিশুসাহিত্যে আমাদের মাঝে	সেই সেরা

কালের ফলকে হোক চির অক্ষয়

[মোহাম্মদ আবদুল মান্নান পরম শ্রদ্ধেয়]

আমি তাঁর কাছে ঋণী ।
আমি ছাত্রের মতো- শিক্ষক তিনি ।
আমি ইতিহাস পাঠের প্রেরণা-স্বাদ
তাঁর বই পড়ে পেয়েছি- দু'হাতে চাঁদ ।
চিনেছি স্বদেশ, জাতিকে চিনেছি আরো;
আলোয় ভরেছে এ-মন অধিকতর ।

আমি তাঁরে চিনি, চিনি-
পরম যত্নে বিলান সম্মীবনী
অর্ধমৃত চেতনা ও নিঃশ্বাসে-
প্রগাঢ় সাধনা, প্রজ্ঞা ও বিশ্বাসে ।
পড়ার ধৈর্যে, লেখার ধৈর্যে তাঁর
উপমা বিরল- গাঢ় সহিষ্ণুতার !

তাঁর নদী নিরবধি
দিয়ে যায় শ্রোত-পলিমাটি-বোধ-বোধি
অথবা ফসল ফলানোর মৌসুম,
নয়ালী প্রেরণা : ভাঙাতে মরণ ঘুম,
সংবিস্তার কড়া নাড়ানোর গতি,
পদলেহনের কঠোর অসম্মতি ।

তাঁর সব সঞ্চয়-
কালের ফলকে হোক চির অক্ষয়;
ভাটি বাংলার মানুষেরা চিনে নিক
জাতিসত্তার দূর-দিগন্ত-দিক,
ঐতিহ্যের সোনালী রেখা ও বাঁক,
বাংলাদেশের মধুময় মৌ-চাক ।

তাঁর সব সঞ্চয়-
কালের ফলকে হোক চির অক্ষয় ।

জাকিরের বিয়ে

আকাশে নতুন চাঁদ, তারাদের নিয়ে,
কানে-কানে কথা কয়, 'জাকিরের বিয়ে'।
বাতাসেও সে-খবর ছড়িয়েছে খুব-
কনে নাকি সুন্দরী রূপে অপরূপ।

রূপের সঙ্গে থাক গুণের বহর,
দু-জনই খুঁজে পাক সুখের নহর-
সুখের নহর মানে খোদার রহম,
খোদার পথেই আছে অশেষ করম।
খোদা তুমি সাথী থাকো কবি জাকিরের,
সাথী থাকো জাকিরের আওয়াল-আখিরের,
এই দোয়া জাকিরের বিয়ের দিনে,
হৃদয়ের দাম দিয়ে দিলাম কিনে।

আজমের নাম

আরো সুন্দর করে আজমের নাম
কি করে যে রাখা যায়
কি ভাবে যে আঁকা যায়
ভাবতে ভাবতে দেখি ছুটে গেছে ঘাম !

একবার ভাবি- আলী আজম তো বেশ
এই নামে পরিচিত হোক শেষমেষ
এই নামে লিখে আরো করুক সুনাম ।

আলী আজমের আগে লাগালে আবিদ
খুব ভালো হয়- সাড়া দেয় যে আহুদ'-
আলী বাদ দিতে গেলে কম্ব তামাম !

আবার ভেবেছি আমি- আফজাল হোক
আলী আজমের আগে আরেক আলোক
সারলো না মন তবু, গেলো না আরাম ।

আবিদ আজম এই মনোরম নাম
শেষে আলী আজমের নাম রাখলাম-
এই নাম সকলের হোক সারগাম ।

শিমুল আগুন এবং ভাষার উচ্চারণ

যে ভাষার টানে মানুষ হয়েছে আগুন
আগুন হয়েছে মিছিলের লেলিহান
লেলিহান খুঁজে এনেছে বজ্র-প্রপাত ।

সে ভাষার টানে হৃদয় হয়েছে শিমুল
শিমুল হয়েছে শহীদের লাল জামা
জামায় মেখেছে বাংলা ভাষার শোণিত ।

যে ভাষার টানে স্বপ্ন হয়েছে স্বদেশ
স্বদেশ হয়েছে কালোঁড়া জবানের
জবান হয়েছে লড়াইয়ের পরিষেক ।

সে ভাষার টানে বুক খুলে আজ দাঁড়াই ।

তোমাদের মতো

আকাশের সাথে তুলনা দিলাম,
লুকালো সুদূরে নুয়ে;
তুলনা দিলাম সাগরের সাথে,
মাটিতে পড়লো শুয়ে!
ভাবলাম যেই আসলে সে ঠিক
পাহাড়ের বিশালতা,
বোবা হয়ে গেল জনমের মতো—
হারালো চঞ্চলতা।
উপমা খুঁজতে সূর্যের কাছে
বিকেলের দিকে গেলে,
রাতের আড়ালে পালালো চালাক
চাঁদকে একাকী ফেলে।
গহীন বনানী তোলপাড় করে
মিল খুঁজে খুঁজে শেষে,
দাঁড়ালাম দিগ দিগন্ত হারা
ফসলের মাঠে এসে।
নদী ছুঁয়ে আসা হাওর হেঁয়ালী—
কানে কানে এসে বলেঃ
মরু-মাণ্ডুপি পার হয়ে যাও—
পারস্য দেশে চলে,
সেখানে অনেক পুষ্পের সাথে
মিলিয়ে বুলিয়ে দেখ,
যদি তুলনার পাও কিছু তবে
কবিতায় বেঁধে রেখ।
ভোরের সততা মুখে মেখে মেখে
তেহরান থেকে সরে,
দামাভান্দের গোলাব বাগানে
পৌছলাম অকাতরে।

ফুলে ফুলে চুমু খেতে খেতে মরি!
 ঠোটে ধরে গেল জ্বালা;
 সহসা সে এক ওলি এসে বলেঃ
 পালা, একখনি পালা।
 কোথায় পালাই? পালাবো কোথায়
 সিরাজেই অবশেষে;
 স্বপ্নের কিছু কারুকাজ করে
 সাদীর সুমুখে এসে
 দাঁড়লাম যেই, অমনি সাধক
 মহাকবি মহাকাশ,
 থাপড়িয়ে পিঠ হেসে বললেন:
 'দৃঢ় করো বিশ্বাস
 কথা আছে, আছে, শুনে নাও ছেলে
 কবিতার মজনুন;
 বোস্তাপ্রেমিক; তারপর কোরো
 রাত দিন গুনগুন'
 এই শেখ সাদী হয়েছে অমর
 তাঁর প্রেমে ডুবে ডুবে,
 তাই এই নাম মুখে মুখে ফেরে
 পশ্চিম থেকে পূবে।
 রাসূলের সাথে তুলনা খুঁজছো,
 সমতটী নাবালক?
 বাউরী বাউল ঘোরাঘুরি সার
 আকাশ পাতাল ঝাঁক।
 প্রিয় দোস্ত মোর নিজের তুলনা
 নিজেই দিয়েছে শোন:
 "তোমাদের মত মানুষ আমি তো
 নই যে অন্য কোন।"

হেমন্ত

ভেসেছে হেমন্ত

এসেছে বসন্ত

রঙে রঙে ভরে যায় সারাদেশ

সবার কণ্ঠে নামে গানের জোয়ার

সবখানে ছড়ালো গো সুরের আবেশ ।।

পুষ্পের কি বিপুল আজ সমারোহ

বাসন্তী দিয়ে যায় বিপুল আবহ

কোকিল ছড়িয়ে দিলো নতুন আমেজ ।।

ছন্দে ছন্দে দোলে মন-অন্তর

আনন্দ জড়ালো গো পথ-প্রান্তর ।

ভ্রমরের গুণগুণ গুঞ্জরণের

কবিতা ভরিয়ে দিলো কুঞ্জবনের

নিবিড় নীড়ের ছায়া, বীথিকা আশেষ ।।

স্বচ্ছতা

ব্যক্তিজীবনে স্বচ্ছতা আনে বৃত্তির গতিধারা
সংসারে আনে সুখমার মতো যুগল জ্যোতির পাড়া

সারা সমাজের আঙ্কুজগৎ হাতে-হাত-কাঁধে-কাঁধে
সমৃদ্ধির পথে পথে আনে নওজোয়ার অবাধ

সৌহার্দ্যের তাসনীম ঢালে আদালতে-দফতরে
হৃদয়ের গাঢ় কেনাকাটা হয় পণ্যের ঘরে-ঘরে

এই স্বচ্ছতা রাজনৈতিক আকাশে যে পারাবত
অর্থনীতির অলিগলি জুড়ে স্বস্তির আশ্রয়

স্বচ্ছতা সব সত্যতার চির সঙ্গত পরিণাম
সব মানুষের প্রার্থিত যতো সংহত সম্মান ।

পবিত্রতা

এক.

পাক-সাফ লোকদের আল্লাহ তায়াল্লা
গলায় পরিয়ে দেন আছার মালা ।
হাদীস শরীফে আছে ঠিকমতো আঁকা
“ঈমানের অর্ধেক পাক-সাফ থাকা ।”

অর্থাৎ আত্মার পাক আধাআধি,
বাকী আধা দেহ পাক-নির্দেশ আদি ।
শিরক-কুফুরী থেকে পূত আত্মার-
সেই সাথে চরিত্র পূত থাকে যার-

নেই তার তুলনা যে, উপমা যে তার;
এমন মানুষ চায় ঘর সংসার ।

দুই.

ঘুম থেকে উঠে হাত ধুয়ে নেয়া ছাড়া
পানির ভেতরে হাত যাবে নাতো দেয়া
কোরবে না প্রশাব গোসলখানায়
এই বাজে কাজ একেবারে না-মানায়

এই কাজ কোরবে না কখনো দাঁড়িয়ে
মনে মনে দোয়া পড়ে শয়তান তাড়িয়ে
এই কাজ কোরবে না পথের উপরে
কোরবে না খাল-নদী-ছায়ার উদরে

এই কাজ কোরবে না মাথা খালি রেখে
টুপি বা কাপড় দিয়ে মাথা নেবে ঢেকে
টয়লেটে যেতে গিয়ে দোয়া পড়ে নাও
আর তুমি সাবধানে দাও বাম পাও

সামনে-পেছনে রেখে কাবাঘর হায়
সারবে না প্রাকৃতিক তাড়নার দায়
প্রাকৃতিক প্রয়োজন শেষ হলে ভাই
মাটি বা সাবান দিয়ে হাত ধোয়া চাই

প্রাকৃতিক বেগ নিয়ে খাবেনারে বাপ
ডান হাতে কোরবে না কভু নাক সাফ
কারোর সামনে নাক খোটা ছেড়ে দাও
দরকার হলে পরে আবডালে যাও

ডান হাতে সর্বদা খাবার গ্রহণ
করে থাকে ভালো লোক জ্ঞানী গুণীজন
সাফ কথা রসূলের-বাম হাতে খেও না
তাঁর পথরেখা থেকে কভু সরে যেও না

মুখের ভেতরে রেখে খাবারের দলা
কথা কওয়া ঠিক নয়, ঠিক নয় বলা
গাল ভরা পান নিয়ে কথা বিশেষত
মুখোমুখি লোকদের করে বিস্কৃত

রাত্রে শোবার আগে দাঁত মাজা যায়
দাঁত মাজো নিয়মিত সকাল বেলায়
ওজু করো ভালোমত দিয়ে মনোযোগ
সর্বদা বা-ওজুর নাও উদ্যোগ

হাঁচি দাও মুখে চেপে রুমাল বা হাত
আল্‌হামদু-ও পড়ো সাথে আলবাৎ
চুল কাটো, নখ কাটো ঠিক ঠিক মতো
জীবন যাপনে হও সর্বোন্নত

নিয়মিত গোসলের করো অভ্যাস
ভালো তেল দিয়ে চুল করো বিন্যাস
তারপর পাক-সাফ পোশাকটা পরো
সুগন্ধি লাগানোর ব্যবস্থা করো ।

তিন.

যার আছে বুকভরা ঈমানের আলো
পাক থেকে চাইবে সে আপনার ভালো
পাক-সাফ থাকা এক আমানতদারী
রসূলের নির্দেশ ভুলতে কি পারি

ইসলামী নিয়মের হয়ে অনুসারি
জীবন-সাগর-সাত যদি দেই পাড়ি
সফল হবোই হবো সন্দেহ নেই
সময় থাকতে তাই এসো সকলেই॥

শ্ৰেয়

অবৈধ শ্ৰেয় তুমি কৰবে না
এই শ্ৰেয় জ্বালা আনে
যাতনা সে দেয় প্ৰাণে
ভুল কৰে ভুল পথ ধৰবে না ।

বাংলাদেশের মানুষ আমি

বাংলাদেশের মানুষ আমি
আমি বাংলাদেশী
মনের ভেতর নেইরে আমার
হিংসা রেষারেষি

সত্যের দিকে শক্তির দিকে
সাম্যের দিকে স্বপ্নের দিকে
মোদের নিমন্ত্রণ
মোরা চাই আলোর উদ্বোধন।

বড় করো অস্তর আকাশের মতো

বড় করো অস্তর আকাশের মতো:

যাবতীয় কাজ সেটা হোক না ফরজ,

খুব ভালোভাবে করা সত্যি সহজ

হবে যে ততো ।

ছোট লোক বড় কাজে রাখতে পারে না অবদান,

বাড়ে না কখনো তার মর্যাদা-মান-সম্মান,

সাগর বিশাল বলে তার বুকে খেলা করে

পাহাড়ের মতো মহা

চেউয়েরা যতো ।

বিশ্বশ্রেমিক যদি হতে পারো তুমি,

সবাই তোমার হবে

তোমার সঙ্গে রবে

বিজয়ের সব আবহাওয়া মৌসুমী ।

কুয়োর ভেতরে তিমি বাড়তে পারে না কোনোদিন,

গহবরে ওঠে নারে- সূর্য ওঠে না অমলিন,

গোবরে পদ্মফুল কথার কথাই শুধু

তুমি কি জানো না তা যে

কল্প কতো !

এই অবরোধ

এই অবরোধে আকাশ পেয়েছে হিংসার কালো ধোঁয়া,
অনেক অমোঘ জীবন গিয়েছে এই অবরোধে খোঁয়া,
অরণ্যে আর আরণ্যলোক বুঝি পেয়ে গেছে জয়;
গলিয়ে কোথাও গেছে সভ্যতা- জেগেছে অবক্ষয়!
রাষ্ট্রের উঁচু পাহাড় চূড়ায় মেঘকালো সংশয়
চুকিয়ে দিয়েছে অবরোধবাদ, বিষাক্ত সঞ্চয়!
এই সঞ্চয়ে কতো বিদ্বেষ, জিঘাংসা হায়! কত-
দেশের প্রকৃত নায়িকা-নায়ক বোঝেন তা অন্তত।
এই অবরোধে জনতা পেয়েছে ধ্বংসের ইঙ্গিত,
পেয়েছে জনতা- একটি পক্ষ জনতার বিপরীত।

এই অবরোধ বাহানা মাত্র, ওপরে ওঠার সিঁড়ি,
গদি প্রান্তির কূটকৌশল, রাজনীতি বিচ্ছিরি!
এই অবরোধ অন্য গ্রহের, অন্যের নির্দেশে-
গৃহযুদ্ধের আগুন জ্বালাতে অসাম্প্রদায়িক দেশে।

এই প্রজন্ম শিখলো হিংস্র বাড়াবাড়ি অহরহ,
মূল্যবোধের হলো বাহকেরা অশেষ অগ্নিদহ!
দুশ্চিন্তার গড়ালো পাহাড় মাটি-মানুষের কাঁধে,
নিয়ম-নীতিও সংবিধানের সঙ্গে এখন কাঁদে।

নির্বাচনের ভালো ফলাফল হবে না যাদের, তারা-
এই অবরোধ দিয়ে পথে নেমে মানুষ করিছে তাড়া!
এদের নিকটে জনসাধারণ ভেড়ার পালের মতো-
প্রয়োজন- শেষে ছোঁড়া জঞ্জাল; ছড়ানো ইতস্তত।

আমাদের পাখি উড়ে গিয়ে যতো সঙ্গীত গেয়েছিলো,
বিদেশের কাছে দেশ যতোটুকু সম্মান পেয়েছিলো,
ধূলায় লুটালো সব অর্জন, অজ্ঞান যতো পাওয়া-
ধূলায় লুটালো সব সঙ্গীত, সকল পাখির গাওয়া!

বর্ষশেষের সঙ্কীর্ণতা চলে তিমিরাচলের দিকে,
আজ আলোকিত প্রকৃতি যতো হয় ক্রমাগত ফিকে,
জাতির মৌল মেরুদণ্ডের হাড় ভেঙে ফেলে কারা?
সবহারা এই জাতিরে আবার কারা করে সবহারা!

অঙ্গ এদের এইখানে আর অন্তর আরখানে
অন্যখানের মূল অভিধান লুকিয়ে রেখেছে প্রাণে;
নিজের ঘরের খেয়ে-পরে এরা অন্য বাড়ির গান
গাইতে অধিক মজা খুঁজে পায়, গলা ছেড়ে মেরে টান।

সর্বনাশের অস্ত্র উঁচিয়ে এ কোন্ চক্র যায়?
হাটে ও বাজারে আগুন লাগাতে হায়না-বক্র পায়!
সচল শিল্প-কল-কারখানা বন্ধ করতে হায়!
উৎপাদনের দু-ধারী দৃষ্টি অন্ধ করতে চায়,
উৎকর্ষের সমস্ত দ্বার- সকল উন্মতির-
বদলে চাইছে লগুভগু প্রলয় ক্ষয়ক্ষতির!

স্বচ্ছ-প্রতিভা-সুস্থ-মেধাবী-মননশীলের চোখ
বিস্মিত হয়ে আজ দেখে শুধু অনভিপ্রেত জোক!
এ-কোন্ জগৎ, এ-কোন্ সমাজ, সভ্যতা আধুনিক?
কোন্ জনপদে বসবাস করে কোটি কোটি নাগরিক!

অবরোধ মানে ভাঙচুর নাকি মারামারি কাটাকাটি?
ইচ্ছে মতোন গণভক্তের নাম দিয়ে লাঠালাঠি?
অবরোধ মানে লগি-বৈঠার দানবীয় তাণ্ডব?
লাশের সঙ্গে হিন্দার ন্যায় নৃশংস উৎসব?

অবরোধ মানে বেচ্ছাচারের বাণিজ্য রমরমা !
অবরোধ মানে হাসপাতালের রোগীরা পাবে না ক্ষমা?
অবরোধ মানে পথের নিরীহ পথিক পাবে না মাপ?
স্বাধীন দেশের রাস্তায় আজ গাড়িও চালানো পাপ?
অবরোধ মানে গাড়ির ভেতরে শিশুও পাবে না ঠাই?
অবরোধ মানে বিদেশী প্রভুর আনাগোনা টের পাই!

এই অবরোধ অবরোধ কারো আজাদীর নিষ্ঠায়,
এই অবরোধ অবরোধ করো সত্য প্রতিষ্ঠায়,
এই অবরোধ অবরোধ করো ন্যায়ের দণ্ড হাতে,
এই অবরোধ অবরোধ করো দেশবাসী আছে সাথে-

আল্লা' আছেন সাথে...
আল্লা' আছেন সাথে...
আল্লা' আছেন সাথে...

সাধারণ পদ্য

চ্যানেলগুলো

চ্যানেলগুলো কি শিখায়

দশ-বারো-মন ঘি শিখায়

চ্যানেলগুলো কি বিলায়

ফাজিল হবার ধী বিলায়

চ্যানেলগুলো কি দেখায়

বেশীর ভাগই ছি দেখায়

চ্যানেলগুলো কি জিগায়

নষ্ট হইছেন নি জিগায়

চ্যানেলগুলো কি মিলায়

জাহান্নামের ফি মিলায়

এখন তাহলে কী করা

ইসলামী চ্যানেল-ই- করা ।

আস্তরার মানে

এক.

আস্তরার মানে হোসেনের উজ্জয়
বন্দী আত্মা পাখি হয়ে যাওয়া
অথবা আকাশে সাহসী উড়াল
মেঘের ওপারে নীলিমার গতিবিধি
সকালের দিকে রক্তিম উদ্ধার
কলঙ্কের কবুতর হয়ে যাওয়া
নীড়ের ভেতরে ডাহকের গান
ভেঙে ভেঙে যায় সীমানার শেষ
অবৈধ বাধা সব
যেনো বয়ে যায় মৃত্যুর তীরে জীবনের উৎসব
প্রতি বুকে নামে চেতনার সঞ্চয়
আস্তরার মানে হোসেনের উজ্জয় ।

দুই.

আস্তরার মানে এজিদের পরাজয়
অস্ত-কালোর ধ্বংস সুনিশ্চয়
উৎপীড়িতের উত্থান-বেলা আস্তরার মহাকাল
আস্তরার দিনে পুড়ে শেষ হয় মিথ্যার জঙ্ঘাল ।

তিন.

আস্তরার মানে হোসেনের পথ, হোসেনের কোরবানী
এই হোসেনের পথেই এসেছে ত্যাগের মহিমা জানি
এসেছে বিপ্লব, খোমেনীও
এসেছে আবুল আ'লা
আমেরিকা আর কুফুরীবাদের
এটাই আসল জ্বালা
জ্বালা আফগান

তুরান ইরান
বীর কাশ্মীর : বিপুল মুসলমান : বিশ্বাসী অফুরান
পুতুলপূজারী মুশরিক তাই হয়রান পেরেশান
যেনো আজাজিল ক্ষিপ্ত-ক্ষুব্ধ আশাহত হতমান
আন্তরার দিন পালিয়ে বেড়ায়
অভিশাপে হতাশায়
বেঈমান শয়তান
আন্তরার মানে বেদনার পথ পাড়ি দিয়ে চলা
প্রশান্ত মঞ্জিলে
সদলে সকলে মিলে
শহীদের ময়দানে
দ্বন্দ্ব ও সম্মানে ।

চার.

আন্তরার মানে কারাবালা কারবালা
আন্তরার দিনে বেড়ে ওঠে কাবা-কাবার বৃক্ষ
রসূলের প্রাণ- হোসেনের ডালপালা । ।

এক হৃদে

আমীর-ফকির এক হয়ে যায় যে- হৃদে
আয় না সবাই এক হয়ে যাই সে- ঈদে
এক থাকি সব এমনি করে জীবন ভর
যাই ভুলে যাই উঁচু-নিচু, আপন-পর ।

কখনো জীবন যেনো

কখনো জীবন যেনো অনন্ত বোঝা এক
রোলাধরা বৃক্ষের ছায়াও
পড়ে থাকে আঁধারের মতো
শুয়ে থাকে বিব্রত শাট বনে অথৈ অসাড়

সকালের মানে হয় না
সন্ধ্যার মানে হয় না
সময়ের মানে হয় না
বসে থাকে গতির গমক
নিভে যায় লক্ষের ধ্রুব
নির্গিত নীলিমার সমস্ত রেখা
নিকটের মানে হয় না
সুদূরের মানে হয় না
স্বপ্নের মানে হয় না

জীবনের প্রশ্বাস নেই যেনো কখনো
পঁচে পঁচে গলে যাওয়া লাশের মতোন
কবরের নিশ্চল নিখর খেয়ায়
পড়ে থাকে কঙ্কাল-রঙ-রস-স্বাদহীন একা
কর্মেরা কথা বলে নাকো
ঘর্মের মেলে নাকো ঘর
কর্মীরও হাতে ধরা দেয় না হরিণ
কষ্টের কালো কাল থমকে দাঁড়ায় যেনো
প্রভাতের প্রহরের সরে না পাথর
ছোটো না চতুর্দিকে আলোর এলান
শিশিরের শব্দেরা গান হয় নাকো
ঘাসেরা পায় না ঝুঁজে পান্নার দিন
হাওয়াও কয় না কথা পাখির মতোন ।

কখনো জীবন যেনো অনন্ত বোঝা এক
রোলাধরা বৃক্ষের ছায়াও
পড়ে থাকে আঁধারের মতো
শুয়ে থাকে বিব্রত শাট বনে অথৈ অসাড় ।

ନନ୍ଦିତ ନଦୀ

[ଅଗ୍ରହିତ]

মতিউর রহমান মল্লিক

বর্জিত বাঁদী



প্রসঙ্গ কথা

‘নন্দিত নদী’ কবি মতিউর রহমান মল্লিকের একটি অস্বাভাবিক কবিতার পাণ্ডুলিপি। এ পাণ্ডুলিপির অধিকাংশ কবিতা কবির জীবদ্দশায় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও স্মারক-সংকলনে প্রকাশিত হয়। বিশেষ করে প্রেক্ষণ, কিশোরকণ্ঠ, মাসিক নির্ঝর ও সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত ‘সমুদ্রের ঘ্রাণ’ স্মারকে। কবি আফসার নিজামের কাছে সংরক্ষিত কবির ডায়েরি থেকে প্রাপ্ত লেখা নিয়ে এই পাণ্ডুলিপিটি প্রস্তুত করা হয়। পাণ্ডুলিপিটির প্রচ্ছদ এঁকেছেন হাশেম আলী।

সূচিপত্র

গুরু/ ৫৪

ভাষাতত্ত্ব/ ৫৫

আমার একটা নদী ছিলো/ ৫৭

ফলক কবিতা/ ৫৮

দেশ বিকানোর কড়চা/ ৬০

সেঙ্গ/ ৬১

আদব যথোচিত/ ৬২

খাদ/ ৬৩

ব্যক্তিত্ব/ ৬৫

আপনার দিকে/ ৬৬

ইব্রাহীমের কোরবানী ছিলো/ ৬৮

বুশ যুদ্ধে জয়ী হতে পারবে না/ ৬৯

যেমন গাছ/ ৭০

নারীদের গান/ ৭১

শরৎ এলো ধানের ক্ষেতে/ ৭২

ঈদের কথা/ ৭৩

বাঘ সহসা দু-গাল চাটে চাটুক না/ ৭৪

উদ্ধত মন উপলব্ধির পত্র কি লেখে না/ ৭৫

বিজয়ের অনিশেষ সুখ/ ৭৬

ঈদের রাতে/ ৭৭

ক্রুশ/ ৭৮

চলো যাই চলো সেন্টমার্টিন/ ৭৯

জন্ম মাসে/ ৮০

শুরু

তরলিত চন্দ্রিত একদিন শুরু করে দেয় বলে
সে-নারীদের উপমার মতো
নন্দিত নদী হয়ে যায়
এবং সাত সমুদ্রের বিশালতার মতো দূলে দূলে ওঠে
অথবা তারো আগে
মৃত্তিকার বুক-পাতা-ভালোবাসায়
সে-ভিজিয়ে নিয়েছিলো নিজস্ব গতি ও গন্তব্যের গৌরব
অথবা উদ্দাম বাতাসের গুঞ্জন মেখে সে-
ঝাঁকঝাঁক বলাকা হয়ে যায়

অর্থাৎ বীজ শুরু করে দেয় বলে বৃক্ষ হয়ে যায়
বৃক্ষ শুরু করে দেয় বলে অমিতাভ অরণ্য হয়ে যায়
অরণ্য শুরু করে দেয় বলে মেঘমালা হয়ে যায়
মেঘমালা শুরু করে দেয় বলে
মহাকাশের মত অপরিহার্য হয়ে যায়
এবং একটা শিশির-সম্পৃক্ত সূর্য নিয়মিত শুরু করে দেয় বলে
সময়ের চেয়েও গভীর-গহীন
মহাকালের ইতিহাস হয়ে যায় ।

একটা প্রজাপতিও সময়মতো শুরু করে দেয় বলে
বইয়ের পৃষ্ঠার মতো তরঙ্গ হয়ে যায় এবং
পাখি হয়ে যায় ফুল
ফুল হয়ে যায় পাখি ।

আমরা সময় মতো শুরু করতে পারি না বলে
না হতে পারি পাখি
না হতে পারি ফুল
না হতে পারি নদী
না হতে পারি মহীরুহ কিম্বা মহাকাশ
না হতে পারি সমুদ্র কিম্বা মহাকালের ইতিহাস ।

ভাষাতত্ত্ব

বাসে ট্রেনে চলে নাকো ভাই-ভাইয়া
কম পরিবারে আছে আব্বা-বাজান
চাচা বুঝি যায় যায় হারিয়ে কোথাও
খালা-ফুফু-মামীরাও পালান পালান ।

সাহেব সে কতোদিন কে জানে থাকেন
সোনামনি সোনা পাখি ধীরে ধীরে হাওয়া
মন বলে কেবলই পানি থাকবে না
মেহমান ছাড়া ঠিক চলে খাওয়া-দাওয়া ।

বিস্মিল্লাহ দিয়ে কাজ শুরু কই
এলাহী ভরসা বলে চিঠি লেখে কে
খোদা হাফেজের শেষে হয় না তো শেষ
সালামের দিনগুলি যায় ফুরিয়ে ।

বরং এখন দিন অন্য রকম
দাদা-বাবা-আফ্কেল-আন্টির বোল
মশাই-বাবু ও জল গেস্ট সেই সাথে
গড-গুড মর্নিং-নাইটের চল ।

এইসব কাজে নেই জুড়ি মিডিয়ার
কিছু কিছু এনজিও এগিয়ে আরো
পা চাটা বুদ্ধিজীবী খাটে দিন-রাত
কিভাবে বাজানো যায় কৃষ্টির বারো ।

কিভাবে সাজানো যায় ভারতের নাও
কিভাবে বসানো যায় বিশ্বের চাকু
বুকে-পিঠে-পাঁজরায় ঐতিহ্যের
যাতে খুব খুশি হয় দাদা আর কাকু ।

কথিত মুসলমান জিকির-বয়ান
নিয়ে আছে মশগুল, ছেড়েছে ফিকির
ভীষণ ব্যস্ত কেউ ফতোয়া নিয়ে
আর বাদবাকী করে ইকির-মিকির ।

জাতি যাক গোপ্পায় তাতে কার কি
কৃষ্টি তমদ্দুন ছিহ্ ছিহ্ ছি ।

আমার একটা নদী ছিলো

আমার একটা নদী ছিলো

উদ্ভিন্ন নদী

উদ্ধত ভঙ্গীর নদী

এখন সেই নদীর ওপর

মরুভূমির উদ্ভাবন শুরু হয়ে গেছে

এবং কে বা কারা যেনো

প্রত্যহ সেই নদীর

পানি প্রত্যাহার ষড়যন্ত্র করে বেড়াচ্ছে

ব্রাহ্মণ্যবাদ এবং ব্রাহ্মণ্যবাদীদের

শ্যেন দৃষ্টির প্রসন্নতায়

সেই উদ্ধত নদীর গম্ভব্যে

এখন কারা যেনো

প্রাচীর তুলে দেবার কাজে

অধিকতর ব্যস্ত হয়ে পড়েছে

ফলক কবিতা

এক.

কিছু কিছু মানুষের মেজাজ গরম
কথায় কথায় খুব ফটেং ফটেং
রাত নেই দিন নেই চটেং চটেং
উদ্ধত উদ্ভট উগ্র চরম

কিছু কিছু লোক ঠিক উল্টা
ধরে ফেলে আপনার ভুলটা ।

দুই.

কিছু কিছু লোক আছে খুঁতখুঁতে খুব
মারে টান মূল ধরে
অন্যের ভুল ধরে
বাঁকা- দেখা চোখ দুটো কুতকুতে খুব

কিছু কিছু লোক আছে ঠিক বিপরীত
আপনার কাজ নিয়ে কর্মাকরিত ।

তিন.

কিছু কিছু মানুষের মুখ ধারালো
গালাগালি শুধু নয়
খোটা দিয়ে কথা কয়
জাত ভুলে হাত নিতে খুব ঝাড়ালো

কিছু কিছু লোক ঠিক অন্য রকম
ভেতর বাহির জুড়ে শুধু সংযম ।

চার.

কিছু কিছু মানুষের প্রতিভাই সব
ঐটুকু বাদ দিলে সব পচা শব
চরিত্র বলে কিছু নেই
আগা-মাথা-পেশ-পিছু নেই
আচার কি আচরণে পশু ও পাশব

কিছু কিছু লোক ঠিকই ভিন্ন
প্রতিভা ও স্বভাবে অনন্য ।

পাঁচ.

কিছু কিছু মানুষের টাকার দেমাগ
তার কাছে একাকার ফাল্গুন-মাঘ
দুঃখের শেষ কই খোঁজে না
গরিবের কষ্টটা বোঝে না
এক ঘাটে জড়ো করে মোষ আর বাঘ

কিছু কিছু ধনী আছে মহাদানবীর
লোক হিসেবেও আহা ! প্রথম সারির ।

দেশ বিকানোর কড়চা

দেশ বিকানোর কর্মে যিনি
চুক্তি করায় দক্ষ খুব;
তাঁরেই দেখি বর্তমানে
স্বাধীনতার পক্ষ খুব ।।

ঠোঁটের কোণে বিষ মিশিয়ে
যত্রতত্র ক'ন চেষ্টায়ে:
“চার দল দেবে দেশ বিকিয়ে
চার দল দেবে দেশটা দিয়ে ।”

এ-সব শুনে ঝঙ্কি নিয়ে,
কণ্ঠ খানিক চড়িয়ে দিয়ে,
রসিকরা কয় ঝাল ছড়িয়ে
“চোরের মায়ের বড় গলা-
থলের দিকে লক্ষ্য খুব” ।।

দেশকে ফতুর করার কাজে
সর্বদা যে দক্ষ খুব;
তাঁরেই দেখি বর্তমানে
উন্নয়নের পক্ষ খুব ।।

“চারটি প্রধান বিরোধী দল-
সাম্প্রদায়িকতার ফসল;
গণতন্ত্রের অর্জিত ফল,
জোট বেঁধে সব করছে বিকল,
‘পাক’ বানাতে নাড়াচ্ছে কল-
চাচ্ছে তো তাই গদীর দখল” ।
বলে এ-সব আবোল-তাবোল
জাত-দাদাদের খুশি করায়
সত্যি তিনি পক্ষ খুব ।।

হিংসার আগুন ছড়িয়ে দিতে
সর্বদা যে দক্ষ খুব;
তাঁরেই দেখি জাতিসংঘে
গণতন্ত্রের পক্ষ খুব ।।

সস্ত্রাসী খুঁজে বের করবেই
অপরোধী যেই হোক ধরবেই
থাক তারা আকাশে কি মাটির তলায়
চিৎকার করে বলে লম্বা গলায় ।

কিন্তু বলে না ধরা পড়বেই
কাঠগড়া দেখে ঠিক ডরবেই
মাটির ওপরে যারা যাচ্ছে-না-তাই
করছে রাত্রি-দিন হর-হামেশাই ।
ওদের মাটির ওপর নিয়ে নেই কোনো সেঙ্গ
বরং দিয়েছে ব্যাবাক গুম-খুন-লাইসেন্স
ভাবে ওরা জনগণ অন্ধ-
বোঝে না ভাষার ভাব-ছন্দ ।

আদব যথোচিৎ

খোদার রহম না-হলে কেউ
পায় না স্বভাব ভালো,
তঁার রহমত বঞ্চিতদের
যায় না অভাব কালো !

সবচে বড় সেই অভাবী
চরিত্র যার খারাপ-
বদ-স্বভাবের লোক গালি খায়,
খায় গালি তার মা-বাপ্ ।

আল্লা তুমি দাও আমাদের
ভালো স্বভাব চরিত্
মুরব্বিদের মুক্ত করার
আদব যথোচিৎ । ।

খাদ

খাঁটি সোনায়ে খাদ না দিলে
হয় না সোনার অলঙ্কার
করলো না ভুল মানুষটা যে
কিসের মানুষ সে আবার
তাইতো ক্ষমাহীন হয়ো না
অহঙ্কার এক ক্ষীণ বয়ো না
মেনো না সেই রিপূর তৈরী
স্বৈরাচারের অত্যাচার ।

প্রথম মানুষ বাবা আদম
সঙ্গে প্রথম মা-হাওয়া
ভুল করে ভুল করেছিলেন
বই-কিতাবে যায় পাওয়া ।

ভুল-ত্রুটি করার পরে
চাইলে ক্ষমা তওবা করে
তওবা করে তাঁরা পরে
ক্ষমার পথে এলেন ফিরে
পেলেন ফিরে মর্যাদা আর
রহম ধারা তাঁর দয়ার ।

রান্না করতে আগুন লাগে
নাও ভাসাতে লাগে যে লোহা
মূত্র-পূরিষ নিয়েই মানুষ-
সে মহা হোক না মহৎ, হোক না
তবু পুণ্য থাকলে সাথে
কবর-হাশর-পুলসিরাতে
আখেরাতে সহায় হবেন পরম করুণার আধার ।

শুধুই খাদে চায় যদি কেউ
সোনার গয়না বানাতে
পারবে না তা সোনার গয়না
বলে কোথাও চালাতে ।

তেমনি ইচ্ছে করে একটা মানাতে
ভুল করলে তা হয় এক শর্টা
অনিচ্ছাতে করা পাপের
আশা আছে
আল্লা তালার পক্ষ থেকে মার্জনার ।

ব্যক্তিত্ব

খরগোশ থাক ভাই খরগোশ
হাতি-ঘোড়া হওয়া তার ঠিক নয়

চড়ুই সে থাক থাক চড়ুই-ই
ইয়া বড় হওয়া তার ঠিক নয়

পুঁটি মাছ পুরোপুরি পুঁটি থাক
কোনো তিমি হওয়া তার ঠিক নয়

আমিও আমিই থাকি একদম
কোনো দিনই তুমি হওয়া ঠিক নয়।

আপনার দিকে

আপনার দিকে যতোই এগুতে চাই
পৃথিবী আমাকে ততোই পেছনে টানে
রঙের বাহারে দিগন্ত ভুলে যাই
উড়তে পারি না আকাশের গানে গানে ।।

আপনার ডাকে সাড়া দিতে চাই যত
সংসার ততো আঁধারে জাপটে ধরে
হই না যে সব কিছু ত্যাগে সম্মত
মরবার আগে বহুবার যাই মরে ।।

যতো ডুবে যেতে চাই আপনার প্রেমে
ইব্লিস্ ততো শূন্যে ভাসিয়ে রাখে
শূন্যেই যাই শূন্যের মাঝে থেমে;
নামে শকুনেরা আমার প্রতিটি বাঁকে ।।

আপনার নামে যতো গান গেতে চাই
ফেঁসে যাই ততো শুধু রুটি-রোজগারে
মুক্তি মেলে না, ডানা ভেঙে তড়পাই
নিজের হাতের গড়া এক কারাগারে ।।

তবুও আমি তো আপনার উন্মত
পাপিষ্ঠ এক অনুগামী আপনার
তবুও চাই যে আপনার উলফৎ-
আপনাকে পেলে চাই না বে'স্‌ত্‌ আর ।।

একজনই এসেছিলো ধরার ধূলায়
নিতে নয় কোনোকিছু কেবলই দিতে
একজনই খুশি হতো সব বিলায়ে
সকলের প্রয়োজনে, সবার হিতে ।

একজনই বেসেছিলো
সবচেয়ে ভালো যতো নিঃশ্ব
একবারই পেয়েছিলো
সবচেয়ে দরদী এ-বিশ্ব
তার মতো আত্মীয় সমস্ত জগতের হয় নাতো ।

জীবন-যুদ্ধে বীর-পুরুষের
হাতে হাতিয়ার যদি থাকে
হবেই হবে সে নিশ্চয়ই জয়ী
কে আছে হারাতে পারে তাকে ।

এক হাতিয়ার দৃঢ় প্রত্যয়
অটুট একীণ যারে লোকে কয়
যারে লোকে বলে গাঢ় বিশ্বাস
এক আল্‌লার পরে রাখে

অলসতা আর হতোদ্যমের
ঠিক বিপরীতে কঠোর শ্রমের
আরেক অস্ত্র তুলে
জীবন-শ্রমিক বাঁকে-বাঁকে ।

বিশ্বশ্রমের খরতলোয়ার
একীনে-আমলে বিশ্বাসে-শ্রমে হাতে যার এলো
তার বিজয়ের নিশ্চয়তার
আকাশের রবি-ছবি আঁকে ।

ইব্রাহীমের কোরবানী ছিলো

ইব্রাহীমের কোরবানী ছিলো
খোদার প্রেমের
মহিমায় উজ্জ্বল
সর্বত্যাগের গরিমায় উজ্জ্বল ।

সেই কোরবানী তুলনাবিহীন
পরম পাওয়ার ইশকে রঙিন
অনেক স্বপ্নে আঁকা ইতিহাস
অমিত সুখের
বেদনায় উচ্ছল ।

আত্মত্যাগের অনন্য উপমা
ইব্রাহীমের কোরবানী আজো
স্বার্থ ত্যাগের অনন্য উপমা
সেই শিক্ষায় হলে শিক্ষিত
সারাবিশ্বই হবে বিগ্নিত
ফিরবে আবার মহামানবতা
চিরশান্তির
ফোটাতে সে উৎপল ।।

বুশ যুদ্ধে জয়ী হতে পারবে না

বুশ যুদ্ধে জয়ী হতে পারবে না
মানবতার বন্ধু যারা
তারা তারে ছাড়বে না।

মানুষ মাটির শত্রু বুশের
দিন ঘনিয়ে আসে যে নিশ্চিত,
উন্মাদ বুশের কাণ্ড দেখে

বিশ্ববাসী অবাক ও বিস্মিত
বিশ্ব বিবেক ক্ষুদ্র এখন,
পড়ছে ফেটে যখন তখন,
কোন দালাল কয় গুটিসুদ্র
ডব্লিউ বুশ হারবে না?

আমেরিকার গর্ব খর্ব
হবেই হবে যে,
সত্য-ন্যায়ের ঝগড়া উচু
রবেই রবে যে।

খুনী বুশের খতম হবার
সঙ্গে সঙ্গে সকল ষড়যন্ত্র
খতম হওয়া শুরু হবেই,
ধ্বংস হবে সকল স্বৈরতন্ত্র।

খেলাফতের দিন আসে তাই,
আদৌ কোনো সন্দেহ নাই,
আল্লাহ তাঁলার সৈনিকেরা
কারোরই ধার ধারবে না।
বুশ যুদ্ধে জয়ী হতে পারবে না।
ইনশাআল্লাহ,
বুশ যুদ্ধে জয়ী হতে পারবে না।

যেমন গাছ

যেমন গাছ তার তেমনি তো ফল
জ্ঞানী লোকে কয়
তেঁতুল গাছে দেয় না আম
আমের গাছে দেয় না যে জাম
এসব কথা কড় ভোলার নয় ।

ওরে— জাতের মেয়ে হলেও কালো
লোকে তারে বলে ভালো
বাঁশের কোড়ে বাঁশই যে হয়
সময়ই দেয় আসল পরিচয় ।

আবার— যেমন ফল তার তেমনি সুবাস
তেমনি গন্ধ-স্বাদ
গালে দিলেই জিহ্বা বিলায়
যথার্থ সংবাদ ।

ওরে— মানুষ রয়না গায়ে লেখা
তাই সে লেখা যায় না দেখা
কাজে-কন্মে- লেন দেনায় ।

নকল— খাঁটির চিহ্ন সুনিশ্চয় ।

ওরে— যেমন মানুষ তেমনি স্বভাব
হোক না ফকির হোক না নবাব ।

নারীদের গান

নারীরা কোমল, স্নেহময় নারী-
এই কথাটাই সত্য;
কঠোর নারীরা করে না কখনো
সুবিমল আনুগত্য ।

কঠোর নারীরা মূলত অহংকারী
ভেতরে ভেতরে তারা যে অত্যাচারী
নদীর উপমা সাজে না তাদের-
এটাই আসল তথ্য ।

সেবাপরায়ণ নারীই শ্রেষ্ঠ-
কর্মমুখর নারী,
পরম যত্নে ঠিক রাখে সব;
ভরে রাখে ঘর-বাড়ি ।

আগুনের মতো তপ্ত নারীরা
পোড়াতেই জানে শুধু
গভীর সাগরে গড়ে তোলে হায়
পাথরের মরু ধু-ধু
অসুখে বিষের-বাঁশী হয় তারা
বিসুখে হয় না পথ্য ।

শরৎ এলো ধানের ক্ষেতে

শরৎ এলো ধানের ক্ষেতে
চাষীর সুখের স্বপ্নে মেতে
শরৎ এলো রং বিলিয়ে
নানান ঘাসের কোরকে
খোদার দানে ঝঙ্ক শরৎ
সেই খোদারে ডাকবো সবাই
যাবো না কেউ নরকে ।

গাঁয়ের পথে নেই কাদা নেই
চলতে তেমন নেই বাধা নেই
বরং মজা রাত্রিবেলার পরখে
শিশির ভেজা শরৎ এলো নদীর তীরে
কাশবনের ঐ সেথায়
গুহ্র নীড়ে জ্যোতা আনলো যেনো
তেপান্তরের চরকে ।

থোকায় থোকায়
লাল রঙ্গন
করলো রঙিন
সব অঙ্গন
করলো রঙিন তার নিকটে
লুকিয়ে থাকা খড়কে ।

শেষ রাতে শীত দারুণ মজা
খুব সকালে শিউলি ঝোঁজা
এমনি করে মাতিয়ে দিতে
শরৎ আসে ধরকে ।

যে খোদা এই শরৎ দিলেন
এই প্রকৃতির যত্ন নিলেন
সে খোদাকে ডাকবো সবাই
কেউ যাবো না নরকে । ।

ঈদের কথা

ঈদের কথা যেই পড়েছে মনে
অমনি এলো মায়ের কথা স্মরণে
অমনি এলো লতায় পাতায় ভরা
ছোট্ট সবুজ গাঁয়ের কথা স্মরণে ।

অমনি কেঁদে উঠলো যেন মন
অমনি হঠাৎ মন হলো উন্মূহ
অনেক স্মৃতির ভারে অকারণ
অনেক ব্যথার তপ্ত রক্ত স্ফরণে ।

ঈদের চাঁদের সঙ্গে প্রচুর
রোদন থাকে অনেক বুকে লুকিয়ে
অনেক বুকের সুখের সাগর
ঈদের ভীড়েও হঠাৎ যায়গো লুকিয়ে ।

মায়ের স্মৃতি গাঁয়ের স্মৃতিরা
অশেষ ব্যথা অশেষ প্রীতিরা
কাল্লা হাসির অমর রীতিরা
রইলো মিশে অনেক অন্তঃকরণে ।

বাঘ সহসা দু-গাল চাটে চাটুক না

ভয় যেখানে রাত সেখানে কাটুক না
বাঘ সহসা দু-গাল চাটে চাটুক না ।

পথের বাধায় অত্থপথিক
না থামে না
ফাঁদ পাতানো গর্তে কভু নামে না
যা-কিছু-ছাই হঠাৎ ফাটে
ফাটুক না ।

দুট্ট লোকে যা খুশি তাই
যাক বলে যাক
হিংসুটেরা চায় যেখানে
যাক চলে যাক
যতোই আঁটে আঁটুক না ।

অন্ধকারের বন্ধ দুয়ার
দাও ভেঙে দাও
মুক্ত আলোর রঙিন আলোয়
নাও রেঙ্গে নাও
দূরের যাত্রী আবার উঠে হাঁটুক না ।

উদ্ধত মন উপলব্ধির পত্র কি লেখে না

উদ্ধত মন উপলব্ধির পত্র কি লেখে না

মৃত্যুর কোনো খবর শুনেও

কিছুই কি লেখে না।

যে জন গিয়েছে চলে

ভাসিয়ে চোখের জলে

তেমনি একদা চলে যেতে হবে

দেখেও কি দেখে না।

এই দুনিয়ায় অন্ধ মায়ায়

চোখ-কান-বুজে মন

মরণের কথা কবরের কথা

ভুলে থাকে অনুক্ষণ।

পরকাল আছে জেনে

কি করে নিয়েছে মেনে

আমলবিহীন জীবনের ভার

যুক্তিতে টেকে না।

বিজয়ের অনিশেষ সুখ

সত্যের জন্যেই আসমান জমিনও
সত্যের জন্যেই কুল মাখলুক
একদিন সত্যের জয় হবে নিশ্চয়
উজ্জ্বল হবে মহা সত্যের মুখ ।

মিথ্যাকে তাই তুমি কোরো নাকো পরওয়া
সত্যের পথে থাকো উন্নত শির
আপাতত-মিথ্যার রুদ্র দাপট
হয়ো নাকো চঞ্চল-ভীক-অস্থির
তোমার মহান প্রভু শ্রষ্টা ও মহাজ্ঞানী
আশার আলোয় যিনি ভরে দেন বুক ।

তুমিতো পেয়েছো জানি সূরাতুল ফাতিহা
মত মহা ময়দান কোরান সেবা মহাসম্পদ
পেয়েছো বিশ্বের বিশ্বাস
নেই যার কোনো সীমা কোনো সরহদ
মহাসম্পদ মোমিনের ভালোবাসা
বিশ্বাসী হৃদয়ের প্রেম সবটুক ।

ঈদের রাতে

ঈদের রাতে হয় মুনাজাত কবুল
বলেছেন যে, মুহাম্মদ রাসূল;
এই রাতে তাই প্রার্থনা তো শুধু-
ইরাকীদের জয়ী করো হে প্রভু
জেরুসালেম মুক্ত করো ওগো
জয়ী করো চেচেন যোদ্ধাদেরও
কাশ্মীরীদের দাওগো বিজয় দাও
মুসলমানের পানে-
একটু ফিরে চাও ।

ঈদের রাতে হয় মুনাজাত কবুল
ভাসিয়ে দিলাম তাই দু'চোখের কূল ।

ত্রুশ

হাসপাতালে ত্রুশ চিহ্ন আঁকা
ত্রুশ চিহ্ন আঁকা বালিশ-কাঁথায়
ত্রুশ চিহ্ন আঁকা জামা-কাপড়ে
ত্রুশ চিহ্ন আঁকা টুপির মাথায় ।

[কখনো] ফরাশ-বিছানা জুড়ে ত্রুশ আঁকা
[কখনো] জায়নামাজেও দেখি ত্রুশ মাথা
পাঞ্জাবী-গেঞ্জিও বাদ যায় না
ত্রুশ চিহ্ন আঁকা লেখার খাতায় ।

ভীষণ সূক্ষ্মভাবে কিছু এনজিও
ত্রুশ চিহ্ন আঁকা পণ্য বানায়
না জেনে, না বুঝে তাই বহু প্রত্যয়ী
শরীরে শানায়, ঘর-বাড়িতে মানায় ।

নিজের কৃষ্টি আর নিজ-কালচার
[তেমন] কোথায় সুযোগ বলো চর্চা করার
ভিন্ন জাতির ঐ পরিচয় তাই
মিশে যায় কারো কারো দেহ-আত্মায় ।

চলো যাই চলো সেন্টমার্টিন

চলো যাই চলো যাই সেন্টমার্টিন
ছোট বড় এক হয়ে, এটা ওটা সাথে লয়ে
কিছু কিছু হাতে বয়ে ভাবনাবিহীন । ।

বাপ-মার সাথে চলো ছোটরা সবাই
যার যার মতো যাক মোটারা সবাই
অন্যরা মোটামুটি যাক এক সাথে
সাবধানে চলো যারা একেবারে ক্ষীণ । ।

লেখকরা সাথে নাও দুই-দুটোখাতা
ডাক্তার নাও সাথে ওষুধ ও ছাতা
কবিরাজ সাথে নাও বড়ি আর পাতা
মাগুলানা সাবধান পথে আছে জ্বিন । ।

শিল্পীরা গান গাও খেয়ে আদা নুন
আর্টিস্ট ছবি ঐঁকে হেসে হও খুন
নাটকের লোকজন বগল বাজাও
আনন্দে কেটে যাক আজ সারাদিন । ।

পানের ডিব্বা নাও পান খাও যারা
চিবির ঠেলায় হোক সব কাম সারা
চিনির রোগীরা কেনো নোনা বিস্কুট
ভুলবে না জাতি কভু তোমাদের ঋণ । ।

সফরের নামাজের সহজ বিধান
দুই বেলা এক সাথে নিয়ম অমান
ফরজ চারের বেলা দু রাকাত পড়
আল্লাহকে কোনো কাজে ভুলে না মুমিন । ।

কেয়ারী সিন্দাবাদে সাগর ভ্রমণ
সেন্টমার্টিন তাতে গমনাগমন
ক'জন সুযোগ পায় পায় সুবিধাটা
শুকরিয়া তার যিনি আল্লাহ আমীন । ।

জষ্টি মাসে

জষ্টি মাসে স্বষ্টি আসে পাকা আমের খবর শুনি রে
বাড়ি যাবার তারিখ শুনি রে
পাকা আমের খবর শুনি রে ।

গাছ থেকে আম পেড়ে খাবার
মজাই আলাদা
যেকোনো গাছ থেকে খাওনা
কেউ দেবে না বাধা
সিন্দুর কি কড়া মিষ্টি কুড়িয়ে আনার স্বপ্ন বুনি রে ।

জষ্টি আসে জষ্টি হাসে জষ্টি বলে মায়ের গল্প রে
জাম-কাঁঠালের গাঁয়ের গল্প রে
মায়ের গল্প রে ।

মামার বাড়ির যত্ন-আদর
জষ্টি মাসে বেশী
খালার বাড়ির স্নেহ-মায়া
চায় না হতে শেষই
ভর-দুপুরে ঘুরে ঘুরে গোসল করার লগ্ন বুনি রে ।

অশেষ সম্ভাবনার কুসুম

মতিউর রহমান মল্লিক

অশ্রু সমুদ্রের কুসুম



প্রসঙ্গ কথা

‘অশেষ সম্ভাবনার কুসুম’ কবি মতিউর রহমান মল্লিকের একটি অগ্রাহিত গানের পাণ্ডুলিপি। এ পাণ্ডুলিপির অধিকাংশ গানগুলো অপ্রকাশিত। এর কিছু গান কবির জীবদ্দশায় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও স্মারক-সংকলনে প্রকাশিত হয়। কিছু গান চট্টগ্রামের পাঞ্জেরী শিল্পীগোষ্ঠী প্রকাশিত গানের সংকলনে প্রকাশ পায়। অপ্রকাশিত গানগুলো কবি আফসার নিজামের কাছে সংরক্ষিত কবির ডায়েরি থেকে সংগ্রহ করা হয়। পাণ্ডুলিপিটির প্রচ্ছদ এঁকেছেন হাশেম আলী।

সূচিপত্র

অশেষ সম্ভাবনার কুসুম/	৮৬
হয়তো সূর্য নেই সশরীর/	৮৭
পাহাড়ের পাশ দিয়ে/	৮৮
একটা দুটো দোস্ত না/	৮৯
সবচে' বড় বন্ধু সবার/	৯০
দিতে দিতে হাত আসুক/	৯১
পান্জেরী/	৯২
সোনার বরিশাল/	৯৩
ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা/	৯৪
খ্যাতির পিপাসা/	৯৫
ভাঙবে না কভু থামবে না তবু/	৯৬
সুস্থ দেহ চাই, সুস্থ মন/	৯৭
চেতনা/	৯৮
শহীদ মুজাহিদ/	৯৯
বাইরের খাবার/	১০০
ভালোবাসা/	১০১
এক পশলা/	১০২
আপনি সূর্য আপনি জ্যোতির আধার/	১০৩
বিজয়ের সূর্যটা/	১০৫
কেউ তো লেখে না চিঠি/	১০৬
বইয়ের পড়াই শেষ পড়া নয়/	১০৭
মুসলমানের ধ্বংসের মূলে/	১০৮
শয়তানীতে তার চেয়ে/	১০৯
জীবন-যুদ্ধে বীর-পুরুষের/	১১০
ঈদের খবর বয়ে আলোময় চাঁদ/	১১১
শিল্পীর কাজ/	১১২
শরৎ এলো/	১১৩
বাদলা দিনে/	১১৪
পাখির মতো পাখা মেলতে/	১১৫

অশেষ সম্ভাবনার কুসুম

অশেষ সম্ভাবনার কুসুম ফুটেছে চারিদিকে
নতুন দিনের দেয়াল লিখন
শতাব্দী যায় লিখে । ।

বিশ্বাসীদের স্বপ্নে এখন ভোরের সূর্য হাসে
জয়ের খবর মুদ্রিত হয় বুকেরই চারপাশে
বাখার পাহাড় পেরিয়ে যাবার
পদ্ধতি নেই শিখে । ।

সব হতাশার কুয়াশা আজ মিলিয়ে গেলো দূরে
আশার আলো বিলালো গান সপ্ত রাগের সুরে ।

আল কোরআনের শত্রুরা ঐ দারুণ দিশেহারা
সব হারিয়ে আজকে ওরা সত্যি সর্বহারা
দু'চোখ জুড়ে এখন ওদের
রঙ হলুদ আর ফিকে । ।

হয়তো সূর্য নেই সশরীর

হয়তো সূর্য নেই সশরীর
হয়তো সূর্য গেছে আড়ালে
তবু তার আলো নিয়ে পৃথিবীর
চাঁদ কতো জুল্মাত তাড়ালে !

হয়তো সাগর নেই কাছেও
হয়তো সাগর আছে সাগরে
তবু তার গতি নিয়ে নাচে ও
বাঁচায় যে নদী গ্রাম আদরে ।

হয়তো আকাশ ছোঁয়া স্বপ্নই
হয়তো আকাশ আছে নীলিমায়
প্রতিদিন তবু তার যত্নই
জীবনের গান হয়ে বেজে যায় ।

হয়তো রসূল নেই গোচরে
হয়তো রসূল এই হৃদয়ে
খুঁজে পায় শুধু তারে দোসরে
সত্যের নানাবিধ বিজয়ে ।

পাহাড়ের পাশ দিয়ে

পাহাড়ের পাশ দিয়ে চলে গেছে জলধারা
আমি তার জানি না কোনো ঠিকানা
মনে হয় হয়তো বা মিশে গেছে অবশেষে
যেখানে নীল নীলিমার সীমানা । ।

সবুজের আবাহনে আমি যেনো আজ
ভুলে গেছি সব কিছু ভুলে গেছি কাজ
হৃদয়ের চাওয়া পাওয়া একাকার আজ যেনো
বেদনার পরিচয় না না জানি না । ।

ওই ধারে সাগর সে হাতছানি দিয়ে ডাকে অবিরাম
এই ধারে জনপদ যন্ত্রণা দেয় শুধু দেয় না আরাম ।

পাখিদের কলতানে ভরে গেছে মন
ভরে গেছে গানে গানে স্বপ্ন লগন
হৃদয়টা ডানা মেলে হারিয়েছে অজানায়
আমি তার ঠিকানা কিছু জানি না । ।

একটা দুটো দোস্ত না

ছিলো এমন দিনও
বসে থাকার ক্ষণ ছিলো না
পণ ছিলো না ক্ষীণও ।।

যদিও এ-লোক মন্ত না
দুইটা-চারটা দোস্ত না
কোনো পথ-ঘাট চষতো না
এখানে মন বসতো না
তুর ছিলো যে ঝরুর কাছে
দূর ছিলো না চীনও ।।

সেই মনটা পাল্টে গেছে গো
পাল্টে গেছে দিন
বন্ধুরা সব ছড়িয়ে আছে
আমিই সঙ্গীহীন ।

নড়তে চায় না আর দেহ
সবদিকে হয় সন্দেহ
ভালোই লাগে ঘর-গেহ
নাইবা আসুক কেউ কেহ
পড়ার কাছে লেখার কাছে
বাড়ছে কি তাই ঋণও ।।

সবচে' বড় বন্ধু সবার

সবচে' বড় বন্ধু সবার
শ্রেষ্ঠ সঙ্গী হৃদয়বান
আল্লাতাআলার নাজিল করা
মহামহিম আল কোরান ।।

সত্যিকারের পথের দিশারী
নিত্য ন্যায়ের মতের দিশারী
হক-বাতিলের পৃথককারী
ফোরকান বলেই খ্যাতিমান ।।

এই কিতাবের পঠন-পাঠন
গভীর গহীন অধ্যয়ন
সন্দেহাতীতভাবে মনন
মন ও আত্মার উন্নয়ন ।

পরকালের পরম বন্ধু সে
রহমতের অথৈ সিঁধু সে
সহায় সম্বলহীন দিবসে
তার সুপারিশ মূল্যবান ।।

দিতে দিতে হাত আসুক

দিতে দিতে হাত আসুক
যতো দাও ততো সুখ

মগজ তো দিয়েছিলো প্রথমে
তারপর দিয়েছিলো মনটা
দেহ দিলো উঠে গিয়ে চরমে
আহা! কি যে খাসা ছিলো আয়োজনটা!

সেই দেয়া শুরু হলো আসলে
সিলসিলা জারী হলো সেই তো
তারি ক্রমধারা হাল আমলে
দেয়া ছাড়া কোনো কাজ নেইতো ।।

পান্জেরী

পান্জেরী পান্জেরী পান্জেরী
আমরা উত্তাল সাগরের কাণ্ডারী ।।

শপথের সুকঠিন দাবীকে
আগুনের মতো রাখি এ বুকে
মুসা তারিখের উত্তরসূরী ।।

রাত্রির তীরে তীরে দাঁড়িয়ে
প্রভাতের দিকে হাত বাড়িয়ে
সুনীল সাহসের সম্ভারী ।।

সুদূরের এই পথ ছাড়িয়ে
প্রলয়ের ঞ্চকুটি বাড়িয়ে
বাজিয়ে যাই মোরা জয়ভেরি ।।

[পান্জেরী শিল্পীগোষ্ঠীর দলীয় সংগীত]

সোনার বরিশাল

কাছেই ছিলো বারিধি আর ঘরেই ছিলো শাল
তাই বুঝি কেউ নাম রেখেছে সোনার বরিশাল ।।
ঐ যে নদী কোথায় হারালো
ঐ যে মাঝি কি গান শোনালো
ওরে ছোট্ট ছুইয়ের নাওয়ে তুলে
লাল সবুজ নীল পাল ।।

গোলাভরা ধান সেথা বিন্মি ধানের চাল
হরেক রকম পিঠা বানায় সকাল ও বিকাল ।

মেজাজ গরম হলেও এরা মানুষ বড় ঝাঁটি
অতিথি আপ্যায়নেতে বড়ই পরিপাটি
কেউবা বলে ধান নদী ঝাল
এই তিনে ভাই হয়েছে বরিশাল
ওরে কেউবা বলে লড়তো এরা
নিয়ে লেজা ঢাল ।।

ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা

ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা

ভাগ করা ভালোবাসে;

যেখানে দ্বন্দ্ব, বিদ্বেষ যেথা,

থাকে তার আশেপাশে।

কূটকৌশল খুঁজে বের করে

বিকশিত বিশ্বাসে।।

ধর্ম আলাদা করেছে কর্ম থেকে,

রাজনীতি থেকে নীতি

জীবন থেকে যে তাড়িয়ে দিয়েছে হায়

আল্লামার ভয়ভীতি;

এই রোগ, এই জীবাণু মোমিন

বয় নাকি নিঃশ্বাসে।।

বয় বলে আজ রাজনীতি সব,

সংস্কৃতির নেইকো দাম

তমদ্দুনের দাবী পড়ে রয়;

রাজনীতিতেই সব উদ্দাম।

সম্প্রদায়ের বিভেদে এদের চেয়ে

জুড়ি মেলা বড় ভার

জাতিতে জাতিতে এরাই জিইয়ে রাখে

সংঘাত অনিবার।

এই বিবাদের কুহোরে মোমিন

নিজেকে কি নিজে নাশে?

খ্যাতির পিপাসা

অন্যের খ্যাতি সহিতে পারে না
নিজের খ্যাতির জন্যে তারাই অধিক পাগলপারা

খ্যাতির পিপাসা দূষিত প্রেমের মতো
লাজ-লজ্জার ধার- সে-ধারে না ততো
যেখানে তা পায় ছোটে সেইখানে ক্ষুধার্ত সবহারা ।

ভাঙবে না কভু থামবে না তবু

ভাঙবে না কভু থামবে না তবু
হতাশা-নিরাশা অসহায়তায়
আল্লার খাস্ রহমত পাবে
তাঁহার রাহের রাহী হওয়ায় ।

ভেঙে পড়বার নেইতো কারণ
সামনে চলায় কে করে বারণ
মারণ অস্ত্র যতোই হানুক
প্রতীতি মূল ঠিকানায় প্রবল ।

কাঁপবে না কভু কাঁদবে তবু
ঘৃণা-অবহেলা-বঞ্চনায়
মান-সম্মান আল্লার হাতে
সাক্ষ্যনা তাঁর বন্দনায় ।

পিছু হটবার কোথায় সুযোগ
কেটে যায় যতো মহাদুর্যোগ
মোকাবেলা করে সাহসিকতায়
হুজুগে মাতাল হয় না সবাই ।

সুস্থ দেহ চাই, সুস্থ মন

সুস্থ দেহ চাই, সুস্থ মন
তাহলেই পাবো ঠিক
দীর্ঘ জীবন
এই শ্লোগানে-
এই সুরে-গানে
প্রভাতী সংসদ করেছি আমরা-
গড়েছি অনন্য সুন্দর সংগঠন ।।

আমাদের সকলের উদাত্ত আহ্বান ভাই
শরীরচর্চা করে এসো নবজীবনের
নতুন নতুন গান গাই
পায় হেঁটে হেঁটে
গা-গতরে খেটে
সকল রোগের করি উচ্ছেদন ।।

চেতনা

যদি এই দেশ
না থাকে স্বদেশ
বেঁচে থেকে তবে লাভ কি গো বলো না !

তাই এসো আজ
করি এক কাজ—
শেষ করি শত্রুর সব ছলনা ।

ঈমানের বলে হই বলিয়ান
মুক্তির ভাবে ভরি চিত্ত,
শৃঙ্খলা মেনে চলি সারাক্ষণ
মেধাকেও রাখি উদ্বৃত্ত;
একতার গান
গাই অবিরাম
হাতে হাতে হাত বেঁধে তাই চলো না ।

ধ্বংসের কারসাজি বাড়ছেই,
বাড়ছেই ঘোর ষড়যন্ত্র !
মানুষের মনে বিষ ঢালছেই,
দূষিত করতে গণতন্ত্র ।
ঘন কালো মেঘ
ঐতো উদ্বেগ
দুই পায়ে ঘায়ে ঘায়ে সব দলো না ।

বিদেশের চর এলো আগিনায়,
সাথে এলো নানা রঙ জঙ্গী;
ছদ্মবেশের তলে তৎপর
দিনরাত ঘেষেটির সঙ্গী ।
মীর জাফরের চোখ
বিষাক্ত যতো হোক—
তীব্র-তীক্ষ্ণ রাখি ততো চেতনা ।

শহীদ মুজাহিদ

সৌভাগ্যের কপাল নিয়ে সে এসেছিলো এই দুনিয়াতে জানি
শাহাদাত তাই দিয়ে গেলো তারে মর্যাদা আরো উঁচু আসমানী

ভাঙলো আগর কতো অজানার সীমানা ভাঙলো কতো অচেনার
পেয়ে গেলো সব সেরা উপহার নামের শুরুতে শহীদ যে তার

শাহাদাতে যতো কিছু পাওয়া গেলো এর চেয়ে পাওয়া যায় কিসে বলো
মিষ্টি চেহারা চিরজীবী হলো মিষ্টি হাসিও অমরতা পেলো

মুজাহিদ নাম সার্থক হলো অল্প বয়সে অল্প দিনেই
জীবনের সেরা সফলতা সে যে রক্তের দামে নিয়েছে কিনেই

এই মুজাহিদ আমার জীবনে এসেছিলো এক বিকেলে একাই
আর না কখনো- প্রথম ও শেষ- ঐ একবারই দিয়েছে দেখাই

সেদিন সে ছেলে মিনিট খানেক কথা কয়েছিলে মিশিয়ে আবেগ
একটু পূর্ণ একটু আধেক যেনো আপনার ভাই সে আরেক

সেই স্মৃতিটুকু ভুলতে পারি না মনে পড়ে প্রতিদিন যে এখন
আল্লার পথে চলতে সে আজ জাগায় প্রেরণা জাগায় চেতন
যদিও হৃদয়ে নদী বেদনার যদিও পরাণে ব্যথার পাথর
তবুও কাকুতি মিনতি আমার আর মোনাজাত দুয়ারে খোদার

দাও সে স্বপ্ন চক্ষে সবার আল কোরানের সমাজ গড়ার
দাও সে শক্তি বক্ষে সবার দীন কায়েমের কাজ করবার

সেই যে স্বপ্ন দেখে মুজাহিদ করলো নিজেকে নিবেদিত প্রাণ
সেই যে শক্তি বলে মুজাহিদ আল্লার পথে হলো কোরবান

আর তার যতো রয়েছে স্বজন তাদের হে খোদা দাও অফুরান
দাও সাধুনা দাও প্রশান্তি দীন-দুনিয়ার দাও কল্যাণ॥

বাইরের খাবার

বাইরের খাবারের ধারে কাছে যেও না
বাইরের খাবারের কোনো কিছু খেও না

মাছি পড়ে বাইরের খাবারে
নোংরার একশেষ বাবা রে!

বাইরের খাবারের গুণগান গেও না

ধূলোবালি প্রত্যহ
পড়ছে তো পড়ছেই
ময়লাও অহরহ
পড়ছে তো পড়ছেই

বাইরের খাবারের গুণগত মান নেই
ও খাবার খাওয়াতেও মান-সম্মান নেই
থ্যালা-বাটি ঠিকমত ধোয় না
খাবারের পানিও ফুটোয় না
এই কাজে কোনো আপা কোনো ভাইজান নেই।

ভালোবাসা

এই দুনিয়ায় সবচেয়ে বেশী ভালোবেসেছে যে-মন
ইসলামী আন্দোলন ইসলামী আন্দোলন ইসলামী আন্দোলন

এই পথ জানি কোনো
সহজ পথের নাম নয়
এই পথে দিতে হয়
জীবনের সবকিছু
সকল কিছুর বিনিময়
এই পথ না চাওয়ার
এই পথ না পাওয়ার
এই পথে নেমে আসে
দুঃখ-ব্যথা-বেদনা হঠাৎ অকারণ

এ জীবন অর্পিত হয়েছে যে
আল্লার দ্বীনেরই জন্য
সত্যিই আমি তাই
সবচেয়ে বেশী খুশি
সবচেয়ে হয়েছি যে ধন্য

এই পথে চলবোই
শপথ নিয়েছি অবিরাম
এই পথে ঢেলে দেবো
প্রতিভা ও জীবনের
সবটুকু অমূল্য দাম

এই পথ অনুপম
এই পথ প্রিয়তম
এই পথে ভয় আছে
আছে বাধা-বিদ্রূপ নানাবিধ নিষেধ ও বারণ।

এক পশলা

বৃষ্টি হলো এক পশলা,
সৃষ্টি হলো শিল্পকলা-
গাছের পাতায়, তৃণ-লতায়,
ঘাসের ডগায় গো ।।

নরম হাওয়া বইলো আবার
ফুরফুরে মন-হৃদয় কাড়ার,
কাব্য-কথার উচ্ছলতার
দোলনা দোলায় গো ।।

কৃষ্টি বুঝি আজ উতলা,
দৃষ্টি হঠাৎ হয় উজ্জ্বলা
অনেক দূরে গানের সুরে;
ভুবন ভোলায় গো ।।

মিষ্টি রোদের বন্যা এলো,
দোয়েল পাখির কন্যা এলো,
স্বপ্ন এলো, ছন্দ এলো,
মনের গোলায় গো ।।

আপনি সূর্য আপনি জ্যোতির আধার

মানুষের মতো আপনিও চলে গেলেন যেখানে,
সবাই যায় আর ফেরে না কেউ কখনো আবার;
বুঝেও বুঝি না তবু মনে হয় আছেন এখানে—
কোথাও বা আমার ভেতরে যেমন মন আমার ।

কি করে যে- বুঝেও বুঝি না- ঘুচে যায় শেষে
সময়ের এতো ব্যবধান, কালের এতো বিরোধ;
অতীতের শতাব্দী যেনো এ-দিনের তীরে এসে
মেশে আর উঠে যায় অচেনার সব অবরোধ ।

কঙ্করময় এক ভূভাগের নাগরিক, তবু—
একটিও নদী নেই, নাগালের ত্রি-সীমানায়,
সব কর্কষ পর্বত; কী যে লীলায় প্রভু
আপনার অন্তরে দেন সাগর অসংখ্যায় ।

আমি তো নদীর দেশে: নদী নেই হৃদয়ে যদিও
সবুজের পরিবেশে সবুজাভ নেই অন্তর ।
ভেতরের চোখে নেই আরাম আর নেই জ্যোতিও
পোড়া শস্যের ঘ্রাণে যে ভরেছে প্রান্তর ।

তবুও কী করে যেনো সরে যায় ভূগোলের দূর;
হৃদয়ের নদী বেয়ে অথৈ জোয়ার আসে এক:
আপনার সমুদ্র হতে আরো গতি ভরপুর;
তার আড়ালে দাঁড়ানো আপনি; আমি লাক্ষায়েক ।

অনেক মিনার আছে মিনারহীন আপনি একা;
কেননা আপনার মিনার গড়া সকলের মনে
থাকে না পাথরের মিনার আর পাথরের লেখা;
আপনাকে পারে না মুছতে অন্ধ-সাল ও সনে । ।

তাড়ায় আকাশের সূর্য যতো ধরার আঁধার:
আরেক জগৎ আছে: মনের ভুবন সীমাহারা-
সেই জগতের সূর্য আপনি, জ্যোতির আধার!
চির অশেষ আশির্বাদ হে সিরাজাম মুনীরা ।

বিজয়ের সূর্যটা

নিশ্চয় সেইদিন বিজয়ের উজ্জ্বল
ঝলমল সূর্যটা উঠবেই
যেইদিন কোরানের রাষ্ট্রের সুখবর
দিকেদিকে সবদিকে ছুটবেই ।।

ঈমানের পরিণাম কেবা চায় না
ইসলামী সংগ্রাম বৃথা যায় না
তোহিদী জনতার বাসনার কুঁড়িগুলো
বিকশিত ফুল হয়ে ফুটবেই ।।

জিহাদের পতাকীরা জালিমের বিষদাঁত
তুলে ফেলে জয়ী হবে যেইদিন
জুলুমের হাতিয়ার ভেঙে-চুরে চুরমার
হবে হবে নিশ্চয়ই সেইদিন ।

কোরানের কর্মীরা বাধা মানে না
হতাশার কোনো সুর সাধা জানে না
মানুষের মুক্তির বিপ্লবী চেতনায়
জেহাদের ময়দানে জুটবেই ।।

কেউ তো লেখে না চিঠি

কেউ তো লেখে না চিঠি
তুমি কেনো লিখলে
আমার কান্না-হাসা
আমার ব্যথার ভাষা
তুমি কেনো লিখলে ।।

তুমি কেনো জীবনের মানে খুঁজলে
আমার কাহিনী পড়ে চোখ মুছলে
অনেক কেনো পথের যে শেষে
কেনো যে দাঁড়ালে এসে
কেউ তো খোলে না বুক
তুমি কেনো খুললে ।।

চাঁদের হাসিই চায়-
পিয়াসী সবাই
বেদনার ছায়া দেখা
সাথী তার নাই ।

তুমি হামরাহী হতে কেনো চাইলে
অশ্রু-ভেজানো গানকে গাইলে
ফেলে দেয়া ফুলমালা
সব জ্বালা মুছে দিতে
প্রেমের দু-হাত দিয়ে কেনো তুললে
তুমি কেনো গুললে ।।

বইয়ের পড়াই শেষ পড়া নয়

বইয়ের পড়াই শেষ পড়া নয়
পড়তে হবে আরো
আল্লা'তালার তৈরী যা, তাও পড়ো
পড়তে যতো পারো ।।

প্রজাপতির ডানার বর্ণমালায়
কিন্মা পদ্মপাতার পাতা-থালায়
যে-সব কথা লেখা আছে
জলদি পড়েই ছাড়ো ।।

সবাই পড়ে বইয়ের পড়া
কিন্তু বলো ক'জন
পড়তে পারে অথৈ সাগর
সুনীল-আকাশ-পবন ।

ময়না শালিক পায়রা-টিয়া ঐ
মেললে পাখা মেললো যেন বই
ওসব বইয়ের লিখন অরণ
ঠিকই করায় কারো ।।

চতুর্দিকে বই ছড়ানো
গ্রন্থ রাশি রাশি
পড়ি এসো সেসব যারা
জ্ঞানকে ভালোবাসি ।

ঘাসের পাতা গাছের নিবিড় পাতা
নিয়েই বিশাল সবুজ শ্যামল খাতা
ঐ খাতারই জ্ঞান দিয়ে ভাই
জ্ঞানের শত্রু মারো ।।

মুসলমানের ধ্বংসের মূলে

মুসলমানের ধ্বংসের মূলে
দুইটি কারণ বিদ্যমান
একটি তো হলো কোরআন ত্যাগ
আল্লাতালার সেরা দান ত্যাগ
অন্যটি হলো পরস্পরের
মতভেদ আর মতবিরোধের
তীব্র-তীক্ষ্ণ-বিষাক্ত যতো বান ।।

তার নেয়ামত অস্বীকারের
তার বরকত অস্বীকারের
দুইটি কারণ সূর্যের মতো
ইতিহাসে জাজ্বল্যমান ।

ব্যবস্থা করি কোরান শেখার
মনোযোগ দিয়ে ভেতরে দেখার
প্রত্যহ তাই কোরান বোঝার
উদ্যোগী হই বহু বারবার
শিক্ষাজনে কোরান পড়ার
সিলেবাস করি আলোকধারার
মাঠে-ময়দানে তাফসীর আর
আল কোরানের সমাজ গড়ার
সংগ্রাম করি, করি সবকিছু দান ।।

মুসলমানের পতনের যুগ
ঝগড়া ও মতবিরোধের যুগ
ঐক্য এড়িয়ে চলবার যুগ
উল্টো-পাল্টা বলবার যুগ
ফেতনা-ফাসাদ করবার যুগ
বাভিলের পথ ধরবার যুগ
সবদিকে ধস নামবার যুগ
অগ্রগতিও থামবার যুগ
হারানোর যুগ মর্যাদা-সম্মান ।।

শয়তানীতে তার চেয়ে

সত্যবাদী তার চে' বড় [তার চেয়ে আর]
কে আছে বা বলো
সেই কথারই প্রমাণ দিতে [তাকেই] বলতে হলো ।।

সত্য কথা বলেই যাবেন
না হয় গালিগালাজ খাবেন
না হয় আমায় বললো লোকে
ধাপ্পাবাজ আর খলও ।।

রসিকরা কয় সকল বিচার
নিজের দলের পক্ষে নিবার
তবেই ওসব লম্বা বুলি ।

কিন্তু সত্য আমার বেলায়
বললে হালার পোলা হালায়
চৌদ্দ গোষ্ঠী দেইখা ছাড়ুম
বইলা দিলুম কোলো ।।

“বিচারকরা ঘরে-ঘরে
সত্ৰাসীদের লাশন করে
উকিলরাও সেই তাদেরই
করছে ঠিকই ফলো”
জঘন্য কৌশলও ।।

জীবন-যুদ্ধে বীর-পুরুষের

জীবন-যুদ্ধে বীর-পুরুষের
হাতে হাতিয়ার যদি থাকে
হবেই হবে সে নিশ্চয় জয়ী
কে আছে হারাতে পারে তাকে । ।

এক হাতিয়ার দৃঢ়প্রত্যয়
অটুট একীণ যারে লোকে কয়
যারে লোকে বলে গাঢ় বিশ্বাস
এক আল্লার পরে রাখে । ।

অলসতা আর হতোদ্যমের
ঠিক বিপরীতে কঠোর শ্রমের
আরেক অস্ত্র তুলে নেয়
জীবন-শ্রমিক বাঁকে-বাঁকে । ।

বিশ্বে-প্রেমের খর তলোয়ার
হাতে এলো যার
একীনে-আমলে-বিশ্বাসে-শ্রাম
তার বিজয়ের নিশ্চয়তার
আকাশের রবি ছবি আঁকে । ।

ঈদের খবর বয়ে আলোময় চাঁদ

ঈদের খবর বয়ে আলোময় চাঁদ
দূরের আকাশে আনে খোশ-সংবাদ
একমাস সাধনার পরে
সবখানে সব ঘরে ঘরে
বিলায় সে আনন্দ-স্বাদ ।।

কেউ ওগো বাদ থাকে না
ঈদের আদর পায় সকলে
পৃথিবীটা চলে যায় গো
পবিত্র মমতার দখলে
প্রেম-প্রীতি ক্ষয় হয় না রে
কেউ কারো পর রয় না রে
ভেঙে যায় বিবাদের বাধ ।।

মানবতা হেসে ওঠে ঈদের দিনে
গেয়ে ওঠে মানুষের মন
আকাশ-বাতাস-মাটি যেনো
হয়ে ওঠে আরো উন্মূন ।

আহা যদি এই শুভদিন
বুকে ধরে রাখতাম গোপনে
প্রতিদিন চলতাম মোরা
ঈদের নীতির মতো প্রতিক্ষণে
থাকতো না কোনো বিদ্বেষ
থাকতো না হিংসার লেশ
দুনিয়া হতো না বরবাদ ।।

শিল্পীর কাজ

শিল্পীর কাজ হলো মন চুরি করা
শিল্পের কাজ হলো দান
এই পথে প্রতিভার স্বার্থকতাই
যথার্থ চর্চার মান-সম্মান । ।

তুলি ও রঙের কাজ পাল তোলা খেয়া
কথা ও সুরের কাজ উৎসাহ দেয়া
অধিকার আদায়ের সংহতি-সংগ্রামে
আলোকিত সময়ের আদেশ প্রদান । ।

শিল্পীর ত্যাগে থাকে প্রেরণা
থাকে এক বিকশিত চেতনা ।

কবিতার মূল কাজ হৃদয় মনন
নাটকের মূল কাজ গণজাগরণ
মহাসাধনার কাছে জাতি শুধু
পেতে চায় প্রাণের প্রমাণ । ।

শরৎ এলো

শরৎ এলো শরৎ এলো
এলোরে শরৎ
তাই বুঝি আজ চতুর্দিকে
খুশির আলামত ।।

কাঁচা মাটির নরম কাদা
শুকিয়ে গিয়ে কমলো বাধা
ইচ্ছে মতো গায় বেড়ানোর
তৈরী হলো পথ ।।

হাড়ুডু হা-ডু-ডু খেলা
নিয়ে হবে বিরাট মেলা
কাদা মেখে ভূত হবে সব
সব শেষে আলবত ।।

কেমন হবে হেমন্তকাল
মাঠ-ঘাট-বিলে সেই হাল-চাল
আগাম খবর দিচ্ছে শরৎ
দিচ্ছে মতামত ।।

জোংড়া-ছাতা-কলার পাতা
লাগবে না আর ঢাকতে মাথা
পাও ফসকে পড়বে না কেউ
রাস্তাতে ধপ্পত ।।

বাদলা দিনে

কাল্লা ভেজা বাদলা দিনের শেষে
শরৎ এলো মিষ্টি হেসে হেসে ।।

উঠোন জুড়ে শিউলি ঝরে
পাতায় ঘাসে শিশির পড়ে
হালকা মিঠে রোদের ভেতর
সকাল দাঁড়ায় এসে ।।

নদীর ধারে কাশফুলেরই মেলা
সাদা মেঘের সঙ্গে যে তার খেলা ।

বিলের বুকে শাপলা-শালুক
তারা ভরা আকাশের মুখ
কাজল কালো পানির কাছে
পথ হারালো শেষে ।।

পাখির মতো পাখা মেলতে

পাখির মতো পাখা মেলতে
চায় যে আমার মন
ওরে হেথায়-সেথায় যায় হারিয়ে
মন যে সারাক্ষণ । ।

একটু যদি নদীর তীরে যেতাম
ছাড়া ছাড়া ডেউয়ের শব্দ পেতাম
মাঝির ভাটিয়ালী গানে
মন হতো উন্মাদ । ।

পারলে যেতে শান্ত বিলের কাছে
কলমিলিতা কেমন দোলে-নাচে
দেখে-দেখে উল্লসিত
হতাম অকারণ । ।

গাঁয়ের ভেতর দিয়ে হেঁটে হেঁটে
লতায়-পাতায় শিল্প ঘেঁটে ঘেঁটে
ছুঁয়ে দিতাম মুয়াজ্জিনের
উতল সম্ভাষণ । ।

সত্যিকারের মাটির মানুষ পেয়ে
মাটির কথা শুনতাম কাছে যেয়ে
লুফে নিতাম জীবন সহজ
সরল সাধারণ । ।

কোনো ক্ষেতের আলে বসে একা
গুরু করতাম মুক্ত আকাশ দেখা
রাখাল কিম্বা রাখালিয়ার
শুনতাম না বারণ । ।

সদলবলে স্বভাব কবি পেলে
স্বভাব গায়ক হঠাৎ যদি মেলে
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের
করতাম উদ্বোধন ।।

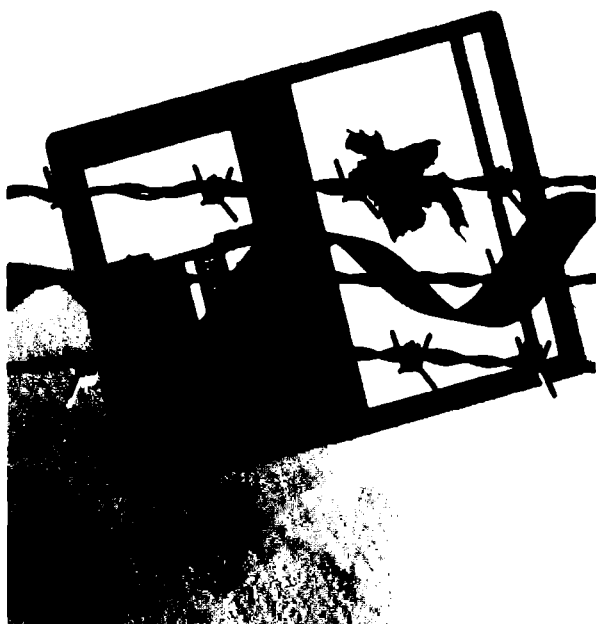
উদ্যম গায়ে ছোট্ট ছেলে পেলে
কানামাছি খেলতে লেগে গেলে
দুচোখ ভরে ঠায় দাঁড়িয়ে
দেখতাম আফলন ।।

লাল ফিতা

[অগ্রস্থিত]

লাল ফিতা

অতিউর রহমান আল্লিক



প্রসঙ্গ কথা

‘লাল ফিতা’ কবি মতিউর রহমান মল্লিকের একটি রাজনৈতিক, সামাজিক ও বিবিধ ছড়ার ‘পাণ্ডুলিপি’। পাণ্ডুলিপিতে ২২টি ছড়া স্থান পেয়েছে। ছড়াগুলো বিষয়-বৈচিত্র্যে ভরপুর। প্রতিটি ছড়াতেই কবির সমাজ-বিশ্লেষণী তীক্ষ্ণ চোখ তীব্র আলো ফেলেছে আমাদের বোধের ওপর। পাণ্ডুলিপিটির প্রচ্ছদ ঐকেছেন আফসার নিজাম।

সূচিপত্র

মঞ্চ: এপিঠ/ ১২৩
মঞ্চ: ওপিঠ/ ১২৫
বাজেট ০৫-০৬/ ১২৬
দেশবাসী হুঁশিয়ার/ ১২৭
ডেঙ্গু জ্বর/ ১২৮
বাংলা ভাষা/ ১২৯
সব চ্যানেলে তাঁর পিতা/ ১৩০
ডেঙ্গু/ ১৩১
দিক/ ১৩২
হরতাল করবো না/ ১৩৩
শত্রু মাদরাসার/ ১৩৪
স্বাধীনতার পদ্য/ ১৩৬
সৎ সঙ্গে/ ১৩৮
নও ঘষেটি/ ১৩৯
ঘোলাপানিতে মাছ শিকারিরা/ ১৪০
বস/ ১৪১
রাজনীতিবিদ/ ১৪২
ফারাক্কা/ ১৪৪
বিজয় বিজয়/ ১৪৫
লিমেরিক/ ১৪৬
ধর্মের কল/ ১৪৭
হ্যাপি/ ১৪৮

মঞ্চ: এপিঠ

আর যাবো না মঞ্চে আমি-
তার'চে যাবো লঞ্চে আমি

মঞ্চে যেতে যোগ্যতা চাই
মঞ্চে যেতে দক্ষতা চাই
মঞ্চে যেতে সুকৃতি চাই
মঞ্চে যেতে সুপ্রীতি চাই
মঞ্চে যেতে মর্যাদা চাই
মঞ্চে যেতে মন সাদা চাই
মঞ্চে যেতে সুখ্যাতি চাই
মঞ্চে যেতে সুজ্ঞাতি চাই
মঞ্চে যেতে ন্যায়-নীতি চাই
মঞ্চে যেতে দায়-ভীতি চাই ।

আর যাবো না মঞ্চে আমি
তার'চে যাবো লঞ্চে আমি-

মঞ্চে লাগে শ'পূর্ণিমা
মঞ্চে লাগে সাত-নীলিমা
মঞ্চে লাগে গুণ-মহিমা
মঞ্চে লাগে জ্ঞান-গরিমা ।

আর যাবো না মঞ্চে আমি
তার'চে যাবো লঞ্চে আমি-

মঞ্চে যেতে দেশ-সেবা চাই
দশের জন্যে বেশ দেয়া চাই
মঞ্চে যেতে ক্ষমতা চাই
হৃদয় ভরা মমতা চাই
মঞ্চে যেতে সমতা চাই
সত্যিকারের সততা চাই

মঞ্চে যেতে বৈধতা চাই
মুখমোহন বই-কথা চাই
মঞ্চে যেতে এশক্ থাকা চাই
ক্যারেঙ্টারের মেশক্ থাকা চাই ।

আর যাবো না মঞ্চে আমি
তাঁর'চে যাবো লঞ্চে আমি-

মঞ্চে যেতে ধীমান লাগে
মঞ্চে যেতে দ্বি-জ্ঞান লাগে
মঞ্চে যেতে মিয়ান লাগে
মঞ্চে যেতে ঈমান লাগে ।

আর যাবো না মঞ্চে আমি
তাঁর'চে যাবো লঞ্চে আমি-

মঞ্চে যেতে প্রতিভা চাই
মেধার মতো স্ব-বিভা চাই
মঞ্চে যেতে স্বাতন্ত্র্য চাই
বুদ্ধিমান এক অতন্দ্র চাই
মঞ্চে যেতে সারল্য চাই
অথৈ দেখার প্রাবল্য চাই
মঞ্চে যেতে চেহারা চাই
বান্দা-নফর বেহারা চাই
মঞ্চে যেতে প্রতিষ্ঠা চাই
কর্মকাণ্ডে প্রনিষ্ঠা চাই ।

আর যাবো না মঞ্চে আমি
তাঁর'চে যাবো লঞ্চে আমি-

মঞ্চে যেতে হৃদয় লাগে
মঞ্চে যেতে বিনয় লাগে
মঞ্চে যেতে বিষয় লাগে
মঞ্চে যেতে বিজয় লাগে ।

মঞ্চঃ ওপ্ঠ

মঞ্চঃ আমি আর যাবো না
তাঁর'চে যাবো লঞ্চঃ আমি—

মঞ্চঃ যেতে রাজনীতি চাই
হরেক রকম সাজনীতি চাই
মঞ্চঃ যেতে তেলনীতি চাই
অর্থকড়ির খেলনীতি চাই
মঞ্চঃ যেতে খলনীতি চাই
দলন করার দলনীতি চাই
মঞ্চঃ যেতে কূটনীতি চাই
যখন তখন বুটনীতি চাই
মঞ্চঃ যেতে ভক্তরা চাই
সগু-সর্ব-শক্তরা চাই ।

মঞ্চঃ আমি আর যাবো না
তাঁর'চে যাবো লঞ্চঃ আমি—

মঞ্চঃ যেতে মুখোশ লাগে
হিংসা-দ্বেষের দু-দোষ লাগে
কুৎসা করার ফুঁ-রোষ লাগে
কোন্দল এবং কুদোষ লাগে ।

আর যাবো না মঞ্চঃ আমি
তাঁর'চে যাবো লঞ্চঃ আমি ।

বাজেট ০৫-০৬

বাজেটের বিরুদ্ধে বিরোধীরা সকলে
সবার লক্ষ্য এক, ইটও এক বগলে
একই অভিযোগ শুধু, বানানটা অন্য
সুরও এক, কথা নানা- কুৎসার জন্য ।

কেউ বলে এ-বাজেট উচ্চ-অভিলাষী
এ-বাজেট আগাগোড়া কল্পনাবিলাসী
আজেবাজে এ-বাজেট একদম যা ও তা
বাজেটের নামে শুধু ধোঁকাবাজি ভাঙতা ।

পক্ষেও বহুমত দেয় দেখি উঁকি যে-
এ-বাজেট শেষতক কল্যাণমুখী যে
দারিদ্র বিমোচনে এ-বাজেট আচ্ছা
রফতানিমুখী বলে একেবারে সাচ্চা ।

মাঝখানে জনগণ বলে ওঠে বাবারে-
বাজেটের মজা টের পাওয়া যাবে বাজারে ;
দরকারি মাল যদি কিনতে না পারি গো
এ-বাজেট দুর্বহ বোঝা বড় ভারি গো ।

দেশবাসী হুঁশিয়ার

অকারণে বিডিআর মারে বর্ডারে
নিষ্ঠুর বিএসএফ যাদের অর্ডারে
যাদের হুকুমে মরে

আমাদের বাপ-
মা-ভাই-বোন-শিশু
গাঁ-ক্ষেত-গাছ-পশু
কোনোদিন কক্ষনো
পায় না তো মাপ-

সেই সব চিহ্নিত শত্রুর পক্ষে
আজো যারা কথা বলে লক্ষে-অলক্ষে;

তারা হলো এ-দেশের মূল দুশমন
মীর জাফরের জাত, ঘষেটির জন;
তারা হলো ক্লাইভের আসল দালাল
দেশবাসী হুঁশিয়ার!
সামাল! সামাল!

ডেঙ্গু জ্বর

আইলো দেশে ডেঙ্গু জ্বর
কাঁপছে রে ভাই গ্রাম-নগর
কাঁপছে বাড়ি কাঁপছে ঘর

আইলো দেশে ডেঙ্গু জ্বর
প্রজারা কয় অতঃপর
এই রাজার নেই খোদার ডর
তাই তো গজব মাথার পর।

বাংলা ভাষা

এক.

কবিগুরু কোলকাতাতে
বাংলাভাষা হাওয়া
বাংলা কথা বলার মতো
যায় না মানুষ পাওয়া

বাঙ্গালী যাও ভাংগাচোরা আছে
বড়ই মধুর হিন্দি তাদের কাছে।

দুই.

রাষ্ট্রভাষা বাংলা হউক
চায়নি কবিগুরু
চাইয়া ছিলেন হিন্দিভাষা
ধইরা গান্ধীর উরু

জোড়াসাঁকোর চতুর্দিকে তাই
হিন্দি ছাড়া বাংলাভাষা নাই।

তিন.

বাংলাভাষা ঢাকায় এখন
কোলকাতাতে ঠুস!
রবীন্দ্রনাথ কোথায় যাবেন?
নাই দাদাদের হুঁশ!

বাংলাভাষার রাজধানী আজ ঢাকা
ঠিক সময়ে ঘুরল কালের ঢাকা।

সব চ্যানেলে তাঁর পিতা

সব চ্যানেলে তাঁর পিতা!

রসিকরা কয়!

আরে নিশ্চয়

সংগোপনে

এর পেছনে

কাজ করেছে লাল ফিতা!

লাল ফিতা!!

লাল ফিতা!!!

লাল ফিতা!!!!

লাল ফিতা তো লাল ফিতাই!

প্রেম-পিরিতির হাল কি তাই!!

ডেঙ্গু

ডেঙ্গুর মহামারী রূপ দেখে সবদল
হরতাল বাদ দিলো যখনি
বুয়া আর আবদুল ঠাটা ও বিদ্রূপ
গুরু করে দিলো ঠিক তখনি ।

বোয়ালের মতো হেসে আবদুল বলে ওঠে
রাজপথ ছেড়ে গেছে পালিয়ে
ডেংগুর অজুহাতে সবদল
খায় যারা সরকার জ্বালিয়ে ।

বুয়া বলে ডেঙ্গুর জুড়ি নেই একদম
ডেঙ্গুটা আসলে অনন্য
ডেঙ্গুর জন্যই ভেসে গেল হরতাল
দেই তাই ডেঙ্গুকে ধন্য ...

জনতার দুর্দশা-দুখ্ দেখে তামাশায়
মেতে উঠে যতো বুয়া আবদুল
বিজ্ঞরা ভেবে কয় ওরা হলো জন্তুও
পশুর অধম সব বিলকুল ।

দিক

একদিকে বে-আদব
ডব্লিউ বুশ
যার সাথে গাঁটছড়া
বেঁধে আছে রুশ।

ইহুদিরা যার সাথে
মিলিয়েছে হাত্ হাতে
দুনিয়ার বদমাশ
করে খুসখুস!

একদিকে শয়তান
ডব্লিউ বুশ;
আর দিকে আফগান-
জনতার হুঁশ!

যার সাথে কাঁধে কাঁধ
মুজাহিদ ও জেহাদ:
ঈমানের চিরতর-
তাজা ফুসফুস

একদিকে খচ্চর
বদমাস্ বুশ
আর দিকে আল্লার
দেয়া এ্যান্মুশ!

একদিকে আল্লা'র
দেয়া এ্যান্মুশ
আর দিকে আমেরিকা!
ধ্যাত্তরি ধুস।

হরতাল করবো না

ক্ষমতায় থাকাকালে আংগুল নাচিয়ে
হরতাল করবো না বলতেন
জনতার খেদমতে দেশ-দরদী সেজে
কিভাবে সারাদেশে চলতেন ।

তারপর ভোট শেষে সংসদ
ঘুরে গেলো, হারালেন মসনদ
মুখোশটা খুলে গেলো রাতারাতি
গুরু হলো ফের তার মাতামাতি ।

নানাবিধ মিথ্যার অজুহাতে নিত্য
হরতাল ডাকা শুরু করলেন
মানুষের স্বাভাবিক জীবনের শান্তি
নষ্টের পথটাই ধরলেন ।

এইসব কথা শুনে একলোক
বললেন গলা ঝেড়ে গিলে ঢোক
যতোই ধোও না কেনো কয়লা
কয়লাই থাকে নিয়ে ময়লা ।

শত্রু মাদরাসার

দ্বীন ইসলামের শত্রু যারা
তারাই শত্রু মাদরাসার;
তারাই শত্রু দেশ-জনতার
স্বপ্ন-আশা-আকাজ্জার ।

আল্লা'তালার দূশমনেরা
চায় না দ্বীনি প্রতিষ্ঠান
অসহ্য যে তাদের কাছে
শিক্ষা-দীক্ষায় আল কোরান ।

দাড়ি-টুপি দেখলে যাদের
রাগের চোটে গা জ্বলে
হাবি-জাবি- ধানাই-পানাই
যার-যা-খুশি তাই বলে ।

ইমাম-মাশায়েখ-উলামা
যাদের পথের কাঁটা হয়
মৌলবাদের ধূয়া তুলে
নিত্য মারে কাঁটা হয় ।

হেফজখানায় তারাই খোঁজে
জংগীবাদের আস্তানা
তারাই খোঁজে মকতবে ফের
বিন লাদেনের আস্তানা ।

ভালো মানুষ খাঁটি মানুষ
তারাই গড়ার বিরুদ্ধে
সত্য-ন্যায়ের মূলোচ্ছেদে
তারাই নামে যে যুদ্ধে ।

তারা কেবল মাদরাসা আর
মসজিদেরই শত্রু নয়
স্বাধীনতার শত্রু তারা—
সবাই তাদের দালাল কয় ।

দালাল দালাল দালাল এরা
আন্ত দালাল ইন্ডিয়ার;
ইহুদিদের আসল দালাল
সিরিয়াস এন্ড সিসিয়ার ।

স্বাধীনতার পদ্য

এক.

স্বাধীনতা স্বাধীনতা
অরক্ষিত হয় যদি তা
জাতির কপাল ভাঙবে তবে
মাটি হবে প্রবিক্ষিতা
বাগা হবে ভূ-শুষ্টিতা।

দুই.

স্বাধীন হবার পরেও যদি
ভিন্ন দেশের ভৃত্য থাকে
কে তারে কয় স্বাধীন জাতি
সবাই তারে গোলাম ডাকে;
মর্যাদা কেউ দেয় না তাকে।

তিন.

নদী বানায় মরুর ভূমি
মাঠের ফসল শুকিয়ে মারে;
দেশের আসল শত্রু সে-ই
চিনে রাখে সবাই তারে;
সে আমাদের মিত্র নারে।

চার.

স্বাধীন জাতির স্বাধীন স্বভাব-
নিজের পথে নিজেই চলা
নিত্য থোড়াই কেয়ার করা
অন্য জাতির ছন্দাকলা;
অন্য জাতির লম্বা গলা!

পাঁচ.

স্বাধীনচেতা মানুষরাই
স্বাধীন হ'তে ডাকতে পারে
তারো চেয়ে স্বাধীন মানুষ
স্বাধীনতা রাখতে পারে;
চির স্বাধীন থাকতে পারে ।

ছয়.

পুরো স্বাধীন নয় যে জাতি—
উন্নতি তার থমকে দাঁড়ায়
অশুভ সব শক্তিগুলো
সুযোগ মতো কু-হাত বাড়ায়;
কুপিত কল্-কাঠি নাড়ায় ।

সাত.

স্বাধীনতার জন্য এখন
সিসাঢালা প্রাচীর সমান
ঐক্য অশেষ খুব প্রয়োজন;
খুব জরুরি শক্ত ঈমান
রাখতে উঁচু বিজয় নিশান ।

সং সঙ্গ

সং সঙ্গের মূল্য বোঝে না
এখনো অনেক আকা
অসং সঙ্গে মিশে ছেলে মেয়ে
তাইতো মারছে ডাকা ।

নৈতিকতার কক্ষে লেগেছে
ছারখার করা অগ্নি
বোনের আদরে ভাই চলে-ফেরে
ভাইয়ের আদরে ভগ্নি !

সততার নাম বোকামি এখন
শঠ-জুয়াচোর সাচ্চা
ক্ষমতার চাবি হাতে নিয়ে ঘোরে
হারামজাদার বাচ্চা ।

নও ঘষেটি

আমার এদেশ অন্যদেশের
অঙ্গ করার অঙ্গীকার
পূর্ণ করার প্রশ্নে এখন
নীরব থাকার ভঙ্গী কার?

কে দু-দেশে একই মুদ্রা চায়?
কে মেতেছে গোপন বাসনায়??
কে খুশি নয় দেশের সীমানায়???
সবাই জানে সে কার দালাল?
সে আসলে সঙ্গী কার?

এক-শত-ভাগ কাদের সে তুরূপ?
তিলক মেখে দেখায় কে স্বরূপ??
মুখ্যমন্ত্রী বললে থাকে চুপ???
তাই আছে কি জানতে বাকি...
'নও ঘষেটি' ভঙ্গী কার?

ঘোলা পানিতে মাছ শিকারীরা

ঘোলাটে পানিতে মাছ শিকারীরা কজন-
কোরাসে গাইছে পদত্যাগের ভজন ।

পঁচা-লাশ-খোর ভূতগুলো নিজেরাই
হাবিজাবি নিয়ে করেছে কতো না জেরাই
'কী হনু'র মতো চাগিয়ে বিশাল ওজন ।

জ্ঞানপাপীগুলো বগলে রেখেই ইট
নাটক করেছে সেজে গো শেখ ফরিদ ।

মীরজাফরের পরিণাম দেখে নাও
সময় আসছে- সিরাজের গাঁথা গাও
পদত্যাগীরা বেচুক দাঁতের মাজন ।

বস

কোথায় আছে বসের জায়া
কোথায় আছে জামাই
সময় থাকতে তাদের ধরো
করো কিছু কামাই ।

তেল মারারই যাচ্ছে সময়
এই তরিকায় হচ্ছে সদয়-
হর-কেসেমের বসেরা সব
বসের ভাগ্নে-মামাই ।

স্বজনপ্রীতির বইছে জোয়ার-
সুযোগ কাজে লাগাও
সবধরনের দুর্নীতির ঐ
স্বভাবগুলো জাগাও ।

চামচা না হয় জ্বী হুজুর হও
তলে তলে তল্লাটী বও
ওপর তলায় উঠতে এবার
জোরসে ধরো ধামাই ।

রাজনীতিবিদ

এক.

কথা কয় মনে হয় সে-কসাই
রামদাও দিয়ে যেনো মেরে চলেছে
মনে হয় ফণা তুলে কালো সাপ
হিস্-হিস্-বিষ ঢেলে চলেছে ।

করবেই কোনো অনাসুষ্টি !
দুই চোখে খুনিয়ার দৃষ্টি ।

দুই.

স্বভাবের ঠিক নেই অস্বাভাবিক
নাম তার দেয়া যায় বর্ণচোরা
রীতিমত লম্পট চোর লর্ড ক্লাইড !
জাতি তারে মনে করে নষ্টঘোড়া ।

কাজ তার বসে বসে পানি ঘোলা করা
কোন্ দিকে গেলে লাভ সেই বাজি ধরা;
বিশ্ববেহায়া বলে কেউ তাকে ডাকে
দুনীতি-সম্রাট বলে ফাঁকে ফাঁকে !

তিন.

কথা বলে কমকম গম্ভীর বেশ
চলায়-ফেরায় তবু খুব সাধারণ
বাতিলের সম্মুখে সদা উঁচুশির
দেশ-জনতার বড় আত্মভাজন ।

ছোটবেলা থেকে তার ভক্ত আমি,
সইতে পারি না তার কোনো বদনামি ।

চাৱ.

মহানেত্ৰীই তাৱ ঠিক উপাধি-
দেশোত্তমাৱ মতো দৃষ্টি তবু;
মানতে চান না তিনি বিদেশী প্ৰভু
দৃঢ়চেতা মনোবল অস্ত-আদি ।

জনগণ যতো হোক গৰিব-দুখী
তাঁকে ভালোবেসে আজো রয়েছে সুখী ।

ফারাক্কা

এক.

ভাসলো যখন আমার এ-দেশ
ঠিক তখনই ভারতের
আসল পানিমন্ত্রী মশাই
জাত-বিজেপির আড়তের !
বুঝিয়ে দিতে পানির হিসাব-
দাঁত কেলিয়ে বলতে 'কি সাব
চুক্তিমতো পেলেন পানি?
লাগলে দেবো আরো ডের ।'

দুই.

যে ফারাক্কা ডুবিয়ে মারে
ফি-বছরই বন্যায়
সেই ফারাক্কা নিয়ে কোনো
কন না কথা কন্যায় !
কন না কেনো কারণ কি
দিল্লীর আছে বারণ কি
নাকি ভারত-মাতা-রে তার
কিছুই বলা অন্যায় !!

তিন.

চুক্তি-ফুক্তি সবই ফানুস !
চুক্তি করে হয় কি?
চুক্তি করে দেশ দেয়া যায়-
যায় ডোবানো নয় কি?

মীর জাফরের চুক্তি
দেশ বিকানোর যুক্তি ।

বিজয় বিজয়

বিজয় দিবস নাকি অন্যের
বিজয় দিবস নাকি
হানাদার ভারতীয় সৈন্যের
মানে না এ-সব কথা জনগণ
হোক না সে কথাগুলো
ভারতের পোষা কোনো কন্যের ।

দালাল দালাল চির দালালই
দালালি করেই করে
তলে তলে হারামটা হালালই

বিজয় বিজয় শুধু আমাদের
রাতদিন স্বাধীনতা
স্বাধীকার নিয়ে মাথা ঘামাদের ।

লিমেট্রিক

এক.

রাজনীতিতে অভদ্রতার প্রভাব পড়ছে খুব
বদলে যাচ্ছে রাজনীতিরই কল্যাণীয়া রূপ
যে যার মতো করছে ক্ষতি
হোক সে জামাই-ভগ্নিপতি
সুযোগ মতো মারছে গুঁতো থাকছে না কেউ চুপ।

দুই.

রাজনীতিতে খিস্তি খেউড় বাড়ছে নিত্যদিন
এই ব্যাপারে একটি পক্ষ দক্ষ সীমাহীন
নেত্রী তাদের রঙহেডেড আর
সাক্ষপাঙ্গ ঘোর-ত্যাড়া-ঘাড়
এই অবস্থা থেকে মুক্তির সম্ভাবনা ক্ষীণ।

তিন.

রাজনীতিতে সহিংসতার দাপট যাচ্ছে বেড়ে
নিত্যদিনই নিচ্ছে জীবন সহিংসতাই কেড়ে
ভণ্ডগণতন্ত্র সেবক
গণতন্ত্রের দিচ্ছে সবক
গণতন্ত্রের লেবাসে তাই দেও আসছে তেড়ে।

চার.

রাজনীতিতে গণতন্ত্র জিততে পারছে না
আমজনতা গণতন্ত্র শিখতে পারছে না
যে-ভাবে হোক নির্বাচনই
করতে হবে তাই এখনই
তা না হলে গণতন্ত্র টিকতে পারছে না।

ধর্মের কল

দুষ্টচক্র চক্রান্তের যতোই সুযোগ পাক না কেনো
গোপন-গভীর ষড়যন্ত্রের যতোই সুযোগ থাক না কেনো
একদিন সব ছদ্মবেশীর যায় গো মুখোশ খুলে
আসল সত্য বিকশিত হয় সবার মর্মমূলে ।।

সূর্য কখনো ঘনকালো মেঘে ঢাকা পড়ে থাকে অলঙ্কে
পূর্ণ বিকাশ ঘটে তবু তার একদা আবার সব চোখে
সময় মতোই ধর্মের কল বাতাসে ওঠে যে দুলে ।।

ঘষেটি বেগম চোখে ধুলো দিতে
কতোদিন পেরেছিলো বলো ওরে
রাত ঘনীভূত হয়েছিলো তবু
গলা ছেড়ে পাখি গান গেয়েছিলো ভোরে ।

দেশের শত্রু চেনা যায় মহাসংকটে মহাদুর্যোগে
সকল শিয়াল এক সাথে ডাকে গভীর আঁধারে একযোগে
ভাটির পরেই জোয়ারের বান হাসে চিরদিন গাঙের কূলে ।।

হ্যাপি

[শাহবাগ এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হ্যাপির স্মরণে]

চাকায় চাকায় পিষ্ট হবে
আর যে কত হ্যাপি—
কতো সোনার ছেলে-মেয়ে
সমস্ত দেশব্যাপি!

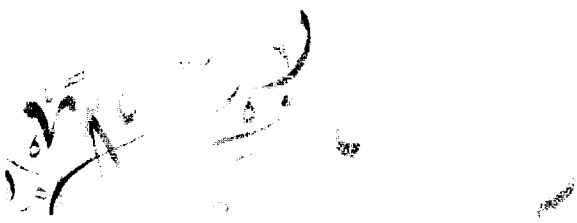
নিত্য শুধু শূন্য হবে
কতো মায়ের কোল যে!
ঘরে ঘরে উঠবে অবুঝ
কান্নাকাটির রোল যে!

ট্রাফিক পুলিশ, ট্রাফিক আইন
সবই আছে হয় রে!
তবু কেনো হ্যাপিদের আজ
জীবন চলে যায় রে!

কুরআন ও হাদীসের আলোকে কবি ও কবিতা



মতিউর রহমান মল্লিক



প্রসঙ্গ কথা

‘কুরআন ও হাদীসের আলোকে কবি ও কবিতা’ কবির একটি গুরুত্বপূর্ণ পাণ্ডুলিপি। এতে দু’টি মাত্র প্রবন্ধ রয়েছে। একটি হচ্ছে কুরআনের আলোকে কবি ও কবিতা আরেকটি হচ্ছে হাদীসের আলোকে কবি ও কবিতা। প্রবন্ধ দু’টি ২০০৫/০৬ সালের লেখা। দু’টি প্রবন্ধই প্রথম প্রকাশ পায় মাসিক ‘ছাত্রসংবাদ’ পত্রিকায়। পরবর্তীকালে প্রবন্ধ দু’টি কোনো কোনো স্মারক-সংকলনে পুনর্মুদ্রিত হয়। ‘গ্রন্থকুঞ্জ প্রকাশন’ প্রবন্ধ দু’টি একত্রে বই আকারে প্রকাশ করে ২০২৩ সালে। গ্রন্থটির প্রচ্ছদ ঐকেছেন হাশেম আলী। বইটির মূল্য ২৩০ টাকা।

কুরআনের আলোকে কবি ও কবিতা

জীবনের এমন কোনো দিক নেই যে-দিক সম্পর্কে কুরআন কোনো সমাধান দেয়নি বরং দিয়েছে সর্বোত্তম সমাধান। যে-সমাধান একান্তভাবে যুক্তিসম্মত এবং হৃদয়গ্রাহ্য। যুগে-যুগে, কালে-কালে সে-সমাধানের কাছে মানুষ পেয়েছে সন্দেহাতীত পথ চলবার প্রেরণা। অথবা নিষিদ্ধ দিক থেকে ফিরে আসবার উৎসাহ।

বস্তুত যথার্থ কোনো মুক্তিসনদ কবি ও কবিতা সম্পর্কে নীরব থাকতে পারে না। কুরআন তাই অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মতো ঐ দুটি বিষয়েও খোলাখুলি মতামত ব্যক্ত করেছে। খোলাখুলি মতামত ব্যক্ত করেছে এই জন্য যে, কবি ও কবিতাকে বাদ দিয়ে একটি পরিপূর্ণ জাতীয় জীবনচক্রকে মুদ্রিত করা যায় না; আঁকা যায় না তার আকাঙ্ক্ষিত প্রচ্ছদ।

কিন্তু কুরআন কি সমর্থন দিয়েছে সব কবিকে? সব কবিতাকে? এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি বুঝবার জন্যে কুরআনের সূরা-ই শুআরা ২২৪, ২২৫, ২২৬ এবং ২২৭ নম্বর আয়াতই যথেষ্ট।

আমি আমার এই বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে ঐ আয়াত ক’টিকে সামনে রেখে এ-যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ অন্তত চারটি তাফসীরের যে-বক্তব্য তা-ই শুধু উপস্থাপন করেছি এই জন্যে যে, শুধু সরাসরি কুরআনেরই কোনো বক্তব্য অথবা তার ব্যাখ্যায় আদৌ কোনো অসঙ্গতি অথবা কোনো অবিশ্বাস থাকবে না।

সর্বপ্রথম পেশ করা হলো ঐ চারটি আয়াত এবং তার অনুবাদ :

وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.

অর্থাৎ বিভ্রান্ত লোকেরাই কবিদের অনুসরণ করে। তুমি কি দেখা না যে, তারা প্রতি ময়দানেই উদভ্রান্ত হয়ে ফেরে? এবং এমন সব কথা বলে, যা তারা করে না। তবে তাদের কথা ভিন্ন, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং আল্লাহকে খুব স্মরণ করে এবং নিপীড়িত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে। নিপীড়নকারীরা শীঘ্রই জানতে পারবে তাদের গন্তব্যস্থল কি রূপ?

মাআরেফুল কুরআনের ভাষ্য : একটি প্রণিধানযোগ্য বিবেচনা

وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ

অভিধানে এমন বাক্যাবলীকে কবিতা বলা হয়, যাতে শুধু কাল্পনিক ও অবাস্তব বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়। এর জন্যে ছন্দ, ওজন এবং সমিল শব্দ ইত্যাদিও শর্ত নয়। তর্কশাস্ত্রেও এ-ধরনের বিষয়বস্তুকে ‘কবিতাধর্মী প্রমাণ’ এবং কবিতা-দাবিযুক্ত বাক্য বলা হয়। পারিভাষিক কবিতা ও গজলেও সাধারণত কাল্পনিক বিষয়াদিরই প্রাধান্য থাকে। তাই কবিদের ভাষায় ছন্দযুক্ত সমিল শব্দযুক্ত বাক্যাবলীকে কবিতা বলা হয়ে থাকে। কোনো কোনো তাফসীরকারক কুরআনের-

لشاعِرٍ مُّخَنَّنٍ شَاعِرٍ نَّتَرَبَّصُ بِهِ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ

যে-জ্ঞান ও শাস্ত্র অন্তরকে কঠোর করে দেয়, আল্লাহ তা’আলার স্মরণ থেকে বিমুখ করে এবং বিশ্বাসে সন্দেহ, সংশয় ও আত্মিক রোগ সৃষ্টি করে, তার বিধানও নিন্দনীয় কবিতার অনুরূপ।

ইত্যাদি আয়াতের পারিভাষিক কবিতার অর্থ ধরে বলেছেন যে, মক্কার কাফেররা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে ওজনবিশিষ্ট ও সমিল শব্দবিশিষ্ট বাক্যাবলী নিয়ে আগমনকারী বলতো। কিন্তু কেউ-কেউ বলেছেন যে, কাফেরদের উদ্দেশ্য এটা ছিল না। কারণ তাদের কবিতার রীতি-নীতি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান ছিল। বলাবাহুল্য, কুরআন কবিতাবলীর সমষ্টি নয়। একজন অনারব ব্যক্তিও এরূপ কথা বলতে পারে না; প্রাঞ্জল ও বিভ্রান্তভাষী আরবরা বলা দূরের কথা, বরং কাফেররাও তাঁকে আসল ও আভিধানিক অর্থে কবি অর্থাৎ কাল্পনিক বিষয়াদি নিয়ে আগমনকারী বলতো। তাদের উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে- নাউযুবিল্লাহ-মিথ্যাবাদী বলা। কারণ شعر কবিতা-মিথ্যার অর্থেও ব্যবহৃত হয় এবং كَذِبٌ তথা মিথ্যাবাদীকে شاعر বলা হয়। তাই মিথ্যা প্রমাণাদিকে কবিতাধর্মী প্রমাণাদি বলা হয়ে থাকে। মোট কথা এই যে, ছন্দযুক্ত ও সমিল শব্দযুক্ত বাক্যাবলীকে যেমন কবিতা বলা হয়, তেমনি ধারণাপ্রসূত আনুমানিক বাক্যাবলীকেও কবিতা বলা হয়। এটা তর্কশাস্ত্রের পরিভাষা।

وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ

আলোচ্য আয়াতে কবিতার পারিভাষিক ও প্রসিদ্ধ অর্থই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যারা ওজনবিশিষ্ট ও সমিল শব্দযুক্ত বাক্যাবলী রচনা করে, আয়াতে তাদের সমালোচনা করা হয়েছে।

ফতহুলবারীর এক রেওয়ায়েত থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। রেওয়ায়েত এই যে, এই আয়াত নাযিল হবার পর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা, হাসসান ইবনে সাবিত, কা’ব ইবনে মালেক প্রমুখ সাহাবী-কবি ত্রন্দনরত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খেদমতে উপস্থিত হন এবং আরজ করেন, ইয়া রসূলুল্লাহ,

আল্লাহ তায়ালা তো কবিদের ব্যাপারে আয়াত নাযিল করেছেন। তাহলে আমরাও তো কবিতা রচনা করি। এখন আমাদের কি উপায়? রসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, আয়াতের শেষাংশ পাঠ কর। রসূলের এটা বলার উদ্দেশ্য ছিলো এই যে, তোমাদের কবিতা যেনো অনর্থক ও ভ্রান্ত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত না হয়। কাজেই তোমরা আয়াতের শেষাংশে উল্লেখিত ব্যতিক্রমীদের শামিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে তাফসীরকারগণ বলেছেন, আয়াতের প্রথমার্শে মুশরিক কবিদেরকে বোঝানো হয়েছে। কেননা পথভ্রষ্ট লোক, অবাধ্য শয়তান ও উদ্ধত জীন তাদেরই কবিতার অনুসরণ করত এবং তা বর্ণনা করত। [ফতহুল-বারী]

ইসলামী শরীয়তে কাব্যচর্চার মান:

উল্লেখিত আয়াতের প্রথমার্শ থেকে কাব্যচর্চার কঠোর নিন্দা এবং তা আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয় হওয়া বোঝা যায়। কিন্তু শেষাংশে যে-ব্যতিক্রম উল্লেখ করা হয়েছে, তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, কাব্যচর্চা সর্বাবস্থায় মন্দ নয়, বরং যে-কবিতায় আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতা করা হয় কিংবা আল্লাহর স্মরণ থেকে বিরত রাখা হয় অথবা অন্যায়ভাবে কোনো ব্যক্তির নিন্দা ও অবমাননা করা হয় অথবা যে-কবিতা অশ্লীল ও অশ্লীলতার প্রেরণাদাতা, সেই কবিতাই নিন্দনীয় ও অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে যেসব কবিতা গোনাহ ও অপছন্দনীয় বিষয়াদি থেকে পবিত্র সেগুলোকে আল্লাহ তাআলা, *إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ*

আয়াতের মাধ্যমে ব্যতিক্রমভুক্ত করে দিয়েছেন। কোনো-কোনো কবিতা তো জ্ঞানগর্ভ বিষয়বস্তু এবং ওয়াজ ও উপদেশ সম্বলিত হওয়ার কারণে ইবাদত ও সওয়াবের অন্তর্ভুক্ত। হযরত উবাই ইবনে কা'বের রেওয়াজেতে আছে,

ان من الشعر لحكمة

অর্থাৎ, কতক কবিতা জ্ঞানগর্ভ হয়ে থাকে। (বোখারী) হাফেজ ইবনে হাজার বলেন, ঐ রেওয়াজেতে ‘হেকমত’ বলে সত্যভাষণ বোঝানো হয়েছে।

ইবনে বাত্তাল বলেন, যে কবিতায় আল্লাহ তাআলার একত্ব, তাঁর যিকির এবং ইসলামের প্রতি ভালোবাসা বর্ণিত হয়, সেই কবিতা কাম্য ও প্রশংসনীয়। উপরোক্ত হাদীসে এরূপ কবিতাই বোঝানো হয়েছে। পক্ষান্তরে যে-কবিতায় মিথ্যা ও অশ্লীল বর্ণনা থাকে, তা নিন্দনীয়। এর আরও সমর্থন নিম্নবর্ণিত রেওয়াজেতসমূহ থেকে পাওয়া যায়।

১. ওমর ইবনে শারীদ তাঁর পিতার কাছ থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সা.) আমার মুখ থেকে উমাইয়া ইবনে আবু সলতের একশ' লাইন পর্যন্ত কবিতা শ্রবণ করেন।

২. মৃতরিক বলেন, আমি কুফা থেকে বসরা পর্যন্ত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) এর সাথে সফর করেছি। প্রতি মনয়িলেই তিনি কবিতা পাঠ করতেন, শুনতেন এবং শোনাতেন।

৩. ইমাম বুখারী বলেন, হযরত আয়েশা (রা.) কবিতা আবৃত্তি করতেন।

৪. আবু ইয়ালা ইবনে ওমর থেকে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর উক্তি বর্ণনা করেন যে, কবিতার বিষয়বস্তু উত্তম ও উপকারী হলে কবিতা ভালো এবং বিষয়বস্তু মন্দ হলে ও গোনাহের হলে কবিতা মন্দ। (ফতহুল-বারী)

তাহসীরে কুরতুবীতে আছে, মদীনা মুনাওয়ারার দশজন জ্ঞানে-গরিমায় সেরা ফেকাহ বিশারদের মধ্যে ওবায়দুল্লাহ ইবনে ওতবা, ইবনে মাসউদ প্রসিদ্ধ সৃজনশীল কবি ছিলেন। কাযী যুবায়ের ইবনে বাক্বারের কবিতাসমূহ একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থে সংরক্ষিত ছিলো।

কুরতুবী আবু আমরের উক্তি বর্ণনা করেন যে, উৎকৃষ্ট বিষয়বস্তু সম্বলিত কবিতাকে জ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কেউ মন্দ বলতে পারেন না। কেননা ধর্মীয় ব্যাপারে অনুসৃত প্রধান সাহাবীগণের মধ্যে কেউ এমন ছিলেন না, যিনি কবিতা রচনা করেননি অথবা অপরের কবিতা আবৃত্তি করেননি কিংবা শোনেননি ও পছন্দ করেননি।

যেসব রেওয়াজেতে কাব্যচর্চার নিন্দা বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহর স্মরণ, ইবাদত ও কুরআন থেকে গাফেল হয়ে কাব্যচর্চায় নিমগ্ন হওয়া নিন্দনীয়। ইমাম বুখারী একে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন এবং তাতে হযরত আবু হুরায়রা এই রেওয়াজেতে উল্লেখ করেছেন :

لان يمتلى جوف رجل فيحيا يراه خير من ان يمتلى شعرا

অর্থাৎ পুঁজ দ্বারা পেট ভর্তি করা কবিতা দ্বারা পেট ভর্তি করার চাইতে উত্তম। ইমাম বুখারী বলেন, আমার মতে এর অর্থ এই যে, কবিতা আল্লাহর স্মরণ, কুরআন ও জ্ঞানচর্চার ওপর প্রবল হয়ে গেলে তা মন্দ এবং পরাভূত থাকলে মন্দ নয়। এমনভাবে যেসব কবিতা অশ্লীল বিষয়বস্তু, অপরের প্রতি ভরসনা, বিদ্বেষ অথবা অন্য কোনো শরীয়ত-বিরোধী বিষয়বস্তু সম্বলিত হয়, সেগুলো সর্বসম্মতিক্রমে হারাম ও না-যায়েয। এটা শুধু কবিতার বেলায় নয়, গদ্যে এমনি ধরনের বিষয়বস্তু বিবৃত হলে তাও হারাম। (কুরতুবী)

খলীফা হযরত ওমর (রা.) প্রশাসক আদী ইবনে নফলাকে অশ্লীল কবিতা রচনার অপরাধে পদচ্যুত করে দেন। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীম (রহ.) আমার ইবনে রবীয়া ও আবুল আহওয়াসকে এই একই অপরাধে দেশান্তরিত করার আদেশ দেন। অবশ্য আমার ইবনে রবীয়া তওবা করলে তা গ্রহণ করা হয়। (কুরতুবী)

যে-জ্ঞান ও শাস্ত্র আল্লাহ ও পরকাল থেকে মানুষকে গাফেল করে দেয়, তা নিন্দনীয়:

ইবনে আবী জমরাজ বলেন, যে-জ্ঞান ও শাস্ত্র অন্তরকে কঠোর করে দেয়, আল্লাহ তা'আলার স্মরণ থেকে বিমুখ করে এবং বিশ্বাসে সন্দেহ, সংশয় ও আত্মিক রোগ সৃষ্টি করে, তার বিধানও নিন্দনীয় কবিতার অনুরূপ।

তাকসীরে ইবনে কাসীরের ভাষ্য : একটি ঐতিহাসিক দলীল

মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন : '(কাফির) কবিদের অনুসরণ বিভ্রান্ত লোকেরাই করে থাকে।'

আরব কবিদের মধ্যে প্রচলিত ছিলো যে, কারো নিন্দায় তারা কোনো কবিতা রচনা করতো। তারপর জনগণের একটি দল তাদের পক্ষ অবলম্বন করতো এবং তাদের নিকট হতে ঐ নিন্দাসূচক কবিতা চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিতো।

একবার রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবীদের একটি দলকে সাথে নিয়ে আ'রজের দিকে যাচ্ছিলেন। পথে এমন একজন কবির সাথে তাঁদের সাক্ষাৎ ঘটে গেলো, যে-কবি কবিতা পাঠ করতে করতে পথ চলছিল। রাসূলুল্লাহ সাহাবীদের বললেন : কবিকে ধর অথবা তাকে কবিতা পাঠ করতে নিষেধ করো। কারো রক্ত-পুঁজ দ্বারা পেট পূর্ণ করা কবিতা দ্বারা পেট পূর্ণ করা অপেক্ষা উত্তম। এ-হাদীসটি ইমাম আহমদ (রা.) বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন : 'তুমি কি দেখো না যে, তারা উদ্ধাস্ত হয়ে প্রত্যেক উপত্যকায় ঘুরে বেড়ায়?'

প্রত্যেক বাজে বিষয়ের মধ্যে তারা ঢুকে পড়ে। কারো প্রশংসা করতে গিয়ে তারা তাকে একেবারে আকাশে উঠিয়ে দেয়। অন্যদিকে মিথ্যা প্রশংসা করে তারা নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করে। তারা হয় কথার সওদাগর, কিন্তু কাজে অলস। তারা নিজেরা যা করে না তাই বলে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে দু'টি লোক একে অপরকে নিন্দা করে। তাদের একজন ছিলো আনসারী এবং অপরজন ছিল অন্য গোত্রের। দুই গোত্রেরই বড় বড় লোকেরা যার যার গোত্রের পক্ষে যোগ দেয়। তাই এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, বিভ্রান্ত লোকেরাই কবিদেরকে অনুসরণ করে। তারা ঐ কথাই বলে, যা তারা নিজেরা করে না। এ-জন্যই আলেমগণ, এ-ব্যাপারে মতভেদ করেছেন যে, যদি কোন কবি নিজের কবিতার মধ্যে এমন

কোন পাপের কথা স্বীকার করে নেয়, যার উপর শরীয়তের হদ ওয়াজিব হয়, তবে তার উপর হদ জারী করা যাবে কি যাবে না?

আলেমরা দুই দিকেই গিয়েছেন। আসলে তারা ফখর-গর্ব করে এ-ধরনের কথা বলে থাকে। তারা বলে : ‘আমি এই করেছি আমি ওই করেছি’, অথচ তারা কিছুই করেনি।

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (রা.) ও মুহাম্মদ ইবনে সা’দ (রা.) তাবাকাতে এবং যুবায়ের ইবনে বিকার (রা.) কিতাবুল জিফকাহাতে বর্ণনা করেছেন যে, আমীরুল মুমিনীন হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রা.) তাঁর খিলাফতের আমলে হযরত নু’মান ইবনে আদী ইবনে ফযলা (রা.)-কে বসরার মাইসান শহরের গভর্নর নিযুক্ত করেন। তিনি ছিলেন একজন কবি। তিনি তাঁর কবিতায় একদা বলেন :

أَلَا هَلْ أَنْ الْحَسَنَاءُ أَنْ خَلِيلَهَا * بِمَيْسَانَ يَسْقَى فِي رُجَاجٍ وَخَنَمٍ
إِذَا شَبْتِ غَنَّتْنِي دَهْقِينَ قَرْيَةً * وَرُقَاصَةً تَخْنُو عَلَى كُلِّ مَيْسِمٍ
فَإِنْ كُنْتُ نَذْمَانِي فَبِالْأَكْبَرِ أَسْقَيْنِي * وَلَا تُسْقِنِي بِالْأَصْفَرِ الْمُتَمَلِّمِ
لَعَلَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَسْؤُهُ * تُنَادِي مِنَّا بِالْجَوْسِقِ الْمُتَهَدِّمِ

‘সুন্দরী মহিলারা কি এ-খবর পায়নি যে, তাদের প্রেমিক মাইসানে অবস্থান করছে? যেখানে সদা-সর্বদা সিসার গ্রাসে মদ্যচক্র চলছে?

আর গ্রামের তরুণীরা নাচ-গানে মগ্ন রয়েছে?

হ্যাঁ, যদি আমার কোনো বন্ধু দ্বারা এটা সম্ভব হয়

তবে সিসার গ্রাসের চেয়ে বড় ও পূর্ণ মদ্যের গ্রাস দ্বারা আমাকে পান করাতে পারে।

মূলত ছোট গ্রাস আমার নিকট খুবই অপছন্দনীয়।

অন্যথায় তিনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন এবং আমাকে শাস্তি দেবেন।

আল্লাহ রক্ষা করুন, যেনো আমীরুল মুমিনীনের কাছে এ-খবর না পৌঁছে।’

ঘটনাক্রমে সত্যিই এ-কবিতাগুলো আমীরুল মুমিনীন হযরত উমার (রা.)-এর নিকট পৌঁছে যায় এবং সাথে-সাথেই তিনি লোক পাঠিয়ে তাঁকে পদচ্যুত করেন এবং তিনি একটি চিঠিও পাঠান। ঐ চিঠিতে তিনি লেখেন :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، غَافِرِ الذَّنْبِ
وَقَبْلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطُّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَهِي الْمَصِيبُ، أَمَا بَعْدَ فَقَدْ
فَلَعْنِي وَإِيَّاهُ إِنَّهُ لَأَسْؤُورُنِي وَقَدْ عَزَلْتُكَ

অর্থাৎ ‘দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। হা-মীম। এই কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর নিকট হতে, যিনি পাপ ক্ষমা করেন, তওবা কবুল করেন, যিনি শাস্তিদানে কঠোর শক্তিশালী এবং তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। প্রত্যাবর্তন তাঁরই নিকট। অতঃপর আমার কাছে তোমার

কবিতার কথা পৌছেছে। আল্লাহর কসম! অবশ্যই ঐ কবিতা আমাকে অসম্ভব করেছে। তাই আমি তোমাকে পদচ্যুত করলাম।’

এ-চিঠি পাঠমাত্রই হযরত নু’মান (রা.) উমার (রা.)-এর দরবারে হাজির হয়ে যান এবং অত্যন্ত ভদ্রতার সাথে আরম্ভ করেন : ‘হে আমীরুল মুমিনীন, আল্লাহর শপথ! আমি কখনো মদ্যপান করিনি, নাচও দেখিনি, গান-বাজনাও করিনি। এ-কাজটা তো শুধু (কবিতাগুলো) আবেগ-উচ্ছ্বাসে করে ফেলেছি।’

তাঁর এই কথা শুনে আমীরুল মুমিনীন বলেন : ‘আমারও ধারণা তা-ই। কিন্তু আমি তো এটা সহ্য করতে পারি না যে, অশ্লীলভাষী কবিকে কোনো পদে রেখে দিই।’

তাহলে বুঝা গেলো যে, হযরত উমর (রা.)-এর মতেও কবি যদি তার কবিতার মাধ্যমে এমন কোন অপরাধের কথা ঘোষণা করে যা হদের যোগ্য, তবুও তাকে হত মারা যাবে না। কেননা, সে বলে বটে, কিন্তু করে না। তবে নিঃসন্দেহে সে তিরস্কার ও নিন্দার যোগ্য।

হাদীসে আছে যে, ‘রক্ত, পুঁজ দ্বারা পেট পূর্ণ করা কবিতা দ্বারা পেট পূর্ণ করা অপেক্ষা উত্তম।’

আল্লাহ বলেন : وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ^১ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ

অর্থাৎ ‘আমি রাসূল (সা.)-কে কাব্যরচনা করতে শিখাইনি এবং এটা তার পক্ষে শোভনীয়ও নয়, এটাতো শুধু একটি উপদেশ এবং সুস্পষ্ট কুরআন’। (৩৬.৬৯)

ভাবার্থ এই যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) কবিও নন, জাদুকরও নন, ভবিষ্যদ্বক্তাও নন এবং মিথ্যা আরোপকারীও নন। তাঁর বাহ্যিক অবস্থাই তাঁর দোষ হতে মুক্ত হওয়ার বড় সাক্ষী। যেমন মহামহিমাম্বিত আল্লাহ আর এক জায়গায় বলেন :

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ^২ قَلِيلًا مَّا تُوْمَنُونَ. وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ^৩ قَلِيلًا مَّا تَذْكُرُونَ. نَزَّلَ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ

অর্থাৎ ‘এটা কোনো কবির রচনা নয়, তোমরা অল্পই বিশ্বাস কর। এটা কোন গণকের কথাও নয়, তোমরা অল্পই অনুধাবন কর।’

অনুরূপভাবে এখানে তিনি বলেন :

وَإِنَّهُ لَنَزْلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ. نَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ. عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ. يَلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ

অর্থাৎ ‘আর নিশ্চয়ই এটা (আল-কুরআন) জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ। জিবরাঈল (আ.) এটা নিয়ে অবতরণ করেছে তোমার হৃদয়ে,

যাতে তুমি সতর্ককারী হতে পার। অবতীর্ণ করা হয়েছে সুস্পষ্ট আরবি ভাষায়।’ (২৬: ১৯২-১৮-১৯৫) এ-সূরারই আর একটি জায়গায় তিনি বলেছেন : ‘শয়তানরা ওটাসহ অবতীর্ণ হয়নি। তারা এ-কাজের যোগ্য নয় এবং তারা এর সামর্থ্যও রাখে না। তোমাদেরকে তো শ্রবণের সুযোগ হতে দূরে রাখা হয়েছে।’

এর আরো কিছু পরে বলেছেন : ‘তোমাদেরকে কি আমি জানিয়ে দেবো কার কাছে শয়তানরা অবতীর্ণ হয়? তারা তো অবতীর্ণ হয় প্রত্যেকটি ঘোর মিথ্যাবাদী ও পাপীর নিকট। তারা কান পেতে থাকে এবং তাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী। আর কবিদেরকে অনুসরণ করে তারা যারা বিভ্রান্ত। তুমি কি দেখো না তারা উদ্ভ্রান্ত হয়ে প্রত্যেক উপত্যকায় ঘুরে বেড়ায়? এবং যা করে না, তা বলে।’

এরপরে যা রয়েছে তার শানে নুযূল এই যে, এর পূর্ববর্তী আয়াত যখন অবতীর্ণ হয়- যাতে কবিদেরকে নিন্দে করা হয়েছে- তখন নবী (সা.)-এর দরবারের কবিরা যেমন হযরত হাস্‌সান বিন সাবিত (রা.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা.) এবং হযরত কা’ব ইবনে মালিক (রা.) ত্রন্দনরত অবস্থায় নবী (সা.)-এর দরবারে হাজির হয়ে বলেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! তাহলে তো কবিদের অবস্থা খুবই শোচনীয়। আমরাও তো কবি- সুতরাং আমরাও তো তাহলে নিন্দনীয়?’ তৎক্ষণাৎ রাসূলুল্লাহ (সা.) পরবর্তী আয়াতটি পাঠ করেন এবং বলেন : ‘ঈমান আনয়নকারী ও সৎকর্মশীল তোমরাই এবং আল্লাহকে বারবার স্মরণকারীও তোমরাই। তোমরাই অত্যাচারিত হবার পর প্রতিশোধ গ্রহণকারী। সুতরাং তোমরা এদের হতে স্বতন্ত্র।’

অন্য একটি রেওয়াইয়াতে হযরত কা’ব (রা.)-এর নাম নেই। একটি রেওয়াইয়াতে শুধু আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা.)-এর কথা আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে হাজির হয়ে বলেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! আমিও তো কবি?’ তাঁরই একথার পরিপ্রেক্ষিতে- **إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ**

এ-আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার কথা বর্ণিত আছে।

কিন্তু এ-ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনার অবকাশ রয়েছে। কেননা, এটা মক্কী সূরা। আর আনসার কবিরা মক্কায় ছিলেন না। তাঁরা সবাই ছিলেন মদীনায়ে। কাজেই তাঁদের ব্যাপারে এ-সূরা অবতীর্ণ হওয়া অসম্ভব বটে।

অন্যদিকে যে-হাদীসগুলো বর্ণিত হয়েছে সেগুলো মুরসাল। সুতরাং এগুলোর ওপর ভরসা করা যায় না। তবে এ-আয়াতটি যে স্বাতন্ত্র্যের ব্যাপারেই অবতীর্ণ হয়েছে তাতে সন্দেহের লেশ মাত্র নেই। আর এই স্বাতন্ত্র্য শুধু এই আনসার কবিদের ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং যে-কোনো কবি তার অজ্ঞতার যুগে যদি ইসলাম ও মুসলমানদের বিপক্ষে কবিতা লিখে থাকে, অতঃপর মুসলমান

হয়ে গিয়ে তওবা করে থাকে এবং পূর্বের দুষ্কর্মে ক্ষতিপূরণ হিসেবে বারবার আল্লাহকে স্মরণ করে থাকে তবে তারাও নিন্দনীয় কবিদের হতে স্বতন্ত্র হবে। কেননা সৎ কার্যাবলী দুষ্কর্মগুলোকে মিটিয়ে দেয়।

তাহলে সে যখন কবিতার মাধ্যমে মুসলমানদের দুর্নাম করেছিলো এবং আল্লাহর দীনকে মন্দ বলেছিল, তখন সেটা নিঃসন্দেহে মন্দ কাজই ছিলো। কিন্তু পরে যখন সে মুসলমানদের ও ইসলামের প্রশংসা করলো তখন ঐ দুষ্কর্ম সৎকর্মে পরিবর্তিত হয়ে গেলো।

যেমন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যাবআরী (রা.) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দুর্নাম করেছিলেন। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর বড়ই প্রশংসা করেছিলেন এবং পূর্বে যে তিনি তাঁর দুর্নাম করেছিলেন, কবিতার মাধ্যমে তার জন্য তিনি ওজর পেশ করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে, ঐ সময় তিনি শয়তানের খপ্পরে পড়েছিলেন।

অনুরূপভাবে হযরত আবু সুফিয়ান ইবনে হারিস (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চাচাতো ভাই হওয়া সত্ত্বেও তাঁর একজন বড় শত্রু ছিলেন এবং কবিতার মাধ্যমে তাঁর খুবই দুর্নাম করতেন। কিন্তু যখন তিনি মুসলমান হলেন তখন এমন পাকা মুসলমান হলেন যে, সারা দুনিয়ায় রাসূলুল্লাহ (সা.) অপেক্ষা বড় প্রিয়জন তাঁর কাছে আর কেউ ছিলো না প্রায়ই তিনি তাঁর প্রশংসা করতেন এবং তাঁর সাথে অত্যন্ত ভালোবাসা সম্পর্ক বজায় রাখতেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত যে, হযরত আবু সুফিয়ান সাখর ইবনে হারব যখন মুসলমান হন তখন তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলেন : হে আল্লাহর রাসূল (সা.), আমাকে আপনি তিনটি জিনিস দান করুন।

প্রথম এই যে, আমার পুত্রকে আপনার লেখক- অর্থাৎ অহী লেখক- বানিয়ে নিন। সাথে একদল সৈন্য প্রেরণ করুন যাতে আমি কাফিরদের সাথে লড়াইতে পারি যেমন আমি মুসলমানদের সাথে লড়াইতাম।

তাঁর এই দুটি আবেদনই রাসূলুল্লাহ (সা.) কবুল করে নেন। তৃতীয় আর একটি আবেদন তিনি করেন এবং সেটাও গৃহীত হয়।

সুতরাং এই লোকদেরকে পূর্ববর্তী আয়াতের হুকুম হতে পরবর্তী আয়াত দ্বারা পৃথক করা হয়েছে। আল্লাহর অধিক স্মরণ তাঁরা তাঁদের কবিতার মাধ্যমেই করুন অথবা অন্য কোনো প্রকারে করুন, নিশ্চিতরূপে তা তাঁদের পূর্ববর্তী পাপসমূহের কাফ্যারা হয়ে যাবে।

মহান আল্লাহর উক্তি : ‘তারা অত্যাচারিত হবার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে’ অর্থাৎ কবিতার মাধ্যমে তাঁরা কাফিরদের নিন্দামূলক কবিতার জবাব দিয়ে থাকেন।

যেমন সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত হাস্‌সান (রা.)-কে বলেছিলেন : ‘তুমি কাফিরদের নিন্দা করে কবিতা রচনা কর, হযরত জিবরাঈল (আ.) তোমার সাথে রয়েছেন।’

হযরত কা’ব ইবনে মালিক (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন তিনি কুরআনপাকে কবিদের নিন্দা শোনেন, তখন তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট আরজ করেন: ‘আল্লাহ তা’আলা কবিদের সম্পর্কে যা নাজিল করার তা তো নাযিল করেছেন-তাহলে আমিও কি তাদেরই অন্তর্ভুক্ত?’

তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন : ‘-না, না, তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নও। জেনে রেখো যে, মুমিন তরবারি ও জিহ্বা দ্বারা জিহাদ করে থাকে। যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! তোমাদের কবিতাগুলো তো তাদেরকে কাফিরদেরকে মুজাহিদদের তীরের ন্যায় এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়েছে।’

তাকসীরে ফী জিলালিল কুরআনের ভাষ্য : একটি সন্দেহহীন সিদ্ধান্ত

পবিত্র কুরআন স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিচ্ছে যে, রাসূলের আদর্শ ও কুরআনের আদর্শ কখনও কোনো কবি সাহিত্যিকের আদর্শের মতো নয়। এই দুই আদর্শের মাঝে বিরাট ব্যবধান রয়েছে। কারণ, এই পবিত্র কুরআন সুস্পষ্ট আদর্শ নিয়ে চলে, নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি আহ্বান করে এবং এই লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য সহজ-সরল পথ অনুসরণ করে।

অপরদিকে রাসূল (সা.)-এর বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি যা বলেন তার বরখেলাপ করেন না। তিনি আবেগ ও খেয়াল-খুশি দ্বারা পরিচালিত হন না। তিনি অস্থির চিন্তের মানুষও নন। বরং একটা সুনির্দিষ্ট আদর্শের প্রতি মানুষকে আহ্বান করেন। তিনি নিজেও এই আদর্শের ওপর অটল এবং এই বিশ্বাসের ওপর অনড় যে আদর্শের তিনি ধারক ও বাহক তাতে কোনো বক্রতা নেই, তাতে কোন বিভ্রান্তির অবকাশ নেই অথচ যারা কবি ও সাহিত্যিক তাদের মাঝে এই গুণগুলো নেই। কারণ কবি-সাহিত্যিকরা হচ্ছে অস্থির চিন্তের মানুষ। তারা আবেগ ও কল্পনার কাছে ইচ্ছামতো একবার দেখে কালো আর একবার দেখে সাদা। সম্ভ্রষ্ট থাকলে বলে এক কথা, আর অসম্ভ্রষ্ট থাকলে বলে আরেক কথা। মোটকথা, এরা হচ্ছে অস্থির চিন্তের অধিকারী। এদের মন-মেজাজের কোন ঠিক-ঠিকানা নেই।

এ-ছাড়া এ-সব কবি-সাহিত্যিকরা নিজেরা কল্পনার জগত সৃষ্টি করে এবং সেখানেই বাস করতে থাকে। কল্পনা ও আবেগের বশবর্তী হয়ে-হয়ে এরা এমন অনেক কথাই বলে যার সাথে বাস্তব জীবনের কোনোই মিল নেই, কোনোই সম্পর্ক নেই। ফলে তারা নিজেরাই সেসব কথার বিপরীতে চলতে বাধ্য হয়। এরা খুব কমই বাস্তবমুখী হয়ে থাকে। এদের কথা ও কাজে কোনো মিল নেই।

কিন্তু যিনি একটি নির্দিষ্ট আদর্শের প্রতি মানুষকে ডাকেন। যিনি বাস্তব জীবনে একটি আদর্শের বাস্তবায়ন চান তাঁর, কথা ও কাজ এমনটি হয় না। কারণ তাঁর সামনে একটি লক্ষ্য থাকে, আদর্শ থাকে, একটা পছন্দ থাকে, তিনি চোখ-কান খোলা রেখে এবং সম্পূর্ণ সচেতনভাবে সেই লক্ষ্য ও আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট পছন্দ অবলম্বন করে থাকেন। তিনি এ-ক্ষেত্রে কোনো কল্পনাকে প্রশ্রয় দেন না, কোনো খেয়ালের জগতে বাস করেন না এবং স্বপ্নের মাঝে ডুবে থাকেন না। তিনি হচ্ছেন বাস্তব দুনিয়ার বাসিন্দা। কাজেই তাঁর প্রতিটি কথা ও কাজ হয় বাস্তবমুখী।

এই হিসেবে রাসূলের আদর্শের মাঝে এবং কবিদের আদর্শের মাঝে তফাত রয়েছে। এ-ব্যাপারে সংশয়-সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কারণ বিষয়টি খুবই সুস্পষ্ট। বস্তুত আয়াতে সে কথাই বলা হয়েছে, ‘বিদ্রান্ত লোকেরাই কবিদের অনুসরণ করে।’ (আয়াত ২২৪-২২৬)

হ্যাঁ, আয়াতে সুস্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে যে, কবি-সাহিত্যিকরা হচ্ছে খেয়াল-খুশির দাস। মনে যা আসে তাই তারা করে ও বলে। কাজেই যারা লক্ষ্যহীন, আদর্শহীন, বিদ্রান্ত ও খেয়াল খুশির হাতে বন্দী কেবল তারাই এ-সব কবি-সাহিত্যিকদের অনুসরণ করে থাকে।

ঐ কবি-সাহিত্যিকরাই কল্পনা, জল্পনা এবং আবেগ-অনুভূতির স্বপ্নীল জগতে বিচরণ করে। আবেগতাড়িত হয়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম কথাবার্তা বলে। এদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- এরা যা বলে নিজেরাই তাই করে না। কারণ এরা কাল্পনিক জগতের বাসিন্দা। এরা কঠিন বাস্তব জীবন থেকে পলায়ন করে। ফলে এমন অনেক কথাই বলে থাকে, যা করার মতো সামর্থ্য তাদের থাকে না। কারণ এ-সব কথাবার্তা হচ্ছে বাস্তবতাবিবর্জিত ও কাল্পনিক গাল-গল্প। বাস্তব ও চাক্ষুষ জীবনের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

ইসলাম হচ্ছে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগের জন্য এই বিধানের প্রবর্তন হয়েছে। এটা এমন একটি বিশাল সংগ্রাম যার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক হচ্ছে আত্মার সাথে এবং দৃশ্যমান জগতের সাথে। কাজেই এই জীবনবিধান

তথা ইসলামের প্রকৃতি ও স্বভাব কখনও কোনো কবির স্বভাব ও মানসিকতার সাথে সামঞ্জস্যশীল হতে পারে না। মানব-ইতিহাস হচ্ছে এর প্রধান সাক্ষী। কারণ একজন কবি মূলত তার চেতনা ও কল্পনার মাধ্যমে স্বপ্নীল জগত সৃষ্টি করে তাতেই অবগাহন করতে আনন্দ পায়। পক্ষান্তরে ইসলাম স্বপ্নকে বাস্তবরূপ দান করতে প্রয়াসী হয় এবং এর জন্য মানুষের গোটা চিন্তা-চেতনাকে কাজে লাগাতে চায়।

ইসলাম চায়, মানুষ কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হোক, এই কঠিন বাস্তবতা থেকে পলায়ন করে মানুষ কাল্পনিক জগতের বাসিন্দা হোক, এটা কখনো ইসলামের কাম্য নয়। যদি এ-সব কঠিন বাস্তবতা তাদের পছন্দনীয় না হয় এবং ইসলামের আদর্শের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ না হয় তখন ইসলাম তাদেরকে এ-সব বাস্তবতার পরিবর্তনের জন্য এবং ইসলামী আদর্শের বাস্তবায়নের জন্য উদ্বুদ্ধ করে। এর ফলে স্বপ্নীল ও কাল্পনিক জগতের কোনো শক্তিই আর মানুষের অবশিষ্ট থাকে না, তখন গোটা মানবশক্তি এক মহান আদর্শের বাস্তবায়নেই ব্যবহৃত হয়।

এতোদ সত্ত্বেও ইসলাম কাব্য ও শিল্পের বিরোধী নয়। আলোচ্য আয়াতের মর্ম থেকে সেটাই বুঝা যায়। তবে যে আদর্শ ও বিষয়বস্তুর ওপর ভিত্তি করে যে কাব্য ও শিল্প গড়ে উঠেছে, সেটা ইসলামের দৃষ্টিতে অনেকাংশ সমর্থনযোগ্য নয়। কল্পনাসর্বস্ব যে-আদর্শ মানুষকে বাস্তবতাবিবর্জিত কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে রাখে- তা কখনও ইসলাম সমর্থন করতে পারে না। তবে কারো গোটা মন-মানসিকতা ও চিন্তা-চেতনা ইসলামের আলোকে আলোকিত হয়ে পড়লে এবং ইসলামী ভাবধারায় সংগঠিত হয়ে উঠলে অবশ্যই তার কাব্য ও শিল্প ব্যবহারিক কল্যাণ সাধন করে থাকে। অর্থাৎ ইসলাম চায় না শিল্প কেবলই কল্পনা ও আবেগসর্বস্ব হয়ে পড়ুক, বাস্তবজীবনের পরিবর্তে কল্পনার জগত সৃষ্টি করুক এবং বাস্তবজীবনকে বিকৃত, নোংরা ও পচাদপদ অবস্থায় ফেলে রাখুক।

কোনো মানুষের জীবনের লক্ষ্য ও আদর্শ যদি ইসলাম হয়, তাহলে সে প্রতিটি বস্তুকেই ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার চেষ্টা করবে এবং শিল্প ও সাহিত্যে তার প্রকাশও ঘটাবে সে একই দৃষ্টিভঙ্গিতে। আর এ-পর্যায়ের শিল্প ও সাহিত্যকে ইসলাম কখনও ঘৃণা করে না। আমরা জানি, পবিত্র কুরআনে মানুষের হৃদয়-মন ও চিন্তা-চেতনাকে প্রকৃতির সৌন্দর্যের প্রতি এবং মানবাত্মার রহস্যের প্রতি আকৃষ্ট করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এ-সবই হচ্ছে শিল্প ও সাহিত্যের মৌলিক উপাদান। প্রকৃতির সৌন্দর্যকে পবিত্র কুরআন যে-পর্যায়ের স্বচ্ছতা ও হৃদয়গ্রাহী করে প্রকাশ করেছে তা কখনও মানবরচিত কাব্য দ্বারা সম্ভবপর নয়।

পবিত্র কুরআন যে-সব কবিদেরকে অস্বীকার করে না, নিন্দা করে না, তাদের বৈশিষ্ট্যগুলো সে এভাবে বর্ণনা করেছে, 'তবে তাদের কথা ভিন্ন, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে।' (সূরা শুআরা- ২২৭)

অর্থাৎ সাধারণ কবি-সাহিত্যিকদের তুলনায় এরা সম্পূর্ণ ভিন্ন গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এদের হৃদয় ঈমানের দ্বারা ভরপুর। এরা আদর্শবান। এরা সৎ, কাজেই এদের গোটা শক্তি ও প্রতিভা কল্যাণ সাধনে এবং সৌন্দর্য বিকাশে নিয়োজিত। এরা নিছক কল্পনাবাদী নয়, ভাববাদীও নয়, এরা কঠোর পরিশ্রমী ও সংগ্রামী। এরা অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে লড়াই করে বিজয়ী হয়। এরা নিজেদের আদর্শ ও বিশ্বাসকে উর্ধ্বে তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়।

'এরা হচ্ছেন হাস্‌সান বিন সাবিত, কা'ব ইবনে মালেক, আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা, আবদুল্লাহ ইবনে সিবআরী, আবু সুফিয়ান ইবনুল হারেস প্রমুখ সাহাবা। এরা ইসলামের জয়গান গেয়েছেন। রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সমর্থনে কবিতা রচনা করেছেন। কাফের-মোশরেকদের বিরুদ্ধে কবিতা রচনা করতেন। এদের মধ্যে শেষের দু'জন ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে রাসূলুল্লাহর বিরুদ্ধে কবিতা রচনা করেছেন। কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করার পর এঁরা ইসলামের গুণগান করেছেন এবং রসূল (সা.)-এর প্রশংসায় কবিতা রচনা করেছেন।

বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, রসূলুল্লাহ (সা.) হাস্‌সান বিন সাবিতকে বলেন, তাদের (মোশরেকদের) বিরুদ্ধে কবিতা পাঠ করো, জিবরাঈল (আ.) তোমার সাথে রয়েছেন।

অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, পবিত্র কুরআনে কবিদের সম্পর্কে আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, 'মোমেন বান্দা তাঁর তলোয়ার ও ভাষার সাহায্যে জেহাদ করে। যার হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ নিয়ে বলছি, এর আঘাতও তোমাদের ছুঁড়ে মারা তীরের আঘাতের মতোই মারাত্মক হয় (ইমাম আহমদ কর্তৃক বর্ণিত)।

এ-সব তথ্য প্রমাণের বাইরেও ইসলামী কাব্য ও ইসলামী শিল্প-সাহিত্যের অসংখ্য নজির রয়েছে। মোট কথা জীবনের যে-কোনো দিককে কেন্দ্র করে ইসলামী ভাবধারা থেকে উৎসারিত যে- কবিতা-শিল্প ও সাহিত্য সে-সবই হচ্ছে ইসলামসম্মত শিল্প ও সাহিত্য।

ইসলামসম্মত শিল্প ও সাহিত্যে সরাসরি ইসলামের দাওয়াত দিতে হবে বা ইসলামের সমর্থনে সরাসরি কথা বলতে হবে- এমনটি জরুরি নয়।

তাহহীমুল কুরআনের ভাষ্য : একটি যুক্তিপূর্ণ পথনির্দেশনা

১. কবিদের সাথে যারা থাকে ও চলাফেরা করে, তারা মুহাম্মদ (সা.)-র এর সাথে যাদেরকে চলাফেরা করতে তোমরা দেখছো- তাদের থেকে স্বভাব-চরিত্রে, চলনে বলনে, অভ্যাসে-মেজাজে সম্পূর্ণ আলাদা। উভয় দলের ফারাকটা এতোই সুস্পষ্ট যে, এক নজর দেখার পর যে-কোনো ব্যক্তি উভয় দলের কোনটি কেমন তা চিহ্নিত করতে পারে।

একদিকে আছে অত্যন্ত ধীর-স্থির ও শাস্তিশিষ্ট আচরণ, ভদ্র ও মার্জিত রুচি এবং সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও আল্লাহভীতি- প্রতিটি কথায়ও আছে দায়িত্বশীলতার অনুভূতি; আচার-ব্যবহারে মানুষের অধিকারের প্রতি সজাগ দৃষ্টি, লেনদেনে চূড়ান্ত পর্যায়ের আমানতদারী ও বিশ্বস্ততা- কথা যখনই বলা হয় শুধুমাত্র কল্যাণ ও ন্যায়ের জন্যই বলা হয়, অকল্যাণ বা অন্যায়ের একটি শব্দও কখনো উচ্চারিত হয় না- সবচেয়ে বড় কথা, এদেরকে দেখে পরিষ্কার জানা যায়, এদের সামনে রয়েছে একটি উন্নত ও পবিত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, এ-উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের নেশায় এরা রাত-দিন সংগ্রাম করে চলেছে এবং এদের সমগ্র জীবন একটি উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত হয়েছে।

অন্যদিকের অবস্থা হচ্ছে এই যে, সেখানে কোথাও প্রেমচর্চা ও শরাব পানের বিষয় আলোচিত হচ্ছে এবং শ্রোতাবর্গ লাফিয়ে লাফিয়ে তাতে বাহবা দিচ্ছে। কোথাও কোনো দেহপশারিনী অথবা কোনো পরনারী বা গৃহ-ললনার সৌন্দর্যের আলোচনা চলছে এবং শ্রোতারা খুব স্বাদ নিয়ে তা শুনছে, কোথাও অশ্লীল কাহিনী বর্ণনা হচ্ছে এবং সমগ্র সমাবেশের ওপর যৌন কামনার প্রেত চড়াও হয়ে বসেছে। কোথাও মিথ্যা ও ভাঁড়ামির আসর বসেছে এবং সমগ্র মাহফিল ঠাট্টা-তামাশায় মশগুল হয়ে গেছে। কোথাও কারো দুর্নাম গাওয়া ও নিন্দাবাদ করা হচ্ছে এবং লোকেরা তাতে বেশ মজা পাচ্ছে। কোথাও কারো অযথা প্রশংসা করা হচ্ছে এবং শাবাশ ও বাহবা দিয়ে তাকে আরো উসকিয়ে দেয়া হচ্ছে। আবার কোথাও কারো বিরুদ্ধে শত্রুতা ও প্রতিশোধের আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হচ্ছে এবং তা শুনে মানুষের মনে আগুন লেগে যাচ্ছে। এ-সব মজলিসে কবি ও কবিদের কবিতা শোনার জন্য যে-বিপুল সংখ্যক লোক জমায়েত হয় এবং বড়-বড় কবিদের পেছনে যেসব লোক ঘুরে বেড়ায়, তাদেরকে দেখে কোনো ব্যক্তি এ-কথা অনুভব না-করে থাকতে পারে না যে, এরা হচ্ছে নৈতিকতার বন্ধনমুক্ত, আবেগ ও কামনার শ্রোতে ভেসে চলা এবং ভোগ ও পাপ-পঙ্কিলতার পূজারী অর্ধ-পাশবিক একটি নরগোষ্ঠী- দুনিয়ার মানুষের যে কোনো উন্নত জীবনাদর্শ ও লক্ষ্যও থাকতে পারে- এ-চিন্তা কখনো এদের মন-মগজ স্পর্শও করতে পারে

না। এ-দু'দলের সুস্পষ্ট পার্থক্য ও ফারাক যদি কারো নজরে না পড়ে তাহলে সে অন্ধ। আর যদি সবকিছু দেখার পরও কোনো ব্যক্তি নিছক সত্যকে হয়ে প্রতিপন্ন করার জন্য ঈমানকে বেমালাম হজম করে এ-কথা বলতে থাকে যে, মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর আশেপাশে যারা সমবেত হয়েছে তারা কবি ও কবিদের সাজপাঙ্গদের মতো- তাহলে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, তারা মিথ্যা বলার ক্ষেত্রে নির্লজ্জতার সমস্ত সীমা অতিক্রম করে গেছে।

২. অর্থাৎ তাদের নিজস্ব চিন্তা ও বাকশক্তি ব্যবহার করার কোনো একটি নির্ধারিত পথ নেই। বরং তাদের চিন্তায় পাগলাঘোড়া বলগাহারা অশ্বের মতো পথে-বিপথে, মাঠে-ঘাটে সর্বত্র উদভ্রান্তের মতো ছুটে বেড়ায়। আবেগ, কামনা-বাসনা বা স্বার্থের প্রতিটি নতুন ধারা তাদের কণ্ঠ থেকে একটি নতুন বিষয়ের রূপে আবির্ভূত হয়। চিন্তা ও বর্ণনা করার সময় এগুলো সত্য ও ন্যায়সঙ্গত কিনা সেদিকে দৃষ্টি রাখার কোনো প্রয়োজনই অনুভব করা হয় না।

কখনো একটি তরঙ্গ জাগে, তখন তার সপক্ষে জ্ঞান ও নীতিকথার ফুলঝুরি ছড়িয়ে দেয়া হয়, আবার কখনো দ্বিতীয় তরঙ্গ জাগে, সেই একই কণ্ঠ থেকে এবার একেবারেই পুঁতিগন্ধময়, নীচ, হীন ও নিঃসুখী আবেগ উৎসারিত হতে থাকে।

কখনো কারোর প্রতি সন্তুষ্ট হলে তাকে আকাশে চড়িয়ে দেয়া হয়, আবার কখনো নারাজ হলে সেই একই ব্যক্তিকে পাতালের গভীর গর্তে ঠেলে দেয়া হয়।

কোনো কল্পসকে হাতেম এবং কোনো কাপুরুষকে বীর রুস্তম আখ্যা দিতে তাদের বিবেকে একটুও বাধে না যদি তার সাথে তাদের কোনো স্বার্থ জড়িয়ে থাকে।

পক্ষান্তরে কেউ যদি তাদেরকে কোন দুঃখ দিয়ে থাকে, তাহলে তার পবিত্র জীবনকে কলঙ্কিত করার এবং তার ইজ্জত-আবরু ধূলায় মিশিয়ে দেবার বরং তার বংশধারার নিন্দা করার ব্যাপারে তারা একটুও লজ্জা অনুভব করে না।

আল্লাহ-বিশ্বাস ও নাস্তিক্যবাদ, বাস্তববাদিতা ও আধ্যাত্মিকতা, সদাচার ও অসদাচার, পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতা ও অপবিত্রতা-অপরিচ্ছন্নতা, গান্ধীর্ষ ও হাস্য-কৌতুক এবং প্রশংসা ও নিন্দাবাদ সবকিছুই একই কবির একই কাব্যে পাশাপাশি দেখা যাবে। কবিদের এ পরিচিতি- বৈশিষ্ট্য যারা জানে তারা কেমন করে এ কুরআনের বাহককে কবিত্বের অভিযোগে অভিযুক্ত করতে পারে? কারণ তাঁর ভাষা মাপাজোখা, তাঁর বক্তব্য দ্ব্যর্থহীন, তাঁর পথ একেবারে সুস্পষ্ট ও নির্ধারিত এবং সত্য, সততা, ন্যায় ও কল্যাণের দিকে আহ্বান করা ছাড়া তাঁর কণ্ঠ থেকে অন্য কোনো কথাই বের হয়নি।

কুরআন মাজিদে অন্য এক জায়গায় নবী (সা.) সম্পর্কে বলা হয়েছে, কবিত্বের সাথে তাঁর প্রকৃতি ও মেজাজের আদৌ কোনো সম্পর্ক নেই :

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ

‘আমি তাকে কবিতা শিখাইনি এবং এটা তার করার মতো কাজও নয়।’
(সূরা ইয়াসিন: আয়াত-৬৯)

এটি এমন একটি সত্য ছিলো, যারা নবী (সা.) কে ব্যক্তিগতভাবে জানতেন তাঁরা সবাই একথা জানতেন।

নির্ভরযোগ্য হাদীসে বলা হয়েছে : কোন একটি কবিতাও নবী (সা.)-র পুরোপুরি মুখস্থ ছিলো না। কথাবার্তার মাঝখানে কোনো কবির ভালো কবিতার চরণ তাঁর মুখে এলেও তা অনুপযোগীভাবে পড়ে যেতেন অথবা তার মধ্যে শব্দের হেরফের হয়ে যেতো। হযরত হাসান বসরী বলেন, একবার ভাষণের মাঝখানে তিনি এক কবির কবিতার চরণ এভাবে পড়লেন :

كفى بالاسلام والشيب للمرء ناهيا

হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রসূল। চরণটি হবে এ রকম:
كفى بالاسلام والشيب للمرء ناهيا

একবার তিনি আব্বাস ইবনে মিরদাস সুলামীকে জিজ্ঞেস করলেন, এ-কবিতাটা কি তোমার?

تَجْعَلُ نَهْيِي وَنَهْبُ الْعَبِيدِ وَبَيْنَ الْأَفْرَعِ وَغَيْنَةٍ

আব্বাস বললেন, শেষ বাক্যাংশটি ওভাবে নয় বরং এভাবে হবে:
بين عينة والافرع

একথায় রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, কিন্তু অর্থ তো উভয়ের এক।

হযরত আয়েশাকে (রা.) জিজ্ঞেস করা হয়, নবী (সা.) কি কখনো নিজের ভাষণের মধ্যে কবিতা ব্যবহার করতেন? তিনি বলেন, কবিতার চেয়ে বেশি তিনি কোনো জিনিসকে ঘৃণা করতেন না। তবে কখনো-কখনো বনী কায়েসের কবিতা পড়তেন। কিন্তু প্রথমটা শেষে এবং শেষেরটা আগে পড়ে ফেলতেন। হযরত আবু বকর (রা.) বলতেন, হে আল্লাহর রসূল। এভাবে নয় বরং এভাবে। তখন তিনি বলতেন, ‘আমি কবি নই এবং কবিতা পাঠ করা আমার কাজ নয়।’

আরবের কবিতা-অঙ্গনে যে-ধরনের বিষয়বস্তুর সমাবেশ ঘটেছিলো- তা ছিল যৌন-আবেদন ও অবৈধ প্রেমচর্চা অথবা শরাব পান কিংবা গোত্রীয় ঘৃণা, বিদ্বেষ ও যুদ্ধবিগ্রহ অথবা বংশীয় ও বর্ণগত অহংকারে পরিপূর্ণ। কল্যাণ ও সুকৃতির স্থান সেখানে অতি অল্পই ছিলো। এছাড়া মিথ্যা, অতিরঞ্জন, অপবাদ, নিন্দাবাদ,

অযথা প্রশংসা, আত্মগর্ব, তিরস্কার, দোষারোপ, পরিহাস ও মুশরিকী-অশ্লীল-পৌরাণিকতা তো ঐ কাব্যধারার শিরায়-শিরায় প্রবাহিত ছিল। তাই ঐ কাব্যসাহিত্য সম্পর্কে নবী (সা.) দ্বিধাহীন রায় দিলেন :
لَا نُمَتِّلِيْ جَوْفَ اَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَّهٗ مِنْ اَنْ يُمَتِّلٰى شِعْرًا

‘তোমাদের কারো পেট পুঁজে ভরা থাকা, কবিতায় ভরা থাকার চেয়ে ভালো’।

তবুও যে কবিতায় কোনো ভালো কথা থাকতো তিনি তার প্রশংসা করতেন।
তাঁর উক্তি ছিলো : امن شعره وكفر قلبه

‘তাঁর কবিতা মু’মিন কিন্তু অস্তুর কাফের।’

একবার একজন সাহাবী একশোটা ভালো-ভালো কবিতা তাঁকে শুনান এবং তিনি বলে যেতে থাকলে নবীজি বলেন : هيه : ‘আরো শোনাও।’

৩. নবী (সা.) সম্পর্কে তাঁর প্রত্যেক পরিচিতজন জানতেন, তিনি যা বলতেন তাই করতেন। তাঁর কথা ও কর্মের সামঞ্জস্য এমনই একটি জাজ্জল্যমান সত্য ছিলো- যা তাঁর আশপাশের সমাজের কেউ অস্বীকার করতে পারতো না। অথচ সাধারণ কবিদের সম্পর্কে সবাই জানতো যে, তারা বলতেন এক কথা এবং করতেন অন্য কিছু। তাদের কবিতায় দানশীলতার মাহাত্ম্য এমন উচ্চকণ্ঠে প্রচারিত হবে, যেন মনে হবে, তারা ছাড়া আর কোনো দাতা নেই। কিন্তু তাদের কাজ দেখলে বুঝা যাবে- তারা বড়ই কৃপণ। বীরত্বের কথা তারা বলবেন কিন্তু নিজেরা হবেন কাপুরুষ। অমুখাপেশ্বিতা, অল্পে তুষ্টি ও আত্মমর্যাদাবোধ হবে তাদের কবিতার বিষয়বস্তু কিন্তু নিজেরা লোভ, লালসা ও আত্ম বিক্রয়ের শেষ সীমানাও পার হয়ে যাবেন। অন্যের সামান্যতম দুর্বলতাকেও কঠোরভাবে পাকড়াও করবেন কিন্তু নিজেরা চরম দুর্বলতার মধ্যে হাবুডুবু খাবেন।

‘তারা ছাড়া যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে এবং আল্লাহকে বেশি-বেশি স্মরণ করে আর তাদের প্রতি জুলুম করা হলে প্রতিশোধ নেয়।’

উল্লিখিত আয়াতে সাধারণভাবে কবিদের প্রতি যে-নিন্দাবাদ উচ্চারিত হয়েছে তা থেকে এমন সব কবিদেরকে এখানে আলাদা করা হয়েছে যাদের মধ্যে রয়েছে চারটি বৈশিষ্ট্য :

এক. যারা মু’মিন অর্থাৎ আল্লাহ, তাঁর রসূল ও তাঁর কবিতাগুলো মানেন এবং আখেরাতে বিশ্বাস করেন।

দুই. নিজেদের কর্মজীবনে যারা সং- যারা ফাসেক, দুষ্কৃতকারী ও বদকার নন।
নৈতিকতার বাঁধনমুক্ত হয়ে যারা নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেন না।

তিন. আল্লাহকে যারা বেশি-বেশি করে স্মরণ করেন- নিজেদের সাধারণ অবস্থায়,
সাধারণ সময়ে এবং নিজেদের রচনায়ও। তাদের ব্যক্তিজীবনে আল্লাহভীতি
ও আল্লাহর অনুগত্য রয়েছে কিন্তু তাদের কবিতা পাপ-পঙ্কিলতা, লালসা ও
কামনারসে পরিপূর্ণ, এমন যেনো না হয়।

আবার এমনও যেনো না হয়, কবিতায় বড়ই প্রজ্ঞা ও গভীর তত্ত্বকথা
আওড়ানো হচ্ছে কিন্তু ব্যক্তিজীবনে আল্লাহর স্মরণের কোনো চিহ্নও নেই।
আসলে এ-দুটি অবস্থা সমানভাবে নিন্দনীয়।

তিনি একজন পছন্দনীয় কবি- যার ব্যক্তিজীবন যেমন আল্লাহর স্মরণে
পরিপূর্ণ তেমনি নিজের সমগ্র কাব্যপ্রতিভাও এমন পথে উৎসর্গীকৃত- যা
আল্লাহ থেকে গাফিল লোকদের নয় বরং যারা আল্লাহকে জানে, আল্লাহকে
ভালোবাসে ও আল্লাহর অনুগত্য করে তাদেরই পথ।

চার. চতুর্থ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে এমন সব ব্যতিক্রমধর্মী কবিদের- যারা
নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থে কারো নিন্দা করে না এবং ব্যক্তিগত, বংশীয়
বা গোত্রীয় বিদ্বেষে উদ্ভুদ্ধ হয়ে প্রতিশোধের আগুন জ্বালায় না। কিন্তু যখন
জালেমের মোকাবিলায় সত্যের প্রতি সমর্থন দানের প্রয়োজন দেখা দেয়,
তখন তারা কঠককে সেই একই কাজে ব্যবহার করে, যে-কাজে একজন
মুজাহিদ তার তীর ও তরবারিকে ব্যবহার করে। সব সময় আবেদন-
নিবেদন করতেই থাকা এবং বিনীতভাবে আর্জি পেশ করেই যাওয়া
মু'মিনের রীতি নয়।

ঐ সম্পর্কেই হাদীসে বলা হয়েছে, কাফের ও মুশরিক কবিরা ইসলাম ও নবী
(সা.)-র বিরুদ্ধে অভিযোগ, দোষারোপ ও অপবাদের তাণ্ডব সৃষ্টি করতো এবং
ঘৃণা ও বিদ্বেষের বিষ ছড়াতো ও সাহস যোগাতো। তাই তিনি কা'ব ইবনে
মালেককে (রা.) বলেন :

أَهْجُهُمْ قَوْلَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهْوَ أَشَدُّ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبْلِ

‘তাদের নিন্দা করো, কারণ সেই আল্লাহর কসম, যার হাতের মুঠোয় আমার প্রাণ
আবদ্ধ, তোমার কবিতা তাদের জন্য তীরের চেয়েও বেশি তীক্ষ্ণ ও ধারালো।’

أَهْجَهُمْ وَجَبْرِيلَ مَعَكَ قُلُورُ الْقَنَسِ مَعَكَ

‘তাদের মিথ্যাচারের জবাব দাও এবং জিব্রাইল তোমার সঙ্গে আছে’ এবং ‘বলো’,
পবিত্র আত্মা তোমার সঙ্গে আছে’

إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُجَاهِدُ بِسَيْفِهِ وَلِسَانِهِ : তার উক্ত ছিলো :

‘মু‘মিন তলোয়ার দিয়ে লড়াই করে এবং কণ্ঠ দিয়েও ।’

উপসংহার

উপর্যুক্ত তাফসীরসমূহের কোনো তাফসীরই- কুরআনের কবি ও কবিতা সম্পর্কিত- বক্তব্যের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কোথাও বলেনি যে, কবিরা মানবসমাজের এক অপাঙ্ক্তেয় অংশ কিম্বা কাব্যচর্চা পরিপূর্ণভাবে এক নিষিদ্ধ বিষয় বরং সংকবি ও সততাপূর্ণ কাব্যচর্চার পক্ষে তাদের রায় স্পষ্ট ।

তবে অসং কবি এবং অসততাপূর্ণ কাব্যচর্চার ব্যাপারে কুরআনের ভাষ্য সম্পূর্ণ নেতিবাচক- তাতে কোনো সন্দেহ নেই । স্বাভাবিকভাবেও- কুরআন অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে- এই উপলব্ধিই জাহত হয় ।

বস্তুত ইসলামী সমাজ বিপ্লবের জন্যে এবং যথার্থ মানবতার প্রতিষ্ঠার জন্যে আদর্শবাদী কবি ও কবিতার অপরিহার্যতার কথা কুরআন বলেছে বলেই কবি সাহাবীরা কাব্যচর্চা থেকে সরে দাঁড়াননি বরং একটি মহান শিল্পকে অত্যাবশ্যকীয় হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছেন দ্বিধাহীন চিন্তে ।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

১. ড. মুজীবুর রহমান অনূদিত তাফসীরে ইবনে কাসীর
২. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান সম্পাদিত মাআরেফুল কুরআন
৩. জনাব আবদুল মান্নান তালিব অনূদিত তাফহীমুল কুরআন
৪. হাফেজে মুনির উদ্দীন আহমদ সম্পাদিত তাফসীরে ফী যিলালিল কোরআন
৫. হাফেজ মাওলানা আবদুল জলীল (এমএ)

হাদীসের আলোকে কবি ও কবিতা

কবিতার সংজ্ঞা ও রাসূল (সা.)

ক. রাসূল (সা.) কবি আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন :
'আবদুল্লাহ, কবিতা সম্পর্কে আমাকে কিছু বলো তো, আসলে কবিতা কী?
(কাকে বলে?) আমাকে একটু ধারণা দাও তো।'

: 'কবিতা এমন একটা বিষয়, যা উদ্ভূত হয় আমারই অন্তরে', বললেন
আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা, 'তারপরে তা প্রকাশিত হয় আমারই মুখ থেকে'।
(শিহাবউদ্দীন আহমাদ ইবনে আবদে রাব্বিহ, আল ইকদুল ফারীদ)

খ. আর একবার কবি কা'ব বিন মালিক (রা.) সরাসরি রাসূল (সা.)-কে
জিজ্ঞেস করলেন : 'কবিতা সম্পর্কে আপনার মতামত জানতে চাই, ইয়া
রাসূল্লাহ।'

: 'নিঃসন্দেহে একজন মুমিন তো ভাষার সাহায্যেই লড়াই করে এবং
লড়াই করে তলোয়ারের সাহায্যে'। বললেন রাসূল (সা.)- 'আমার প্রাণ
যাঁর হাতে, আমি তাঁরই কসম খেয়ে বলছি, তোমরা তোমাদের কবিতা
দিয়ে কাফেরদেরকে যেভাবে আঘাত করে যাচ্ছে, সে আঘাত তাদের
জন্য তীরের আঘাতের চেয়েও মারাত্মক হয়ে দেখা দিচ্ছে।' (মিশকাতুল
মাসাবিহ)।

গ. রাসূল (সা.)-এর কবিতা সম্পর্কে একটি তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য এই রকম,
রাসূল (সা.) বলেন : 'কবিতা তো কথামালার মতোই, তার উত্তম দিকটা
তো উত্তমই, আর নিকৃষ্ট দিকটা নিকৃষ্টই।' (মিশকাতুল মাসাবিহ)

উল্লিখিত তিনটি হাদীসে কবিতা সম্পর্কে অন্তত তিনটি বক্তব্য এমন যা
কবিতার অন্তর্নিহিত অর্থ ও সংজ্ঞাকে উন্মোচিত করে। যেমন-

১. কবিতা হচ্ছে অস্তরের উদিত একটি বিষয় এবং মুখের ভাষায় প্রকাশিত একটি বিষয়। আর উদিত বিষয়ের সাথে আলো থাকে, রং থাকে, সৌন্দর্যের প্রাচুর্য থাকে, শিল্পের সমাহার থাকে।
২. কবিতা হচ্ছে একটি হাতিয়ার। জীবন যুদ্ধের হাতিয়ার, আদর্শ রক্ষার হাতিয়ার, আদর্শ প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার।
৩. কবিতা হচ্ছে বিন্যস্ত কথামালা। কথামালা তার প্রবক্তার কারণে শ্লীলও হতে পারে, অশ্লীলও হতে পারে। আর অশ্লীলতাকে অবিশ্বাসীরাই গ্রহণ করে থাকে।

কবিতা সম্পর্কে রাসূল (সা.) এর মন্তব্য

- ক. 'যে বাণীকে বিন্যস্ত করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু কোনো চিন্তা-চৈতন্যকে কাজে লাগানো হয়নি, সে বাণী তার নির্মাতাকে নিষ্ক্ষেপ করবে এমন এক দোষের মধ্যে, যার পরিধি ও ব্যাপ্তি পূর্ব এবং পশ্চিমের ব্যবধানকেও হার মানায়।' (বুখারী, মুসলিম)।
- খ. 'কারো কোনো পছন্দ-অপছন্দের খাতির না-করে, কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনেই যে শব্দের মালা গাঁথে, মালা গাঁথে কথা ও কবিতার- সে তো অপরিসীম মর্যাদার অধিকারী হবেই। আর যে কি-না শুধু মানুষের মনোরঞ্জননের জন্যেই লেখালেখি করে, তো তার সেই লেখা তাকে পৌছে দেবে জাহান্নামের দোরগোড়ায়।' (বুখারী)
- গ. 'যে কেবল মানুষের হৃদয় কেড়ে নেবার জন্যেই কথা ও কবিতার মালা গাঁথা শেখে; কেয়ামতের মাঠে আল্লাহ তার কোনো বিনিময়ও গ্রহণ করবেন না অথবা তার পক্ষ থেকে কোনো উৎকোচও গ্রহণ করবেন না।' (আবু দাউদ)
- ঘ. 'কিছু-কিছু কবিতায় আছে হিকমাতের কথা তথা দর্শনের কথা।' (আল আদব আল মুফরাদ)
- ঙ. কবিতা এবং সাধারণ বক্তব্যের বিচার হতে হবে (সাধারণ কথাবার্তার বিচার হতে হবে) একই নিষ্ঠিতে। অনাবিল অর্থাৎ পরিমল কথাবার্তার যে মূল্য, পরিশীলিত কবিতারও (শ্লীল কবিতারও) সেই মূল্য। অশ্লীল কথাবার্তা যেমন অপ্রীতিকর, অশ্লীল কবিতাও তেমনি অপ্রীতিকর। (আল আদব আল মুফরাদ)

- চ. 'কবিতা হলো আরবদের জন্যে সুসংবদ্ধ কথামালা, কবিতার ভাষায় আরবদের কাছে কিছু চাইলে, তারা তা মন ভরে (হৃদয় উজাড় করে) দান করে।'
- ছ. 'উট তো তার করুণ কান্না থামাতে পারে কিন্তু আরবরা থামাতে পারে না তাদের কবিতার সুরধ্বনি।'
- জ. 'যে দু-টো চমৎকার অলংকার দিয়ে আল্লাহ কোনো মুমিনকে সুসজ্জিত করে থাকেন, কবিতা সেই অলংকারেরই একটি।'
- ঝ. 'কিছু কিছু বর্ণনা তো যাদুর মতো।' (অর্থাৎ কোনো কোনো কবিতায় এমন বর্ণনা আছে যা যাদুর মতো আকর্ষণ করে। যে আকর্ষণ মানুষকে আঠার মতো জড়িয়ে রাখে।) (আবু দাউদ)

কবিতা সম্পর্কে রাসূল (সা.)-এর কতোটা স্বচ্ছ ধারণা ছিলো, তা অনুধাবনের জন্যে উল্লিখিত হাদীসসমূহই যথেষ্ট।

খারাপ কবিতা সম্পর্কে রাসূল (সা.) এর মন্তব্য

- ক. 'যে কবিতায় করা হয়েছে সত্যের অপলাপ, সে কবিতায় কোনো কল্যাণ নেই।' (ইবনে রাশীক আল কায়রাওয়ানী, কিতাবুল উমদা)।
- খ. 'কবিতা দিয়ে- অশ্লীল কবিতা দিয়ে- শরীর এবং হৃদয় পরিপূর্ণ করার চেয়ে রক্ত এবং পুঁজ দিয়ে তা ভর্তি করা অনেক উত্তম।' (বুখারী, আল আদাব আল মুফরাদ)।
- গ. একবার এক কবি কীর্তিগাঁথা রচনা করলো। সেই কীর্তিগাঁথায় এ রকম চরণও ছিল:

জানতে কি চাও বংশ আমার?
বংশ তো মোর হিমআরী সেই;
রবীয়া আর মোদার বলে
পূর্বসূরী কেউ মোর নেই, নেই।

চরণকটির মধ্যে ছিলো বংশ গৌরবের উল্লাসিকতা। এই উল্লাসিকতাকে মেনে নেননি রাসূল (সা.)। সুতরাং বলে দিলেন: 'তোমার কবিতায় রয়েছে তোমারই বিবেককে আঘাতকারী বিষয়। মূলত তোমার ঐ কীর্তি-গাঁথা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর নৈকট্য অর্জনের ক্ষেত্রে বিরাট বাধাও।'

রাসূল (সা.) অশ্লীলতাকে প্রশংসা দেননি। জীবনেও দেননি, কবিতায়ও দেননি। তেমনি প্রশংসা দেননি বংশ পৌরবের আত্ম-অহংকারের। এই অহংকার-সম্পৃক্ত কবিতাকেও তাই তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন বিবেকবিরোধী কাজ বলে।

কবিতা রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে রাসূল (সা.) এর ঐতিহাসিক অভিমত ক.

কোরায়েশদের তিন কবি- আবদুল্লাহ বিন আজজিবারা, আবু সুফিয়ান বিন আল হারিস এবং আমর বিন আল আস রাসূল (সা.)-কে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতো। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতো কবিতা রচনার মাধ্যমে। এক সময় এই তৎপরতা মাত্রা ছাড়িয়ে গেলো এবং রাসূল (সা.) এর এক সাহাবী কবি আলী বিন আবু তালিব (রা.)-কে এসে ধরলেন, ঐ একইভাবে জবাব দেবার জন্যে অর্থাৎ বিদ্রূপাত্মক কবিতার জবাব বিদ্রূপাত্মক কবিতার মাধ্যমে দেবার জন্যে।

কবি আলী বিন আবু তালিব (রা.) বললেন: 'হ্যাঁ, তো জবাব দেয়া যায়, জরুরিও। কিন্তু সবকিছুর আগে চাই রাসূলের অনুমতি।'

কোনো রকম অপেক্ষা না করে ঐ আশেয়ে রাসূল সাহাবী সোজা চলে গেলেন মহানবী (সা.)-এর কাছে এবং আরজ করলেন- 'ইয়া রাসূলান্নাহ, যারা অকথ্য ভাষায় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে আমাদের বিরুদ্ধে ক্রমাগতভাবে কবিতা লিখে যাচ্ছে, তাদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়া দরকার। ইয়া রাসূলান্নাহ, এই কাজটি করার জন্যে তাই আপনি আলী বিন আবু তালিবকে অনুমতি দিন।'

রাসূল বললেন : 'এই কাজের জন্যে আলী তো যথোপযুক্ত নয়।' তারপর তিনি- সরওয়ারে দোজাহাঁ- সমস্ত আনসারদেরকে ডেকে অত্যন্ত আবেগভরা ভাষায় বললেন : 'অবশ্যই তোমরা আল্লাহর রাসূলকে হেফাজত করার জন্যে হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছো, অতন্দ্র প্রহরীর মতো দায়িত্ব পালন করেছো। এখন সময় এসেছে সেই তাঁকে কলমের ভাষা দিয়ে হেফাজত করার, লেখনীর শক্তি দিয়ে রক্ষা করার। তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে, আজকের এ অবস্থায় তীক্ষ্ণ মসীর প্রতাপ নিয়ে এগিয়ে আসতে পারো?'

কবি হাসান বিন সাবিত (রা.) উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন: 'এ কাজের জন্যে আমিই নিজেকে উৎসর্গ করছি।' এই বলে সাথে সাথে তিনি তার নিজের জিহ্বা মেলে ধরলেন রাসূলের সামনে, মেলে ধরলেন জনতার সামনে। তারপর আবার বলে উঠলেন : আল্লাহ'র শপথ, আজকে থেকেই গুঞ্জরিত হবে আমার কথা, আজকে থেকে গুঞ্জরিত হবে আমার কবিতা সান্যার নিভৃত পল্লী পর্যন্ত; বসরা হয়ে সান্যার নির্জন পল্লী পর্যন্ত গুঞ্জরিত হবে আমারই কথা, আমারই কবিতা।'

সহসা প্রশ্ন করলেন মহানবী (সা.), ‘চমৎকার! কিন্তু আমি তো কোরায়েশ গোত্রের, তাহলে জবাব দেবে কীভাবে? (বিদ্রূপের উত্তরে বিদ্রূপ করবে কি করে?)’

কবি হাস্‌সান বিন সাবিত (রা.) বললেন: ‘যেভাবে ময়দার পাকানো মণ্ড থেকে উদ্ধার করা হয় চুল, আমি ঠিক ঐভাবে আপনাকে মুক্ত রাখবো ইনশাআল্লাহ।’

হ্যাঁ, ঠিক ঐ দিন থেকেই শুরু হলো রাসূলের বিরুদ্ধে বিরচিত কাফের কবিদের বিদ্রূপাত্মক কবিতার দাঁতভাঙ্গা জবাব। শুরু করলেন রাসূলের তিন আনসার কবি হাস্‌সান বিন সাবিত, কা’ব বিন মালিক এবং আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রা.)।

কবি হাস্‌সান এবং কবি কা’ব (রা.) কাফেরদের কবিতার ছবছ জবাব দিতেন। জবাব দিতেন তাদের একই তালে, একই লয়ে, একই সুরে এবং এইসব কবিতায় থাকতো কাফেরদের পরাজয়ের ঘটনা, কাফেরদের বংশের বদনাম, কাফেরদের ঐতিহ্যের ত্রুটি-বিচ্যুতি।

অন্যদিকে কবি আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহার কবিতায় থাকতো কাফেরদের ঈমানের পথে না আসার আসল রহস্য, প্রকৃত ঘটনাবলী।

এ সময় হাস্‌সান বিন সাবিত এবং কবি কা’ব বিন মালিকের কবিতা কাফের-মুশরিকদের কলিজায় বিষাক্ত তীরের মতো বিদ্ধ হতো; এক অবর্ণনীয় যন্ত্রণায় ছটফট করতো তারা। কিন্তু কবি আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহার কবিতার প্রভাব ছিলো অন্য রকম।

কালক্রমে কাফের-মুশরিকরা অনুধাবন করতে পারলো ইসলামের অন্তর্নিহিত শিক্ষাসমূহ এবং সবাই গ্রহণ করলো ঈমানের গৌরব এবং উপটৌকন। বস্তুত ঈমান আনার পর তারা বুঝলো কবি আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহার (রা.) কবিতাই ছিলো তাদের জন্য বিষমিশ্রিত তীক্ষ্ণ তীরের মতো, দারুণ বেদনাদায়ক। (মুহাম্মদ বিন শীরীন, ইস্‌ফাহানী, আল আগানী ৪/১৩৭)

খ.

একবার কবি হাস্‌সান বিন সাবিতকে রাসূল (সা.) পরামর্শ দিলেন:

‘সাবিত, তুমি আবু বকরের কাছে যাও। তুমি আবু বকরের কাছে থেকেই জানতে পারবে মুশরিকদের ইতিহাস, মুশরিকদের ঐতিহ্য, মুশরিকদের বিবাদ-বিসম্বাদের ঘনকালো অধ্যায়গুলো। ঘনকালো অধ্যায়গুলোর আগাগোড়া জানতে পারবে এবং আবু

বকরই তোমাকে ধারাবাহিকভাবে বলতে পারবে মুশরিকদের
বংশের খুঁটিনাটি দিকগুলো; একেবারে গুণে গুণে বলতে পারবে।
মূলত তারপরই সহজ হবে তোমার জন্য নিন্দাকাব্য রচনা করা।
যাও বন্ধু, জিব্রীল তোমার সঙ্গে থাকবেন।’

রাসূল (সা.) এর পরামর্শমতো কবি হাস্‌সান বিন সাবিত আবু বকরের কাছ থেকে
জেনে নিলেন মুশরিকদের বংশের সকল গোপন রহস্য। তারপর লিখলেন এমন
সব কবিতা, যে কবিতার বিষাক্ত তীরে ফুটো হয়ে যেতে লাগলো মুশরিকদের
সবগুলো কান। এবার মুশরিকরা চিৎকার করে বলতে শুরু করলো : ‘আরে!
এই বিষয়গুলো তো আবুবকর ছাড়া আর কারোরই জানার কথা ছিলো না।’
(ইফাহানী, আল আগানী ৪/৩৮)।

রাসূল (সা.)-এর শেষ জীবনের দুটি বছরে বিভিন্ন অঞ্চলের বিপুল সংখ্যক
প্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষাৎকার দিতে হয়েছিলো। এইসব প্রতিনিধিদের সাথে
থাকতো বাগ্গী, থাকতো কবি। বাগ্গীরা বক্তৃতা করতো আর কবিরা করতো
কবিতা আবৃত্তি। তারপর রাসূল (সা.) এর বাগ্গীরা এবং কবিরা দিতো তাদের
যথাযথ জবাব।

একবার তামীম গোত্রের এক প্রতিনিধি দল এলো রাসূলের কাছে। সঙ্গে তাদের
কবি আকরা ইবনে হাবিস। তারা এসেই আহবান জানালো এই বলে:

‘মুহাম্মদ, আজ আমরা তোমার সাথে গৌরবের প্রতিযোগিতা
করবো, প্রতিযোগিতা করবো কবিতার। তুমি তো জানো, আমরা
কারো প্রশংসা করলে সে সত্যিই সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়, হয়ে ওঠে
অনন্য। আর আমরা যার কুৎসা বর্ণনা করি, সত্যিকার অর্থেই সে
হয় কলুষিত এবং ধিকৃত।’

রাসূল (সা.) তামীম গোত্রের প্রতিনিধিদের জবাবে শুধু এতোটুকুই বললেন:

‘কাউকে সম্মানিত করা অথবা অপমানিত করার ব্যাপারটা
আল্লাহর হাতে। তিনিই যার প্রশংসা করেন, সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়
সে-ই; তিনিই যাকে কলুষিত করেন, কলুষিত এবং ধিকৃত হয়
সে-ই। এই পৃথিবীতে আমাকে কবিতা দিয়ে পাঠানো হয়নি; আমি
নির্দেশিত নই গৌরব করার জন্যেও। কিন্তু তবুও এসো, আজকের
দিনে তোমাদের আহ্বান জানাই।

বক্তৃতার পালা, গৌরবের পালা শুরু হলো। শুরু করলো তামীম
গোত্রই। রাসূল (সা.) সাবিত ইবনে কয়েস (রা.)-কে বক্তৃতা

করতে বললেন। পরাজিত হলো তামিম গোত্র। সঙ্গে সঙ্গে তাদের
কবি আকরা ইবনে হাবিস উঠে দাঁড়ালো এবং আবৃত্তি শুরু করলো।’

তোমাদের কাছে আমরা এসেছি
গৌরবগাঁথা গাইতে জানি;
হেযায়্ ভূমিতে আমাদের চেয়ে
শ্রেষ্ঠতো নেই, নেই সম্মানী।

আকরা বিন হাবিসের কবিতা শুনলেন রাসূলে মাকবুল (সা.)। তারপর তার
জবাব দিতে বললেন কবি হাস্‌সান বিন সাবিত (রা.)-কে। কবি হাস্‌সান জবাব
দিলেন :

দারিম গোত্র, দারিম গোত্র
গর্ব কোরো না, ক্ষান্ত হও
তোমরা আসলে চাকর-বাকর
দাস-দাসী ছাড়া অন্য নও।

হাস্‌সান বিন সাবিতের কবিতায় তামিম গোত্রের আড়ালে দারিম গোত্রের আসল
চেহারা ই ফুটে উঠেছিলো। ফলে রাসূল (সা.)-এর বাগ্মী এবং কবিদের কাছে খুব
সহজেই তারা নতি স্বীকার করলো এবং বরণ করে নিলো পরাজয়ের ব্যর্থতা এবং
ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হলো সবাই। (মাজিল্লাতুল
বাহছ আল ইলমী, পৃষ্ঠা ১২৭-১২৮)।

রাসূল (সা.) চেয়েছিলেন সত্যের প্রতিষ্ঠা এবং চেয়েছিলেন সত্যের বিজয়।
সুতরাং কবিতার মধ্য দিয়েও তিনি ঐ প্রতিষ্ঠা, ঐ বিজয়ই চেয়েছিলেন। উল্লিখিত
তিনটি হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, কবিতার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সত্যের
প্রতিষ্ঠা, সুন্দরের প্রতিষ্ঠা।

কবিতা লেখার জন্যে রাসূল (সা.) এর সরাসরি নির্দেশ

ক. ‘যাও, তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে কবিতার যুদ্ধ শুরু করো। মুমিনরা তো
লড়াই করে জান দিয়ে এবং মাল দিয়ে।

যাঁর হাতের মুঠোয় মুহাম্মদের আত্মা, তাঁর শপথ করে বলছি: তীরের
তীক্ষ্ণ ফলা যেমন কলিজা ঝাঁঝরা করে দেয়, তেমনি তোমাদের কবিতাও
মুশরিকদের বুক ঝাঁঝরা করে দেবে।’ (কা’ব বিন মালিক (রা.)-এর বর্ণনা,
ইমাম আহমাদের উল্লেখ, আওন আল বারী-র সংগ্রহ)

খ. আমাদের বিন ইয়াসার (রা.) বলেন, এক সময় কোরায়েশরা আমাদের নিন্দা চর্চায় মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি শুরু করলো, রাসূল (সা.) আমাদেরকে ডাকলেন এবং নির্দেশ দিলেন: ‘কোরায়েশদের মতো তোমরাও মুখ খোলো।’

গ. আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন, একদা রাসূল (সা.) বললেন : ‘তোমরা কাফের-মুশরিকদের তীব্র নিন্দা করে কবিতার লড়াইয়ে নেমে পড়ো। দেখবে তা তাদেরকে তীরের তীক্ষ্ণ ফেলার চেয়েও মারাত্মকভাবে আঘাত করছে।’

রাসূলের কাছে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাকে পাঠানো হলো। রাসূল (সা.) পুরোপুরি আশ্বস্ত হতে পারলেন না। কা’ব বিন মালিকও রাসূলের কাছে এলেন। শেষ পর্যন্ত হাস্‌সান বিন সাবিত যখন এলেন, রাসূল (সা.) বললেন : ‘তাহলে হাস্‌সানকেই পাঠালে তোমরা? আসলে হাস্‌সান তো সেই সিংহশাবক, যে কি-না লেজের আঘাতেই প্রতিপক্ষকে সংহার করায় দক্ষ।’

রাসূল (সা.)-এর কথা শুনে আনন্দের আতিশয্যে জিহ্বা নাড়তে লাগলেন হাস্‌সান বিন সাবিত এবং বললেন: ‘যিনি আপনাকে সত্যবাণীসহ প্রেরণ করেছেন, তাঁর শপথ করে বলছি- আমি আমার এ জিহ্বা দিয়ে কাফের-মুশরিকদের চামড়া তুলে ছাড়বো (চামড়া তুলে ফেলার মতো গাত্রদাহের সৃষ্টি করে ছাড়বোই)।’ (আওন আল বারী, ৪/২২)

মূলত রাসূল (সা.) কবিতার ব্যাপারে তাঁর সম্মতি প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হননি, সত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যকে সামনে রেখে কবিতা লেখারও নির্দেশ দিয়েছেন। উল্লেখিত মাত্র তিনটি হাদীস থেকেই তা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কবিদের প্রতি রাসূল (সা.) এর একান্ত সহযোগিতা ও পুরস্কার

ক. হনায়নের যুদ্ধ শেষ হলো। যুদ্ধলব্ধ সম্পদ রাসূল ভাগ করে দিচ্ছেন। এক পর্যায়ে কবি আব্বাস বিন মিরদাসকে দিলেন চারটি উট-বলিষ্ঠ চারটি উট। কিন্তু মন ভরলো না আব্বাস বিন মিরদাসের। অনুযোগ করে উঠলেন কবিতার ভাষায়:

‘ঘাড় ভাঙতে তো
পারেনিকো মিরদাসের
কোনো দিনও কোনো
বধ্যভূমি ও কেন্না,

পেছনেও ছিলাম না
কখনো তো কোনোদিন
তবুও আজকে কেনো
কম পেয়ে ছোট হবো ?
হায় আল্লা ! হায় আল্লা ?

আব্বাস বিন মিরদাসের কবিতার মর্মার্থ রাসূল বুঝলেন, তারপর হাঁক দিলেন:
'হ্যারে, কবির মুখ বন্ধ করার মতো কেউ কি নেই এখানে?'

রাসূলের হাঁক শুনে এগিয়ে এলেন আবু বকর (রা.)। তারপর আব্বাস বিন মিরদাসকে নিয়ে গেলেন সেখানে, যেখানে জড়ো করে রাখা হয়েছিলো যুদ্ধলব্ধ পশুগুলো। এবং বাছাই করে দিয়ে দিলেন একশত উট। অনুযোগের পরিবর্তে কবির মুখে ফুটে উঠলো উল্লাসের ডগমগে চাঁদ। (খায়ানাহ আল আদাব, ১/১৫৩; ইহায়া উলুম আদদীন, ১৫)

একদা এই কবি আব্বাস ইবনে মিরদাস (রা.), রাসূল (সা.)-এর প্রশংসায় আবৃত্তি করলেন চমৎকার এবং অত্যন্ত উঁচু মানের কবিতা। রাসূল (সা.) তাঁকে পুরস্কৃত করলেন মূল্যবান কাপড় দিয়ে। (ইবনে আবদে রাক্বিহ, আল ইকদুল ফারিদ)

খ. রাসূল (সা.) বলেছেন: 'কবিদেরকে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করা হচ্ছে আপন পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহার করার সমতুল্য।' (মাহাদারাত আল উদাবা, ১/৭৯)।

গ. একদা কবি হাস্‌সান বিন সাবিত (রা.) মসজিদে নববীতে কবিতা পাঠ করছিলেন, আবৃত্তি করছিলেন ইসলামের দুশমনদের বিরুদ্ধে। আবৃত্তি শুনে ভীষণ খুশি হলেন রাসূল (সা.) এবং তিনি তার গায়ের চাদর উপহার দিলেন হাস্‌সান বিন সাবিতকে।

ঘ. কবি কা'ব ইবনে যুহায়ের হচ্ছেন মুআল্লাকার প্রসিদ্ধ কবি যুহায়ের ইবনে আবী সালামার ছেলে। বুযায়ের ইবনে যুহায়েরও তার ছেলে। রাসূল (সা.)-এর নবুয়ত প্রাপ্তির এক বছর পূর্বে তিনি ইন্তেকাল করেন। ইন্তেকালের সময় তার ঐ দুই পুত্রকে রাসূলের সাথে দেখা করার জন্য ওসিয়ত করে যান।

এক সময় ঐ দুই কবিপুত্র ইসলাম সম্পর্কে জানার জন্যে রাসূল (সা.)-এর উদ্দেশ্যেই যাত্রা করলেন। মদীনায পৌছেই ইসলাম গ্রহণ করলেন কবি কা'ব ইবনে যুহায়েরের ভাই বুযায়ের ইবনে যুহায়ের।

কবি কা'ব ইবনে যুহায়ের ক্ষেপে গেলেন এবং ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক কবিতা লেখা শুরু করলেন। ইসলামের বিরুদ্ধে সরাসরি বিদ্রোহও ঘোষণা করলেন কোনো কোনো কবিতায়। রাসূল (সা.) কবি কা'ব ইবনে যুহায়েরের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করলেন।

তারপর অতিক্রান্ত হয়ে গেলো বেশকিছু দিন। কবি কা'ব ইবনে যুহায়ের রাসূল (সা.) এর কাছে ধরা দিলেন। মুসলমান হয়ে গেলেন এবং রাসূলের শানে পাঠ করলেন বিখ্যাত কবিতা। 'বানাত সুয়াদ' নামে যা অমর হয়ে আছে।

কবিতা শুনে রাসূল এতোটা খুশি হলেন যে, কবির মৃত্যুদণ্ড তো তিনি মওকুফ করলেনই উপরন্তু কবিকে পুরস্কৃত করলেন তাঁর নিজের গায়ের পবিত্র চাদর দিয়ে। এই চাদরটি পরবর্তী সময়ে মুয়াবিয়া (রা.) ত্রিশ হাজার দিরহাম দিয়ে কবি কা'ব বিন যুহায়েরের বংশধরদের কাছ থেকে অনুনয়-বিনয় করে কিনে নিয়েছিলেন। (ইবনে আবদে রাব্বিহ, আল ইকদুল ফারিদ; ইবনে রাশিক, আল উমদা)

রাসূল যথার্থ কবিদের বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন; করেছেন পুরস্কৃত। সহযোগিতা করার জন্যে উৎসাহিতও করেছেন। ওপরে তার মাত্র দু-একটি প্রমাণই পেশ করা হলো। আর নীচে উদ্ধৃত করলাম কবিদের কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণের মাত্র একটি ঘটনাই।

হাকীম ইবনে হিয়াম ছিলেন রাসূল (সা.)-এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু: খাদিজা (রা.)-এর ভাইয়ের ছেলে। রাসূল (সা.)-এর পাঁচ বছরের বড়।

একবার হাকীম ইবনে হিয়াম গেলেন ইয়ামানে। (তখনো তিনি মুসলমান হননি।) রাসূলের জন্যে কিনে আনলেন ঝলমলে দ্যুতিময় একটি চাদর। পুরস্কার হিসেবে রাসূল (সা.)-কে তা দিয়েছিলেন তিনি।

কিন্তু রাসূল (সা.) বললেন: 'মুশরিকদের দেয়া কোনো হাদিয়া তো আমি গ্রহণ করি না।'

সুতরাং হাকীম ইবনে হিয়াম তা বিক্রি করে দিলেন। বিক্রি করে দিলে রাসূল (সা.) তা আবার ক্রয় করিয়ে নিলেন এবং পরিধান করলেন।

ভীষণ খুশি হলেন হাকীম বিন হিয়াম। বস্ত্রত তখনই আবৃত্তি করলেন চমৎকার এক কবিতা;

সারা মুখ আর পদদ্বয় তার

ঝলমল করে ওঠে-

বিচারক আমি বিচারের নীতি

হারালাম অকপটে!
তাঁর গৌরব অনুমান করো
বারবার তুমি যতো
সম্মান তাঁর মর্যাদা তাঁর
বেড়ে যায় আরো ততো।

হাকীম ইবনে হিয়ামের কবিতা শুনে রাসূল (সা.) উপহার দিলেন ঝলমলে এক মহামূল্যবান হাসি।

(কবি হাকীম বিন হিয়াম মুসলমান হন মক্কা বিজয়ের বছর; মাজিতুল্লা বাহ্ছ আল ইলমী ওয়াততুরাছ আল ইসলামী; হায়াতুস সাহাবা)।

কবিতাবিষয়ক জটিল সমস্যা ও রাসূল (সা.)-এর সমাধান

ক. বিশ্বকবি ডক্টর মুহম্মদ ইকবাল বলেছেন: ‘কাব্য-সাহিত্য কেমন হওয়া উচিত ও অনুচিত এই জটিল সমস্যাটি মহানবী (সা.) যেভাবে সমাধান করেছেন তা হচ্ছে এই : ইমরাউল কায়েস ইসলাম প্রচারিত হওয়ার চল্লিশ বছর পূর্বে জীবিত ছিলো। মহানবী (সা.) তার সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, ‘সেই শীর্ষ কবি হবে জাহান্নামের পথযাত্রীদের নেতা’। এখন প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, ইমরাউল কায়েসের কবিতায় এমন কি বৈশিষ্ট্য ছিলো, যে কারণে উভয় জগতের সম্রাট রাসূল (সা.) তাঁর সম্পর্কে ঐ মন্তব্য করলেন?

ইমরাউল কায়েসের কাব্যসমগ্রের ওপর চোখ বুলালে মদ, নারী, বিলাসিতা, রূপপূজার মনমাতানো কাহিনীর ছড়াছড়ি, আবেগ-উন্মাদনা, ধূলিঝড় কবলিত প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের শোকগাঁথা, বালিচাপা নির্জন শাশানভূমির হৃদয়বিদারক দৃশ্যের ভাষাচিত্র প্রভৃতির প্রাচুর্য চোখে পড়ে। মূলত এগুলোই হচ্ছে আরবের জাহেলী যুগের সমুদয় কাব্যের সৃষ্টিজগৎ। ইমরাউল কায়েস মানুষের ইচ্ছা শক্তিকে নাড়া দেয়নি, নাড়া না দিয়ে তার পরিবর্তে তাদের কল্পলোকে বিস্তার করেছে সম্মোহনের জাল। তাদের মনে সতর্কতা সৃষ্টি করার পরিবর্তে করেছে আত্মবিলীনতার বীজ রোপণ।

মহানবী (সা.) তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমালোচনার দ্বারা শিল্পকলার তাৎপর্যপূর্ণ নীতির ব্যাখ্যা করেছেন; তিনি জানিয়েছেন, শিল্পকলার সৌন্দর্যের মধ্যে এবং জীবনের সৌন্দর্যের মধ্যে সমন্বয় নাও হতে পারে। হতে পারে, কবি তার উচ্চাঙ্গের কবিতার মধ্য দিয়ে পাঠকপ্রবরকে ‘আলাল-ইললীন’, (পরম সুখের আবাসস্থলে) ভ্রমণ না করিয়ে, ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ালো ‘আস্-ফালুস্-সাফিলুনে’, নিকৃষ্টতম জায়গাগুলোতে। বস্তুত কবিতা হচ্ছে এক ধরনের যাদু। দুষ্ট হয়, সেই কবির

জানো, যে জাতির সংকটকালে, জাতির পরীক্ষার সময় উদ্দীপনার আবহ তৈরি না করে, অনুপ্রেরণার মনোহারিত্ব সৃষ্টি না করে, করে জীর্ণতা, পচাদপদতা এবং অবক্ষয়ের দাসত্ব।

তুলে ধরে যাবতীয় রুগ্নতাকে স্বাস্থ্যের প্রতীক হিসেবে, যাবতীয় অপশক্তিকে শক্তির প্রতীক হিসেবে এবং এভাবেই নিজের জাতিকে ঠেলে দেয় ধ্বংসের মুখে। অথচ তার কাজ হচ্ছে, প্রকৃতির শাস্ত সম্পদের মধ্যে যে জীবন ও শক্তি বিদ্যমান এবং তার মধ্যে যে জীবন ও শক্তি সে নিজেও অবলোকন করছে, সেই জীবন ও শক্তির সঙ্গে অন্যদেরকেও অবহিত করানো; শামিল করানো। তার কাজ নয়, এক অপগ্রহণকারীর ছদ্মাবরণে মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্বলটুকুও অপহরণ করা।

একবার বনু আয়স গোত্রের বিখ্যাত কবি, কবি 'উনতরা'র একটি কবিতা মহানবী (সা.)-কে শোনানো হলো:

কতো বিন্দ্র রজনী কেটেছে

পরিশ্রম করে করে-

যোগ্যতা যেনো অর্জন করি

হালাল আহার তরে।

মহানবী (সা.)-এর আবির্ভাবের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো মানবজীবনকে উৎকর্ষিত করা, গৌরবময় করা। পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে আশাবাদী করা, চেষ্টা-সাধনাকে ফলপ্রসূ করা। সুতরাং কবিতাটি শুনে তিনি যার-পর-নাই আনন্দিত হলেন এবং সাহাবাদের সম্বোধন করে বললেন : 'কতো আরববাসীরই তো প্রশংসা শুনেছি আমি; কিন্তু তাদের কারো সাথেই, সরাসরি দেখা করার মতো কোনো আহহ আমার মধ্যে জন্মিত হয়নি। কিন্তু তবুও সত্যিই বলছি- এই কবিতার কবিকে এক নজর দেখার জন্যে আমার মধ্যে এখন একটি স্বতঃস্ফূর্ততা কাজ করছে।' আলাহ্ আকবর! তওহীদের যে কৃতি সন্তানের পবিত্র চেহারায় এক নজর দৃষ্টিপাত করা যে কোনো দর্শকের জন্য পার্থিব সৌভাগ্য এবং পারলৌকিক মুক্তির সম্বল স্বয়ং তিনি একজন প্রতিমাপূজারী আরববাসীর সাথে সাক্ষাৎ করার আহহ প্রকাশ করছেন। তাহলে এইখানেই গভীরভাবে ভাববার বিষয় রয়ে গেছে যে, কবি উনতারার কবিতায় এমন কী বক্তব্য নিহিত রয়েছে, যে কারণে ঐ কবিকে দুনিয়ার সবচেয়ে সুন্দর মানুষটি দেখতে চাচ্ছেন?

মহানবী উনতরাকে মর্যাদা দান করেছেন- তার কারণ সুস্পষ্ট। মূলত উনতারার ঐ কবিতাটি হচ্ছে স্বাস্থ্যকর যে জীবন, সেই জীবনেরই সবাক এবং প্রাণবন্ত চিত্র।

হালাল জীবিকা উপার্জনের জন্যে যে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়, যে প্রাণান্ত কষ্ট স্বীকার করতে হয়- কবি তার একটি নিখুঁত চিত্র এঁকেছেন এক অসীম মমতায় নিঃসন্দেহে।

উভয় জগতের সশ্রুট মহানবী (সা.) তাঁর নামে আমার পিতা-মাতার প্রাণ উৎসর্গিত হোক- উনতরার যে প্রশংসা করেছেন তাতে শিল্পের এক মহানীতির ব্যাখ্যা হয়ে যায়। অর্থাৎ শিল্প মানবজীবনেরই অধীন; মানবজীবনের উর্ধ্বে নয়।

মহান দাতা মানুষের সহজাত প্রকৃতির মধ্যে যে সমস্ত যোগ্যতা আমানত রেখেছেন এবং যে সব শক্তি আমানত রেখেছেন মানুষের মন-মগজে, তা তিনি রেখেছেন বিশেষ এক উদ্দেশ্যে। সেই উদ্দেশ্য হচ্ছে- জাতীয় জীবনকে সূর্যের মতো প্রোজ্জ্বল করে গড়ে তোলা। ক্ষমতার দ্বারা পরিপূর্ণতা দান করা এবং উৎসাহের মাধ্যমে কর্মচাঞ্চল্য প্রদান করা। সুতরাং প্রত্যেক মানবশিল্পকেই ঐ চূড়ান্ত লক্ষ্যের অধীনস্থ হতে হবে; অনুগত হতে হবে এবং প্রত্যেক বস্তুকে তার জীবনদানের যোগ্যতার ভিত্তিতে মূল্যায়ন করতে হবে, তার মূল্য যাচাই করার কৃষ্টিও এটাই।

যে সব জিনিসের দরুন জাহ্নত অবস্থায় আমরা ঝিমাতে আরম্ভ করি এবং আমাদের চারপাশে যে সব জীবন্ত সত্য, জাহ্নত সত্য বিরাজমান- যেগুলোর ওপর প্রাধান্য বিস্তার করাই হচ্ছে প্রকৃত জীবন- সেগুলো থেকে চোখ বন্ধ করাই হচ্ছে অবক্ষয় এবং মৃত্যুকে আহ্বান জানানো। শিল্পী এবং রূপকারকে ‘চুনিয়া বেগমে’র বিলাসবৃন্দে প্রবেশ করলে চলে না; আফিমের চুমুক থেকে বিরত থাকতে হয়- স্বীয় শিল্পের উৎকর্ষণের অলৌকিক প্রদর্শনের জন্যে- প্রকৃতির রূপকারকে। যে ভিত্তিহীন বাক্য দ্বারা অহরহ আমাদের কানকে আপ্যায়িত করা হয়, ‘উচ্চাত্তের শিল্পের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য তারই মধ্যে নিহিত’। বস্তুত তা ব্যক্তি ও সামষ্টিক অবক্ষয়ের প্রতারণামূলক কৌশল মাত্র। এটা এ জন্যেই গড়া হয়েছে, যেনো আমাদের কাছ থেকে জীবন ও ক্ষমতা ধোঁকা দিয়ে ছিনিয়ে নেয়া সহজ হয়।

সারকথা হলো, মহানবী (সা.) উনতরার কবিতার গুণ স্বীকার করে, শিল্পের একটি মূলনীতির ভিত্তি স্থাপন করেছেন যে, উচ্চাত্তের শিল্পের আসল বিকাশ কেমন হওয়া চাই? (মাকালাতে ইকবাল, সাইয়েদ আবদুল ওয়াহেদ মুয়ীনী ও মুহম্মদ আবদুল্লাহ কোরায়েশী; লুৎফর রহমান ফারুকী অনূদিত)।

খ.

কবি হাস্‌সান বিন সাবিত (রা.)-কে একবার প্রশ্ন করা হলো, প্রশ্ন করলেন রসূলে খোদার এক সাহাবী : ‘হাস্‌সান, আপনি কাকে শ্রেষ্ঠ কবি বলে মনে করেন?’

: ‘ইমরাউল কায়েস-কে’। বললেন হাস্সান বিন সাবিত।

খবরটা পৌছলো রাসূল (সা.)-এর কাছে। রাসূল (সা.) বললেন: হাস্সান ঠিকই বলেছে, দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ কবি ইমরাউল কায়েসই। তবে পরকালে তার কোনো মূল্য নেই। দুনিয়াতে মর্যাদা তার সর্বোচ্চ হলেও, পরকালে সে হবে অত্যন্ত তুচ্ছ এবং হীনমর্যাদার অধিকারী। দোযখের দরজায় সে দোযখগামী কবিদেরই নেতৃত্ব দেবে।’

অন্য একটি বর্ণনায় আছে, একবার রাসূল (সা.) এর সামনে গুরু হলো কবিদের আলোচনা। ইমরাউল কায়েস সম্পর্কে কথা উঠলে রাসূল (সা.) বললেন : ‘ইমরাউল কায়েস দুনিয়ায় খ্যাতনামা হলেও, আখেরাতে তার নাম নেবার মতো কেউ-ই থাকবে না। বরং কবিদের যে বাহিনী জাহান্নামের দিকে যাত্রা করবে, ইমরাউল কায়েস হবে তার পতাকাবাহী।’ (শারহ শাওয়াহিদ আল মুগনী)।

কবি উনতরাকে রাসূল (সা.) কেনো দেখতে চেয়েছিলেন তার কারণ নিহিত রয়েছে তারই কবিতায় আর কেনো ইমরাউল কায়েস জাহান্নামের যাত্রী কবিদের পতাকাবাহী হবে, সে বিষয়টিও নিহিত রয়েছে ইমরাউল কায়েসের কবিতার মধ্যেই। সুতরাং সৎ কবিতা এবং অসৎ কবিতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে জটিলতা নিরসন করা যায় উনতরা সম্পর্কিত ঐ হাদীস এবং কবি ইমরাউল কায়েস সম্পর্কিত হাদীস থেকে।

কবিতাপ্রেমিক রাসূল (সা.)

ক. হযরত আয়েশা (রা.) বলেন: ‘একদা রাসূল (সা.) জুতা সেলাই করছিলেন আর আমি বসে বসে আবৃত্তি করছিলাম কবিতা। এক ফাঁকে রাসূল (সা.) এর দিকে তাকালাম, দেখলাম তার কপাল ঘেমে উঠেছে এবং ঘামের বিন্দু থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে ঝলমলে জ্যোতি। আমি হতবাক হয়ে গেলাম এবং অকস্মাৎ থেমে গেলাম। তারপর রাসূল আমার দিকে তাকালেন, তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলেন: ‘আয়েশা, কি হলো তোমার? থামলে কেন? আমি বললাম : ‘ইয়া রাসূল্লাহ, আমি আপনার দিকে তাকাতেই দেখতে পেলাম, আপনার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম এবং সেই ঘাম থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে ঝলমলে জ্যোতি। হ্যাঁ, কবি আবু কাবীর আল হযালী আজ যদি আপনাকে প্রত্যক্ষ করতে পারতো, তাহলে সে ঠিকই বুঝতে পারতো যে, তার কবিতার যথোপযুক্ত নায়ক (অবিসংবাদিত কেন্দ্রীয় চরিত্র) আপনিই।’

আয়েশা (রা.)-এর কথা, (আবেগাপূত কথা) শুনে রাসূল (সা.) জিজ্ঞেস করলেন: 'আয়েশা, আবু কাবীর আল হুযালী কি বলেছে, বলো না।' আয়েশা বললেন, আমি মাত্র দু-টি চরণ আবৃত্তি করলাম:

‘সে এক যুবক: নানা রোগ-ভোগ-
অনিষ্ট-ক্ষতি-অসুখ থেকেও মুক্ত;
সেই যুবকের মুখমণ্ডলে
যেনো আকাশের মেঘের বিজলী যুক্ত।’

আয়েশা (রা.) বলেন :

‘আমার আবৃত্তির পর- রাসূল তাঁর হাতের কাজ ফেলে আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন এবং আমার দু-চোখের মাঝখানে চুমু খেয়ে বললেন :
‘আয়েশা, আল্লাহ তোমাকে উত্তম বিনিময় দান করুন।’

খ. কবি খানসা ইসলাম কবুল করলেন এবং ঐ অনুষ্ঠানেই শুরু করলেন কবিতা আবৃত্তি। শুরু করলেন রাসূল (সা.) এর সামনেই।

খানসা (রা.) একটি শেষ করেছেন তো রাসূল (সা.) শুনতে চাচ্ছেন আরো একটি। এভাবে এক বৈঠকেই কবি খানসা (রা.)-এর কাছ থেকে অনেকগুলো কবিতা শুনলেন রাসূল (সা.)।

মূলত এই খ্যাতিমান মহিলা সাহাবী কবির কবিতা রাসূল (সা.) পছন্দ করতেন। সেই কারণে মাঝে-মাঝেই তিনি তার কবিতা শোনার অগ্রহ প্রকাশ করতেন। (খায়ানাহ আল আদাব ১/৪৩৪)

গ. একবার একই বাহনে চড়েছেন মহানবী (সা.) এবং আশ্-শারীদ। তারপর যেতে যেতে শারীদকে জিজ্ঞেস করলেন : ‘শারিদ, তোমার কি উমাইয়া বিন আবুস-সাল্‌তের কোনো কবিতা মুখস্থ আছে? বললেন : আছে।’ রাসূল নির্দেশ করলেন : ‘তাহলে আবৃত্তি করো, শুন।’

শারীদ একটার-পর একটা আবৃত্তি করছেন আর রাসূল (সা.) বলছেন: ‘আরো শারীদ, আরো।’ শারিদ সেদিন রাসূল (সা.)-কে একশটির মতো কবিতা শুনিয়েছিলেন। (মুসলিম ৪/৭৬৭)

ঘ. দীর্ঘ সফর। রাত হয়েছে বেশ। রাসূল (সা.) চলছেন মরুভূমির পথ ধরে। তারপর একসময় বললেন : ‘হাস্‌সান কোথায়, হাস্‌সান?’

এগিয়ে এলেন কবি হাস্‌সান বিন সাবিত। বললেন: ‘লাব্বায়েক- আমি হাজির- এই তো আমি এখানে, ইয়া রাসূল্লাহ।’

হাস্‌সান রাসূল (সা.) এর কাছে এলে তিনি আবার বললেন : ‘আমাদের কিছু হুদা (উটের গতিসম্ভারক সুরেলা গান) শোনাও তো ।’

হাস্‌সান শুরু করলেন কবিতা । নিরবিচ্ছিন্নভাবে রাসূল (সা.) এর স্তনে চললেন । উট ক্ষিপ্তগতিতে ছুটে চললো, অধিকতর ক্ষিপ্তগতিতে । এবং এমন ক্ষিপ্তগতিতে যে, উটের পিঠের হাওদাটি পড়ে যাবার উপক্রম হলো । মহানবী হুদা থামাতে বললেন, সেই সঙ্গে আরো বললেন : ‘কবিতাকে বিদ্যুতের চেয়েও গতিসম্ভারক, তীরের আঘাতের চেয়েও ক্ষিপ্ত এবং মারাত্মক বলা হয়- এ জন্যেই ।’ (ইফাহানী; আল আগানী ৪/১৪৩) ।

রাসূল (সা.) শুধুমাত্র কবিতাপ্রেমিকই ছিলেন না, কবিতার যথার্থ সমঝদারও ছিলেন । যথার্থ সমঝদার ছিলেন বলে কখনো কখনো কোনো কোনো কবিতা তিনি সংশোধনও করে দিয়েছেন ।

কবিতা সম্পাদনায় মহানবী (সা.)

ক. একবার এক কবি তার নিজের কবিতা রাসূল (সা.)-এর সামনে পেশ করলো । যার একটি চরণ ছিলো এই রকম:

বার্ধক্য আর ইসলাম জানি মানুষকে পৃথিবীর
পাক-সাক্ষ করে, করে পবিত্র যেমন স্বচ্ছ নীর ।

রাসূল (সা.) কবিতাটি পছন্দ করলেন ঠিকই কিন্তু শব্দবিন্যাস সম্পর্কে বললেন যে, ইসলাম শব্দটিকে পরে না এনে, আনতে হবে প্রথমে । এবং সংশোধনও করে দিলেন এইভাবে :

ইসলাম আর বার্ধক্য জানি মানুষকে পৃথিবীর
পাক-সাক্ষ করে, করে পবিত্র যেমন স্বচ্ছ নীর ।

সাহাবী এই সংশোধনের প্রেক্ষিতে বললেন : ‘ইসলাম শব্দটিকে প্রথমে আনলে হৃন্দের স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হতে পারে ইয়া রাসূল্লাহ ।’

রাসূল (সা.) সাহাবীদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন; তারপরও নিজে নিজে আবৃত্তি করতে লাগলেন, ঐ ইসলাম শব্দটিকে প্রথমে এনেই ।

খ. কবি কা’ব বিন যুহায়ের এসেছেন প্রাণ ভিক্ষা চাইতে । এসেছেন রাসূল (সা.)-এর কাছে । তারপর সুদীর্ঘ কবিতা ‘বানাত সুয়াদ’ পড়া শুরু করলেন । পড়তে পড়তে যখন উচ্চারণ করলেন :

রাসূল আমার পূর্ণ আলোর বলয়-
আঁধারের পথ উজ্জ্বল হলো- তাতে

খাপ-খোলা-এক মুক্ত সে তরবারি
ভারতের তা- চক্চকে ধার যাতে ।

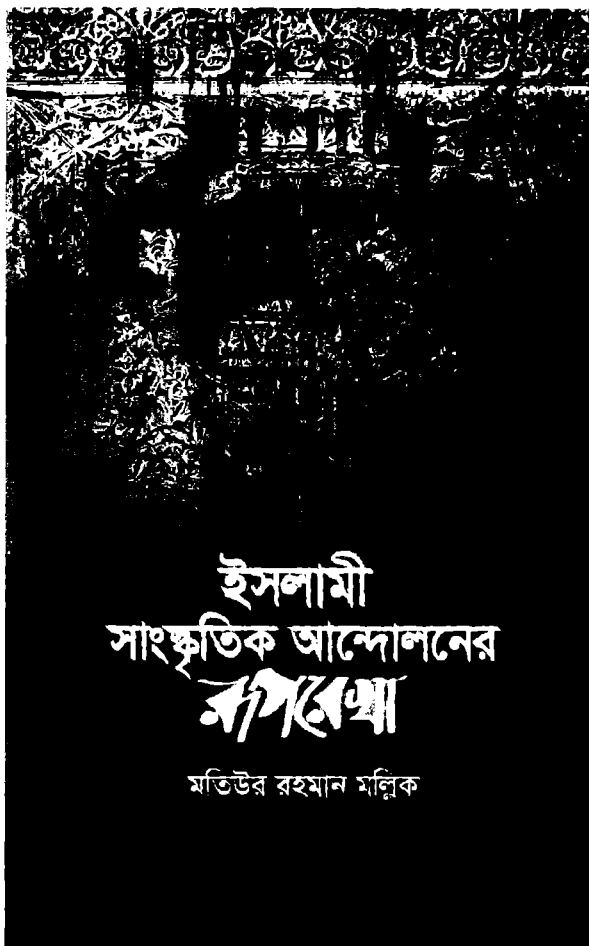
রাসূল (সা.) থামতে বললেন কবিকে এবং সংশোধন করে দিলেন এই বলে যে, 'ভারতের তরবারি হবে না, হবে আল্লাহ'র তরবারি ।'

কবি রাসূল (সা.)-এর সংশোধন মান্য করলেন এবং তিনি তার কবিতায় যুক্ত করলেন 'ভারতের তরবারির' স্থলে 'আল্লাহ'র তরবারি' ।

রাসূল (সা.) মানবজীবনের যাবতীয় সমস্যা সম্পর্কে সুষ্ঠু সমাধান রেখে গেছেন । সুতরাং কবি ও কবিতা সম্পর্কে তাঁর একটি দিকনির্দেশনা একান্তভাবে থাকতে হবে । সেই দিক নির্দেশনা পেতে হলো রাসূল (সা.)-এর জীবনচর্চা ও অভিভাষণের দিক-দিগন্ত আবিষ্কার করে যেতে হবে অবশ্যই ।

ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের রূপরেখা

[অগ্রদ্বিত]



ইসলামী
সাংস্কৃতিক আন্দোলনের
নগরবেত্তা

মতিউর রহমান মল্লিক

প্রসঙ্গ কথা

‘ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের রূপরেখা’ কবির একটি গুরুত্বপূর্ণ পাণ্ডুলিপি। এতে তিনটি প্রবন্ধ রয়েছে। প্রথমটি ‘ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের রূপরেখা’ দ্বিতীয়টি ‘বাংলাদেশে ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলন : একটি অন্তর্গত মূল্যায়নের খসড়া’ এবং ‘একটি সফল ইসলামী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান : প্রস্তুতি ও সাবধানতার অনুষঙ্গ’। প্রবন্ধ তিনটিতে লেখক সাহিত্য সাংস্কৃতিক আন্দোলন পরিচালনা ও এর ব্যাপ্তি সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেয়ার রূপরেখার রেখা টেনেছেন। পাণ্ডুলিপিটির প্রচ্ছদ ঐকেছেন হাশেম আলী।

সূচিপত্র

ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের রূপরেখা/ ১৯৫

বাংলাদেশে ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলন : একটি অন্তর্গত মূল্যায়নের খসড়া/ ২২৪

একটি সফল ইসলামী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান : প্রস্তুতি ও সাবধানতার অনুষঙ্গে/ ২৪০

ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের রূপরেখা

এক বিখ্যাত দার্শনিক এবং গবেষক ইসলামী সংস্কৃতির ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে চমৎকার মন্তব্য করেছেন: ইসলামী সংস্কৃতির ব্যবস্থাপনা একটি রাজ্যের ব্যবস্থাপনার মতো। এতে খোদার মর্যাদা সাধারণ ধর্মীয় মত অনুসারে নিছক একজন উপাস্যের মতো নয়। বরং দুনিয়াবী মত অনুযায়ী তিনি সর্বোচ্চ শাসকও। রসূল (সা.) তার প্রতিনিধি। কোরআন ও তার আইন গ্রন্থ।’

উদ্ধৃত মন্তব্যটি যদিও ইসলামী সংস্কৃতির ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে, তবুও তার ব্যাপকতা এবং গভীরতা নিয়ে আমাদেরকে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করে বলে ইসলামী সংস্কৃতি সম্বন্ধেও ঐ কথাটির গুরুত্ব আমরা কবুল করেছি। মূলত সংস্কৃতির যে কোনো দিক ও বিভাগ নিয়ে আলোচনা করতে যাওয়াটা সাধারণ কোনো ব্যাপার নয় এবং স্বল্প পরিসরে তা সম্ভবও নয়। তারপরও আমরা একটি তাৎক্ষণিক ধারণা নেবার জন্য যতদূর পারা যায়— উদ্যোগী হতে পারি।

আমরা প্রবন্ধের শিরোনামে উল্লেখিত প্রায় প্রত্যেকটি শব্দকে অনুসরণ করে আলোচনায় প্রবৃত্ত হবার প্রয়াস চালিয়ে যাবো। তাতে করে ধারাবাহিকতাও রক্ষিত হবে এবং একটি সঙ্গত পরিণামকেও স্বাগত জানানো যাবে বলে আশা করা যায়।

ইসলাম

প্রথমেই ইসলামের একটি তাৎপর্যগত দিক নিয়ে আলোচনা করতে পারলে এবং শেষ পর্যন্ত তার মৌলিক অনুপ্রেরণা ধরে রাখতে পারলে অবশ্যই একটি আকাঙ্ক্ষিত উপসংহার উপার্জন করা যাবে ইনশাআল্লাহ।

পৃথিবীর সকল দেশের মুসলমান নিজেদের জীবন-ব্যবস্থাকে ইসলাম নামে অভিহিত করে থাকে।

ইসলাম শব্দের উল্লেখ রয়েছে আল কোরআনে ৮টি জায়গায়। শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে :

১. বাহ্য ও অভ্যন্তরীণ উভয়বিধ অপবিত্রতা [বিপদ-আপদ] ও দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত থাকা।
২. সন্ধি ও নিরাপত্তা।
৩. শান্তি।
৪. আনুগত্য ও হুকুম পালন।

সালাম [سَلَام] এবং সাল্ম [سَلَم] এই উভয় শব্দেরই অর্থ হচ্ছে- আনুগত্য, আত্মসমর্পণ ও হুকুম পালন।

সিল্ম [سِلْم], সিলাম [سِلَام] এবং সালিম [سَلِيم]-এর অর্থ হলো- কঠিন প্রচুর, কারণ এতে [অবিশ্বাসীদের জন্য] কোমলতা নেই, নরম হওয়া থেকে মুক্ত।

সালাম [سَلَام] এর অর্থ- বাবলা বৃক্ষের ন্যায় কন্টকযুক্ত বৃক্ষ, যে বৃক্ষ কন্টক থাকায় বিপদাপদ থেকে মুক্ত থাকে। আসসালাম [السلام] শব্দটির মধ্যেও – যা আল্লাহ তা'লার গুণবাচক নাম বটে – যাবতীয় দুর্বলতা থেকে মুক্ত থাকার অর্থ নিহিত রয়েছে।

রুহুল মায়ানি গ্রন্থে আসসালাম শব্দটির নিম্নোক্ত অর্থ উপস্থাপন করা হয়েছে :

ক. نُوَ السَّلَامَةِ مِنْ كُلِّ نَقْصٍ وَاقَةٍ

‘যাবতীয় বিপদাপদ ও দোষত্রুটি থেকে মুক্ত’

খ. هُوَ الَّذِي تُرْجَى مِنْهُ السَّلَامَةُ

‘সেই সত্তা যার নিকট থেকে শান্তি ও নিরাপত্তা লাভের আশা করা যায়’।

গ. السَّلَامُ اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى لِسَلَامَةٍ مِنَ الْغَيْبِ

এই আসসালাম, আল্লাহ তা'লার একটি নাম, এই কারণে যে, তিনি যাবতীয় দোষত্রুটি থেকে মুক্ত ও পবিত্র।^২

ওপরের বিশ্লেষণকে মান্য করে ইসলামের একটি মনোরম সংজ্ঞা দেয়া যায় :
ইসলাম আল্লাহ-প্রদত্ত একটি জীবন-ব্যবস্থা যা গ্রহণ করলে-

১. বিপদাপদ থেকে মুক্ত থাকা যায়, দোষ-ত্রুটি থেকেও মুক্ত থাকা যায়;
২. শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করা যায়;
৩. সেই মহাপবিত্র সত্তার- যিনি মানবজাতিকে ত্রুটিমুক্ত করবার জন্য ইসলামী জীবনবিধান দান করেছেন- রঙে রঙিন হওয়া সম্ভব হয়।

ইসলামের অর্থ ও সংজ্ঞা সম্পর্কে 'ISLAM IN FOCUS' গ্রন্থে বলা হয়েছে :

Calls Abraham and all authentic prophet Muslims and designates their in religions by one and the same title, namely Islam. Hence, the Muslim is not only a flowers of Muhammad exclusively; he also follows Abraham, Moses, Jesus, and the rest of Gods messengers.

'The word Islam is derived from the Arabic root 'Salma' which means, among other things, peace, purity, submission and obedience. In the religious sense the word Islam means submission to the Will of God and obedience to His Law. The connection between the original and the religious meanings of the words is strong and obvious. Only through submission to Will of God and by obedience to His Law Can one achieve true peace and enjoy lasting purity.'

বস্তুত ইসলাম একটি শ্বাশত জীবন-ব্যবস্থা। Islam in Focus এ - সম্পর্কেও তার বক্তব্য প্রদান করেছে: The proper name of the religion is Islam his followers are properly called Muslims. In the religious context, the word Islam means submission to the will of God and obedience to God's Law. The will of God defined by the Koran as good and compassionate, and His Law as the most beneficent and equitable. Any human being who so submits and obeys is therefore, a Muslim in a moral state of Islam.

ইসলাম এবং আত্মশক্তি সম্পর্কে একটি বলিষ্ঠ উচ্চারণ করেছেন আল্লামা ইকবাল:

খুদীর নূর, খুদীর অগ্নি ইসলামের প্রাণ,
খুদীর অগ্নি জীবনের জন্যে নূর ও অবস্থিতি,
সবকিছুর পঞ্জিকা এটি, সবকিছুর মূল
এ প্রাণশক্তিকে যদিও আবৃত রেখেছে প্রকৃতি ।^৭

আর কবি নজরুল বলেছেন :

ইসলাম সেতো পরশ মানিক তাকে যে পেয়েছে খুঁজি
পরশে তাহার সোনা হলো যারা তাদেরি আমরা বুঝি ।

সংস্কৃতি

‘সংস্কৃতি’ শব্দটির অর্থ- শিক্ষা বা চর্চা দ্বারা লব্ধ বিদ্যা-বুদ্ধি-শিল্প-কলা-রুচি-নীতি। উৎকর্ষ, কৃষ্টি, culture, তমদ্দুন। মার্জনা, পরিশীলন, অনুশীলন। সভ্যতা, ভদ্রতা, শিষ্টতা। সংস্কার, শুদ্ধি, শোধন, পরিষ্কার বা নির্মল করা, সংশোধন। মানব সমাজের মানসিক বিকাশের প্রমাণ। একটি জাতির মানসিক বিকাশের অবস্থা। কোনো জাতির বৈশিষ্ট্যসূচক শিল্প-সাহিত্য, বিশ্বাস-সমাজনীতি ইত্যাদি।

ড. কাজী দীন মুহম্মদ তার ‘ইসলামী সংস্কৃতির রূপ’ প্রবন্ধে বলেছেন: ‘কালচার’ কি? উৎকর্ষ বা অনুশীলন। আজকাল সাধারণত: একটা বিশেষ অর্থে এর ব্যবহার করা হচ্ছে: যার অর্থ হচ্ছে মানব-মনের উৎকর্ষ সাধন পদ্ধতি বা রূপায়ন।

অনেকে Refinement অর্থেও কথাটার ব্যবহার করে থাকেন। আবার কারো কারো মতে, মানবকল্যাণমুখীনতারই নাম ‘কালচার’। কেউ কেউ আবার Civilization- এর সঙ্গে Culture- এর কোনো তফাৎ খুঁজে পান না।

অক্সফোর্ড ডিকশনারীতে এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে : Trained and refined state the understanding and manners and tastes, phase of this prevalent at a time or place, instilling of it by training, artificial rearing of bees, fish, bacteria etc. অর্থাৎ সংস্কৃতি হলো বোধ, আচরণ ও আনন্দনের প্রশিক্ষিত রূপ। একই সময় ও স্থানের প্রেক্ষিতে সে-সবের ত্র্যমোল্লয়ন, বলা যেতে পারে; মৌমাছি, মাছ, ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদির প্রজননের ধরনে ধীরে ধীরে সে-সব পরিশীলিত রূপের চর্চা।

‘আমাদের সংস্কৃতি প্রবন্ধে আবদুল মান্নান তালিব বলেছেন : তাহযীব ও তমদ্দুন দুটো আরবি শব্দ। তমদ্দুন শব্দটা এসেছে ‘মুদন’ থেকে। তা থেকে ‘মাদানিয়াত’ অর্থাৎ নাগরিক বোধ। অন্য কথায় নগর জীবন ভিত্তিতে যে পরিশীলিত সভ্যতা গড়ে ওঠে তাঁকে তমদ্দুন বলা যায়। তাই তমদ্দুন সভ্যতার প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। অন্যদিকে ‘তাহযীব’ শব্দটা এসেছে ‘হায্ব’ থেকে। হাযাবা, হায্বাবা, তাহযীব মানে কেটে সমান করা। যেমন বাগানের চারদিকে যে গাছের বেড়া দেয়া হয় মালি কাঁচি দিয়ে কেটে তার মাথাগুলো তাহযীব করে। অর্থাৎ মাথা ও দু’পাশ কাঁচি দিয়ে কেটে সমান করে। কোনো একটা ডাল বা পাতা সমান করে কাটা সীমানা ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইলে মালির কাঁচি সঙ্গে সঙ্গে তার মাথা কেটে সমান করে দেয়। এভাবে পরিশীলিত ও পরিমার্জিত করাকে তাহযীব বলে। তাই তাহযীব অর্থ দাঁড়ায় মানুষের পরিশীলিত জীবনধারা। অবশ্যি ‘কালচার’ এর ধারণা বিস্তার লাভ করার পরই আমাদের দেশে তাহযীব-তমদ্দুন এবং পরবর্তীকালে সংস্কৃতি শব্দটার প্রচলন শুরু হয়।

কালচার সম্পর্কে মজার কথা বলেছেন আবুল মনসুর আহমদ তার 'বাংলাদেশের কালচার' গ্রন্থের 'কালচার কী?' নামের প্রবন্ধে :

কালচারের সংজ্ঞা দেওয়া খুবই কঠিন। এতো কঠিন যে উনিশ শতকের মধ্য ভাগ হইতে বিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত পুরা একশ বছরের দীর্ঘ সময়ের মধ্যে ইউরোপ-আমেরিকার দুইজন পণ্ডিতও এ ব্যাপারে একমত হইতে পারেন নাই। তার উপর অনেকেই আবার কালচার ও সিভিলিজেশনকে একই অর্থে ব্যবহার করিয়া বিষয়টাকে আরও জটিল ও সমস্যাটাকে আরও জোরালো করিয়া ফেলিয়াছেন। ফলে অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে কালচারকে ডিফাইন করার আর কোনও উপায় নাই। বিশ্লেষণ দ্বারাই উহাকে বুঝিতে হইবে।

ইংরেজি সাহিত্যে কালচার শব্দটা প্রথম আমদানি করেন ফ্রান্সিস বেকন ষোল শতকের শেষ দিকে। উহাকে ডিফাইন করার চেষ্টা করেন সর্বপ্রথম ম্যাথু আর্নল্ড এবং ওয়াল্টো ইমার্সন আমেরিকায় উনিশ শতকের মাঝামাঝি। কিন্তু কালচার শব্দের যে অর্থে তারা উহার সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছিলেন শব্দটা বেশিদিন সে অর্থে সীমাবদ্ধ থাকে নাই। বিশ শতকের মাঝামাঝি রবার্ট এয়রা পার্ক ও টেইলার প্রভৃতি মার্কিন পণ্ডিত এবং টার্নার ও ল্যাক্সি প্রভৃতি ইংরাজী পণ্ডিতগণের লেখায় কালচার শব্দটা অনেক ব্যাপক ও গভীর অর্থে ব্যবহার হইতে শুরু করে। এর ফলে শব্দটা নতুন তাৎপর্য গ্রহণ করে। কিন্তু তাতে সমস্যা মেটে নাই বরঞ্চ শব্দটা ব্যাপকতর ও গভীরতর মানে গ্রহণ করার ফলে এই দিককার জটিলতা আরো ব্যাপক ও গভীর হইয়াছে। সেই জটিলতা কতোটা ভয়াবহ ও মানবতাবিরোধী হয়েছিলো তার একটি চিহ্ন ঐক্যেছেন মার্মেডিউক পিকথল। পরের একটি উপ-অধ্যায়ে সে-বিষয়টিকে তুলে ধরতে চাই।

সংস্কৃতিকে বোঝার জন্যে সভ্যতাকে অনুধাবন করার একটি তাৎপর্য উদ্ঘাটিত হওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়। আবুল মনসুর আহমদ এই ব্যাপারে চমৎকার উদাহরণ পেশ করে বলেছেন :

'মাছ-গোশত-তরকারী রাখিয়া খাইবে, না কাঁচা খাইবে, এটা হইতে পারে সভ্যতার প্রশ্ন। কিন্তু কি প্রণালীতে রান্না করিবে, কোনটা খাইবে, আর কোনটা খাইবে না, কোনটা হালাল, কোনটা হারাম, কি ধরনের পাক-প্রণালী পছন্দের পেস্ট্রি-প্যাটিস ভালো, না রসগোল্লা সন্দেশ ভালো, এ সব কালচারের প্রশ্ন। খেলা-ধুলাকে মানুষের কর্মজীবনের স্বাভাবিক অঙ্গ স্বীকার সভ্যতা। কিন্তু খেলার বিভিন্ন রূপ: ফুটবল না রাগবি, ক্রিকেট না বেসবল, পলো না ঘোড়দৌড়, হকি না ডাঙগুলি, এসব সভ্যতার প্রশ্ন নয়, কালচারের প্রশ্ন মাত্র।' (বাংলাদেশের কালচার)

প্রাজ্ঞ-পণ্ডিত আবুল হাশিম তার ‘ইসলামী সংস্কৃতির অর্থ’ গ্রন্থে সংস্কৃতি এবং সংস্কৃতির বাহন প্রসঙ্গে বলেন: ‘সাহিত্য, সংগীত, নৃত্য, কারুকার্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্য প্রভৃতি শিল্পকলাই সংস্কৃতি। ইহা সত্য নহে। অর্থাৎ শিল্পকলাই সংস্কৃতি নহে— উহার সংস্কৃতির বাহন।’

তবে সংস্কৃতি কাকে বলে? মানুষের দৈহিক ও মানসিক বৃত্তিসমূহের উৎকর্ষ সাধন এবং তাহার ব্যবহারিক জীবন ও প্রত্যক্ষ জড়-পরিবেশে সেগুলির ফলিত রূপই হইতেছে সংস্কৃতি।’

পাশ্চাত্য দার্শনিকদের অনেকেই সংস্কৃতিকে একটি complex জটিল এবং মনোবিকৃতির বিষয় বলে মনে করেছেন। E.B. Tylor তাদের একজন। তিনি তাঁর Primitive Culture গ্রন্থে লিখেছেন : Culture is that complex-whole which includes knowledge, art, moral law custom and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society.

অর্থাৎ সমাজের সদস্যরূপে অর্জিত আচার, আচরণ, ব্যবহার, জ্ঞান, বিশ্বাস, শিল্পকলা, নীতি, প্রথা, আইন, ইত্যাদির জটিল সমাবেশই হলো সংস্কৃতি।

সত্যিকথা বলতে কি, সংস্কৃতি সম্পর্কে পাশ্চাত্য দার্শনিকদের ঐ মারাত্মক অনৈক্য, পশ্চিমা সমাজকে এখন মানবতাবিধ্বংসী মানব গোষ্ঠীতে পরিণত করেছে।

পাশ্চাত্য জগৎ অন্তত পক্ষে প্রুটোর দর্শনকেও যদি গ্রহণ করতো, তাহলেও মনে হয় এতোটা অধঃপতন নেমে আসতো না। কিন্তু তারা সার্বিকভাবেই গ্রহণ করেছিলো এ্যারিস্টটলের সামাজিকক্রিয়া-প্রক্রিয়া-বিচ্ছিন্ন দর্শনকে।

প্রুটোর দর্শন ছিলো সমাজ-সম্পৃক্ত। তিনি শিল্পকে দেখেছিলেন শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে যে শিক্ষা আবার রাষ্ট্রব্যবস্থার শক্তি ও স্থায়িত্বের জন্য ব্যবহৃত হবে। অর্থাৎ শিল্পকে শুধু শিল্প হিসেবে না বিচার করে তিনি রাষ্ট্র ও সমাজের কল্যাণ ও পরিপোষণে শিল্পের কার্যকারিতার দিকটিই বিবেচনা করেছেন। অর্থাৎ প্রুটোর লক্ষ্য ব্যবহারিক। কিন্তু এ্যারিস্টটল শিল্পকে স্বাধীন ও সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছেন, শিল্পের মৌলিক বিষয়ে এ্যারিস্টটলের উক্ত : ‘হে তেখনে মিমেইতাই তেন ফসিনু’ অর্থাৎ শিল্প স্বভাবের অনুসরণ করে। স্বভাব যা করতে ইচ্ছে করবে শিল্পও তাই করবে। কিন্তু প্রুটো তা চাইতে পারেননি বলে ট্রাজেডির রচয়িতাদের থিকার দিয়েছেন :

“The tragic poet in an imitator and therefore, like all over imitators, he is thrice removed from the throne of truth.”

অর্থাৎ ট্রাজিক a drama of elevated them and diction with unhappy ending কবি হলেন নকলবাজ, সুতরাং, সকল নকলবাজের মতোই, তিন সত্যের সিংহাসন থেকে [ঐ ট্রাজিক কবি] তিন গুণ অপসারিত হলেন।

এয়ারিস্টটলের শিল্পের ক্ষেত্রে যা ইচ্ছে তাই করবার দর্শন যে কোথায় গিয়ে ঠেকেছে তা আজ গোটা দুনিয়ার সচেতন মানুষ টের পাচ্ছে। সুতরাং এয়ারিস্টটলের শিল্প-দর্শনকে স্বাধীন শিল্প-দর্শন না বলে বলা উচিত লাগামহীন শিল্প-দর্শন

লাগামহীন শিল্প দর্শন

লাগামহীন শিল্প-দর্শনের একটি নমুনা পেশ করেছেন মার্মেডিউক পিকথল তাঁর 'ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা' নামে প্রকাশিত একটি বক্তৃতায় :

কয়েক বছর আগে ইংল্যান্ডের সংবাদপত্র-মহলের একটি আলোচনার কথা আপনাদের কারো নিশ্চয়ই স্মরণ আছে। প্রশ্নটি ছিলো এই:

মনে করুন একটি কক্ষে একটি জীবন্ত শিশুর সঙ্গে একটি সুবিখ্যাত ও অনুপম সুন্দর- গ্রীক ভাস্কর্য মূর্তি রয়েছে; সমপর্যায়ের মূর্তির মধ্যে এ মূর্তিটি অসাধারণ ও অভূলনীয় সুতরাং এর ছান পূরণ অসম্ভব। এখন ধরুন, কক্ষটিতে আগুন লেগেছে, আর মূর্তি ও শিশুটির মধ্যে কেবল একটিকেই বাঁচানো সম্ভব; এ অবস্থায় কাকে বাঁচাতে হবে? আমার মনে আছে, প্রায় অধিকাংশ সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী ও পদস্থ ব্যক্তি হতভাগ্য শিশুটির সামনে মৃত্যুর দ্বার উন্মুক্ত করে সেই অনুপম গ্রীক ভাস্কর্য মূর্তিটি রক্ষার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের যুক্তি ছিলো, প্রতিদিন লাখ লাখ শিশুর জন্ম হয়; পক্ষান্তরে প্রাচীন গ্রীক ভাস্কর্য শিল্পের সেই শ্রেষ্ঠতম নিদর্শনটির ছানপূরণ কখনো সম্ভব হবে না। কোনো মুসলমান কখনো এই অমানবিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রসূত অভিমত গ্রহণ করতে পারে না; কিংবা এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিপোষক হতে পারে না। এই দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে প্রতীকবাদিতা তথা প্রতিমাপূজার সর্বশেষ মার্জিত রূপ।

শিল্প-সংস্কৃতির ঐ প্রতীকপূজারী ইউরোপকে যথার্থভাবে বুঝতে সবচেয়ে বেশি পারদম ছিলেন মহাকবি ইকবাল। তাই তিনি খোলাখুলিভাবে ইউরোপ সম্পর্কে তার মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন তার 'প্রাচ্যের জ্ঞান' কবিতায়:

জ্ঞানীরা নিরাশ হলো ইউরোপ থেকে কেননা এর জাতিদের অন্তর পবিত্র নয়।

আর শিল্পের গোলামদেরকে লক্ষ্য করে উচ্চারণ করেছিলেন তিনি তার ‘শিল্পীদের প্রতি’ কবিতায়:

তোমার আত্মা যদি দাসত্ব দুঃখে পীড়িত হয়ে থাকে
তাহলে শিল্পের জাহানও তোমার
মন্দির প্রদক্ষিণ ও সিজদার সমাবেশ ।

প্রকৃত শিল্পীর দায়িত্ব সম্পর্কেও কবি ইকবাল চিরদিনের বাণী উপস্থাপন করেছেন ‘মিসরের পিরামিড কবিতায় :

প্রকৃতির দাসত্ব হতে শিল্পকে আজাদ করো
শিল্পীরা শিকারী, শিকার কখনো নয় ।

সংস্কৃতি বিভাজ্য কোনো বিষয় নয়

এক শ্রেণির বুদ্ধিজীবী মনে করেন, শিল্প ও সংস্কৃতির কর্মতৎপরতা এবং রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কর্মচঞ্চলতা একসাথে চলতে পারে না অর্থাৎ সমাজ-সংস্কার আন্দোলন আর শিল্প-সংস্কৃতির আন্দোলন আদৌ এক নয় এবং এই দুটো বিষয়কে একই ধরনের কর্মসূচির আওতায়ও আনা সম্ভব নয় । কিন্তু ড. আহমদ শরীফ যদিও তিনি ইতিবাচক বিশ্বাসের ঘোরতর বিরোধী- বলছেন অন্য কথা এবং বলছেন সংস্কৃতির বিষয়ে নয়, সাহিত্য সম্পর্কেও নয় । বলছেন লেখার মাধ্যমে কিছু সংখ্যক লোককে উজ্জীবিত করে গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষায় :

‘মানবতাবাদী লেখকের উদ্দিষ্ট পাঠক মধ্য ও উচ্চ বিস্তারিত শিক্ষিত জনগণই । তাদের কিছু সংখ্যক লেখার মাধ্যমে সংবেদনশীল ও সংগ্রামী করে গড়ে তুলতে পারলেই তাদের মাধ্যমেই গণসংযোগ ও গণ-আন্দোলন সম্ভবপর হয় । দুনিয়া জুড়ে সৈন্যরা ছড়িয়ে রয়েছে, কেবল সেনাপতিরই অভাব । দুর্যোগ-দুর্দিনে শিক্ষিত সংবেদনশীল দৃঢ়চিত্ত সাহসী ও ত্যাগ প্রবণ কর্মীর নেতৃত্বই সংগ্রামে সাফল্য আনে ।’

আহমদ শরীফ এখানে একজন লেখকের সাধনাকে এক দৃঢ়চিত্ত কর্মীর নেতৃত্বে পরিণত করার কথা বলেছেন । গণ-আন্দোলনের আয়তক্ষেত্রকে আদৌ বিভাজন করেননি । লেখক এবং কর্মীর সংগ্রামের পুণ্যভূমিকে পৃথক করে দেখাননি ।

অধ্যাপক কবীর চৌধুরী ‘শিল্পীর কমিটমেন্ট’ প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন:

‘শিল্পীর কমিটমেন্ট কথাটি অপেক্ষাকৃত হাল আমলের । কিন্তু এর মূল বিষয়টি সৃজনশীল শিল্পকর্মের শুরু থেকেই লক্ষ্য করা যায় । শিল্পী স্বেচ্ছাচারী হবেন না, মানবতাবিরোধী হবেন না । পারিপার্শ্ব ভুলে গিয়ে

আত্মকেন্দ্রিক ও জীবনবিমুখ হবেন না, দায়িত্বহীন হবেন না, অন্তঃ,
এ অকল্যাণ, অসুন্দরকে প্রণয় দেবেন না। তিনি 'কমিটেড' থাকবেন,
অঙ্গীকারবদ্ধ থাকবেন, নিবেদিতচিত্ত থাকবেন সুন্দর শুভ, কল্যাণ ও
মানবতার প্রতি। এ নিয়ে কোনো তর্ক নেই।'

শ্রেষ্ঠ শিল্পীকে অবশ্য নিশ্চিহ্ন খোঁপবন্দী করা যায় না। সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা
রাজনৈতিক স্বাধীনতার সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। একটির অভাবে আরেকটির
মৃত্যু ঘনিয়ে আসে। সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা যখন কারারুদ্ধ হয় তখন রাজনৈতিক
স্বাধীনতা ধীরে ধীরে হীনবল হয়ে পড়ে; তারপর একসময় পরাধীনতার অন্ধকারে
হারিয়ে যায় চিরকালের জন্য।

মরিয়ম জামিলা তিনি তার 'সাংস্কৃতিক দাসত্ব রাজনৈতিক দাসত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন
নয়' প্রবন্ধে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করেছেন: 'বিদেশী রাজনৈতিক শাসনের চাইতে
সাংস্কৃতিক অধীনতা অনেক বেশী ক্ষতিকর। বাস্তবে সাংস্কৃতিক দাসত্ব রাজনৈতিক
দাসত্বের শুধুমাত্র সম্পৃক্তই নয় বরং সকল ইচ্ছা ও কাজে তা অবিভাজ্য।'

কার্যকর মোকাবেলার জন্য আমাদেরকে বুঝতে হবে রাজনৈতিক দাসত্ব আর
সাংস্কৃতিক দাসত্ব কেন অবিচ্ছেদ্য, সঙ্গে সঙ্গে এটাও বুঝতে হবে যে, সাংস্কৃতিক
স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব নয়। বিরোধী এবং বিদেশী শাসনের অধীনে ইসলামের
উৎকর্ষ অসম্ভব।

সুতরাং রাজনৈতিক আন্দোলনকে এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে বিভক্ত করা
আত্মহত্যারই শামিল।

একটি জাতিকে যখন মুখোমুখি লড়াইয়ে পরাজিত করা যায় না তখন নানাভাবে
সেই জাতির মধ্যে অনৈক্যের বীজ বপন করা হয়। দীর্ঘদিন পর্যন্ত 'ইসলামে
রাজনীতি নেই' বলে এবং হারাম বলে বিপুল সংখ্যক বীরবান মানুষকে নপুংসক
করে ফেলা হয়েছে এবং কৌশলে অধিকার আদায়ের আন্দোলনকে অর্থাৎ ইসলাম
প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে কাবু করা হয়েছে। অপরদিকে 'শিল্পের জন্য শিল্প' এই
শ্লোগান দিয়ে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের উর্বর জমিন থেকেও অসংখ্য মেধাবীকে
বানানো হয়েছে নির্ভেজাল শরাবী, না হয় নারী-উপাসক-কাপুরুষ।

টলস্টয় জীবনশিল্পী ছিলেন বলে বিজ্ঞান এবং শিল্পের মধ্যে গভীর সম্পর্ক কামনা
করেছিলেন :

Science and art are closely connected as the heart and
the lungs, so if one organ is deased the other cannot
function properly.

অর্থাৎ বিজ্ঞান এবং শিল্প হৃৎপিণ্ড এবং ফুসফুসের মতোই ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। সুতরাং একটায় রোগ ধরলে অন্যটি সঠিকভাবে কাজ করতে পারবে না। টলস্টয় বিজ্ঞানকে সামাজিক উদ্দেশ্যমুখীও দেখতে চেয়েছিলেন। তিনি বলতেন:

বিজ্ঞানকেও সামাজিক উদ্দেশ্যমুখী হতে হবে। উদ্দেশ্যহীন গবেষণা সমাজের অগ্রগতিকে সাহায্য করতে পারে না। তাই প্রকৃত বিজ্ঞান হচ্ছে— আমাদের কি বিশ্বাস করা উচিত, কি বিশ্বাস করা উচিত নয়, মানুষের সম্মিলিত জীবন কিভাবে গঠিত হওয়া উচিত, কিভাবে উচিত নয়।

আল্লামা ইকবাল কেনো সমাজমনস্ক এবং রাজনীতির ব্যাপারে মনোযোগী হয়েছিলেন, তা তিনি নিজেই ব্যক্ত করেছেন:

যেহেতু বর্তমান রাজনৈতিক আদর্শসমূহ যেভাবে, ভারতে, রূপ পরিগ্রহ করেছে, তাতে তার [ইসলামের] মৌলিক কাঠামো ও প্রকৃতিকে প্রভাবিত করতে পারে, তারই জন্যে আমি রাজনীতির ব্যাপারে মনোযোগী হয়েছি।

সুতরাং সমাজ সংগঠনের আন্দোলন এবং শিল্প-সংস্কৃতির আন্দোলনের মধ্যে বিভাজন রেখা টেনে দেয়ার অর্থ হলো, একটি সুস্থ সবল দেহ থেকে একটি কর্মমুখর হাতকে জোর করে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া।

ইসলামী সংস্কৃতি

একজন মনীষী ইসলামী সংস্কৃতির একটি তাৎপর্যগত দিকের উল্লেখ করে বলেছেন:

ইসলাম সমষ্টিগতভাবে মানব প্রকৃতির স্থূল সূক্ষ্ম সবগুলো বৃত্তিরই সুসামঞ্জস্য ও কল্যাণমুখী পরিচর্যা এবং ব্যবহারিক জীবনে ও বাস্তব পরিবশে তার প্রকাশ সমর্থন করে। আর এ-ই হলো ইসলামী সংস্কৃতির অর্থ।

আর একজন মনীষী ইসলামী জীবন-দর্শনকে ইসলামী সংস্কৃতির নিয়ামত হিসেবে বিবেচনা করে বলেছেন:

ইসলাম একটি জীবন-দর্শন। এই জীবন দর্শন মানুষের বৃত্তিসমূহ পরিচর্যার ধারা ও পদ্ধতিকে যে-ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে এবং তাহার ফলে মানুষের ব্যবহারিক জীবন ও পরিবেশে যে সংস্কৃতি ফলিত হয়, তাহাই ইসলামী সংস্কৃতি। সুতরাং ইসলামী সংস্কৃতিতে ইসলামী মূল্যবোধগুলি সক্রিয় থাকিবে, অর্থাৎ ইসলামী সমাজে সাহিত্য, চিত্র, ছাপত্য, প্রভৃতি শিল্পকলা ইসলামী মূল্যবোধের বাহন হইবে।

ড. কাজী দীন মুহম্মদ তার 'ইসলামী সংস্কৃতির রূপ' প্রবন্ধে ইসলামী সংস্কৃতির একটি বিশ্লেষণধর্মী ব্যাখ্যা দিয়েছেন :

‘সাহিত্য, সংগীত, কারুকার্য, স্থাপত্য ইত্যাদি শিল্পকলা, পেনিসিলিন, রকেট, হাইড্রোজেন বোমা ইত্যাদি বিজ্ঞান-কলা যাকে বলা হয় সংস্কৃতির বাহন, এ সবই মানুষের দৈহিক ও মানসিক বৃত্তিসমূহের উৎকর্ষ সাধনে এবং তার ব্যবহারিক জীবনে ও প্রত্যক্ষ জড় পরিবেশে সেগুলোর ফলিত রূপ। জীবন ও জগতের প্রতি মানুষের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি এই বৃত্তিসমূহের পরিচর্যার ধারা ও পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করে আর সেই জন্য ওইগুলোতে মানুষের ব্যাষ্টি ও সমষ্টি-জীবনের প্রতিফলনও হয় আলাদা রকমের। এদের উপর এই জীবনানুভূতির ও জীবনাদর্শের প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক, গভীর ও মৌল। এই জীবনানুভূতি ও জীবনাদর্শ একটি জীবন-দর্শন নির্ভর। এই জীবন-দর্শন যখন মানবীয় বৃত্তিসমূহের নিয়ামক হয় তখন উহা শিল্প পরিচর্যার ধারা ও পদ্ধতিকে যেভাবে নিয়ন্ত্রিত করে সেভাবেই তারা বিকশিত হয়ে ওঠে। ইসলাম এমনি একটি জীবন-দর্শন। তাই যখন তার সংস্কৃতি প্রকাশের বাহনগুলো, শিল্প-বিজ্ঞানের ধারা-পদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত হয় ইসলামেরই সক্রিয় মূল্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতে, তখনই শিল্পে, সাধনায়, সাহিত্যে, সংগীতে, স্থাপত্যে, চিত্রে, ফুটে উঠবে ইসলামী মননশীলতা। আর সেই শিল্পকলা যে সংস্কৃতির বাহন তাই হল ইসলামী সংস্কৃতি। আর এক কথায় মানুষকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ- আশরাফুল মাখলুকাত করে সৃষ্টি করা হয়েছে, সে শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষা করতে তাকে দিন-রাত করতে হচ্ছে সাধনা আর অনুশীলন- এই সাধনার সামগ্রিক রূপ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষে যে সংস্কৃতিবোধকে উদ্বুদ্ধ করে এবং যে সংস্কৃতিবোধকে প্রভাবান্বিত করে সে জীবনবোধকেই বলা হয়েছে ইসলামী জীবনবোধ, আর এই আকিদারই বহিঃপ্রকাশ ইসলামী তমদ্দুন। সে তমদ্দুনের বাহনে অর্থাৎ শিল্প-সাহিত্যে তাই ইসলামী জীবনবোধের নব মূল্যায়নের চলমান বিকাশ।’

ইসলামী সংস্কৃতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে সবচেয়ে অর্থবহ বক্তব্য দিয়েছেন সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী (র.):

‘সংস্কৃতি হচ্ছে ধীন ও দুনিয়ার এক মহত্তম সমন্বয়। এ হচ্ছে একটি ব্যাপকতর জীবন-ব্যবস্থা বা মানুষের চিন্তা-কল্পনা, স্বভাব-চরিত্র, আচার-ব্যবহার, পারিবারিক কাজকর্ম, সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ড, রাজনৈতিক কর্মধারা, সভ্যতা ও সামাজিকতা সবকিছুর ওপরই পরিব্যপ্ত। আর এ সমস্ত বিষয়ে যে পদ্ধতি ও আইন-বিধান খোদা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, তারই সামষ্টিক নাম হচ্ছে ‘ধীন-ইসলাম’ বা ‘ইসলামী সংস্কৃতি’।’

মওদুদী (র.) ঐ বক্তব্যে ইসলামী সংস্কৃতির একটি বিপুলী এবং ব্যাপকতর সংজ্ঞা দিয়েছেন। এবং ধীন-ইসলাম ইসলামী সংস্কৃতিকে অবিভাজ্য রেখেছেন। বস্তুত ইসলামী জীবন ব্যবস্থার লক্ষ্য আর ইসলামী সংস্কৃতির চূড়ান্ত লক্ষ্য একই।

ইসলামী সংস্কৃতির উপাদান

ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে ড. কাজী দীন মুহম্মদ তাঁর 'ইসলামী সংস্কৃতির রূপ' প্রবন্ধেই সংস্কৃতির উপাদান নিয়ে একটি জটিলতর অথচ প্রয়োজনীয় আলোকপাত করেছেন :

তমদুনের বিকাশ আসলে দু'টো পরোক্ষ ও একটি প্রত্যক্ষ প্রবৃত্তির উপর নির্ভর-সাপেক্ষ ।

এক. ভৌগলিক পরিবেশ যার সংস্থাপনা আবার প্রাকৃতিক গঠন-তাৎপর্য, সংস্থাপনা ও আবহাওয়ার [Climate] উপর যথেষ্ট নির্ভরশীল ।

দুই. বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত নিছক বাইরের প্রচেষ্টা ও অনুশীলন : কোনো বিশেষ অবস্থা থেকে অবাস্তর ঘটানোর- যাকে বলা হয় ব্যষ্টি এবং সমষ্টিগত উন্নতি- সেদিকে নিয়ে যাওয়ার উদ্যম স্পৃহাজাত অভিব্যক্তির এক বিশিষ্ট সহায়ক পদ্ধতির মারফতে রূপায়ণ ।

তিন. এই প্রথম ও দ্বিতীয় দফার বাইরের কিছু নয় বরং দু'য়ের সমন্বিত অভিব্যক্তির প্রেরণা ও তজ্জাত আত্মবিকাশের প্রচেষ্টার মৌল ধারা- যার নাম দেয়া যায় ধর্ম ।

আবদুল মান্নান তালিব তার 'বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব' প্রবন্ধে 'ধর্মই সংস্কৃতির মূল উপাদান সরবরাহকারী' এবং 'ধর্মকে অস্বীকার করে যে সংস্কৃতি গড়ে ওঠে তার উন্নততর হবার কোনো প্রমাণ নেই' বলে উল্লেখ করেছেন এবং ইসলামী সংস্কৃতির তিনটি উপাদানের প্রসঙ্গেই তিনি তার 'বাংলাদেশের সংস্কৃতি' প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন এই রকম :

১. তওহীদ ইসলামী সংস্কৃতির প্রথম ও মৌলিক উপাদান ।

২. রিসালাত ও নুবওয়াত এর দ্বিতীয় মৌলিক উপাদান

৩. ইসলামী সংস্কৃতির আর একটা মৌলিক উপাদান হচ্ছে আখেরাতে বিশ্বাস ।

বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী দার্শনিক-চিন্তাবিদ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী (র.) তার 'ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা' গ্রন্থের ভূমিকায় সংস্কৃতির মৌলিক উপাদান পাঁচটি বলে উল্লেখ করেছেন এবং ঐ পাঁচটি মৌলিক উপাদানের যথার্থ ব্যাখ্যা দানের পর ইসলামী সংস্কৃতিরও মৌলিক পাঁচটি উপাদান সংক্রান্ত একটি সিদ্ধান্ত দিয়েছেন এই ধরনের :

১. জীবন সম্পর্কে ২. জীবনের চরম লক্ষ্য ৩. মৌলিক বিশ্বাস ও চিন্তাধারা
৪. ব্যক্তি প্রশিক্ষণ ৫. এবং সমাজ ব্যবস্থা ।

প্রথমটি সম্পর্কে তিনি বলেন: দুনিয়াবী জীবন সম্পর্কে তার ধারণা কি? এই দুনিয়ায় সে মানুষকে কি মর্যাদা প্রদান করে? তার [অর্থাৎ সেই সংস্কৃতির] দৃষ্টিতে দুনিয়া বস্তুটা কি? এ দুনিয়ার সাথে মানুষের সম্পর্ক কি? মানুষ এ দুনিয়াকে ভোগ-ব্যবহার করবে কিভাবে? বস্তুত জীবন-দর্শন সম্পর্কিত এই প্রশ্নগুলো এমনি গুরুত্বপূর্ণ যে মানব জীবনের তামাম ক্রিয়াাকাণ্ডের ওপরেই এগুলো গভীরভাবে প্রভাবশালী হয়ে থাকে। এই দর্শন বদলে গেলে সংস্কৃতির গোটা স্বরূপ মূলগতভাবে বদলে যায়।

এই জীবন-দর্শন সম্পর্কে ‘পাক-ভারতে ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ধারা’ প্রবন্ধে প্রবীণ দার্শনিক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ বলেন:

‘ইসলাম গোড়াতে মানব-জীবনের সবগুলো দিককে স্বীকার করে নিয়েছে বলে ইসলামকে বলা হয়েছে মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম। মানব-প্রকৃতির অনুকূলেই তার ভিত্তি গড়ে উঠেছে বলে মানুষের নবী হযরত মোহাম্মদ (সা.) বলেছেন: সদ্যজাত শিশু সত্য ধর্মেই জন্ম নেয়- তার পিতামাতা তাঁকে ইহুদি, খ্রিস্টিয়ান বা সেবিয়ান করে তোলে।’

জীবন-দর্শন সম্পর্কে আবদুল মান্নান তালিব বলেছেন: ‘জীবনচর্চাই সংস্কৃতি এ কথা ঠিক। তবে এই জীবনচর্চার পেছনে যে চিন্তা ও জীবন-দর্শন অলক্ষ্যে কলকাঠি নেড়ে চলেছে সেটিই হচ্ছে সংস্কৃতির আসল নিয়ন্ত্রক ও পরিকল্পক।

মানুষের সংস্কৃতি শুধুমাত্র জীবনচর্চা নয়, পরিকল্পিত চিন্তা ও জীবনদর্শনের ভিত্তিতে জীবন চর্চার নাম।’

জীবন-দর্শনের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত যে দ্বিতীয় [সংস্কৃতির মৌলিক] উপাদানটি। সে সম্পর্কেও আবুল আ'লা মওদুদীর সুস্পষ্ট বক্তব্য: ‘জীবন-দর্শনের সাথে দ্বিতীয় যে প্রশ্ন গভীরভাবে সম্পৃক্ত তা হচ্ছে জীবনের চরম লক্ষ্য। দুনিয়ায় মানবজীবনের উদ্দেশ্য কি? মানুষের এতো শ্রম-মেহনত, এতো দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম কিসের জন্যে? কোন অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে মানুষের ছুটে চলা উচিত? কোন পরিণতির কথা মানুষের প্রতিটি কাজে, প্রতিটি প্রয়াস-প্রচেষ্টায় স্মরণ রাখা উচিত? বস্তুত এই লক্ষ্য ও আকাঙ্ক্ষিত প্রশ্নই মানুষের বাস্তব জীবনের গতিধারাকে নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত করে থাকে।

সাইয়েদ মওদুদীর দৃষ্টিতে সংস্কৃতির তৃতীয় উপাদান হচ্ছে মৌলিক বিশ্বাস এবং ধ্যান ধারণা। এ সম্পর্কে তিনি বলেন : ‘তৃতীয় প্রশ্ন এই যে, আলোচ্য সংস্কৃতিতে কোন বুনিয়াদী আকীদা ও ধ্যান-ধারণার ভিত্তিতে মানবীয় চরিত্র গঠন করা হয়?

মানুষের মন-মানসকে তা কোন ছাঁচে ঢালাই করে? মানুষের মন ও মস্তিষ্কে কী ধরনের চিন্তা সৃষ্টি করে? এবং তার ভেতরে এমন কী কার্যকর শক্তি রয়েছে,

যা তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষকে এক বিশেষ ধরনের বাস্তব জীবন ধারার জন্যে উদ্বুদ্ধ করে? এ ব্যাপারে কোনো বিতর্কের অবকাশ নেই যে, মানুষের কর্মশক্তি তার চিন্তাশক্তিরই প্রভাবাধীন। তার মন বাসনা যে ছাঁচে গড়ে উঠবে তার ভেতর আবেগ-অনুভূতি ও ইচ্ছা-স্পৃহাও ঠিক তেমনি পয়দা হবে এবং তারই আজ্ঞাধীনে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো কাজ করতে থাকবে।

বিষয়টিকে বুঝবার জন্যে আমরা ঘোরতর এক বাঙালি সংস্কৃতির ধারক-বাহকের একটি প্রবন্ধ থেকে কিছু অংশ তুলে ধরিছ :

‘আমরা বর্তমানে সংস্কৃতি বলতে সমাজতত্ত্ববিদ ও নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী প্রভাবিত ব্যাপক অর্থেই তাঁকে গ্রহণ করি। কোনো একটি জনগোষ্ঠীর আচার-ব্যবহার থাকা-খাওয়ার রীতিনীতি, ধর্মবিশ্বাস, জীবিকা অর্জনের পদ্ধতি, তার সংস্কার-কুসংস্কারসহ জীবনের হাজারো উপকরণ ও উপাচার, তার ভাষা, সাহিত্য, চিত্রকলা, সংগীত, নৃত্য সব মিলেই তার সংস্কৃতি।’

একটি কুসংস্কারকেও ঐ প্রবন্ধকার সংস্কৃতি বলে স্বাগত জানিয়েছেন শুধুমাত্র তার বুনিয়াদী আকীদা ও ধ্যান-ধারণার বিকৃতির কারণে।

বুনিয়াদী আকীদা এবং ধ্যান-ধারণার দিক থেকে বিকৃত আর এক পণ্ডিত আবিষ্কার করেছেন :

‘মনে হয় মানুষ স্বভাবত পৌত্তলিক : কোনো বিশেষ প্রতিমা বিশেষ তত্ত্ব বিশেষ আচার বা বিশেষ ধরন-ধারণা- এ না হলে যেনো তার চলতে চায় না।’

‘মানুষ স্বভাবত পৌত্তলিক’ এই তত্ত্বটি হয়তো পণ্ডিত প্রবরের মধ্যে নিজে নিজেই লক্ষ্য করেছেন তারপর তিনি তা গোটা মানবজাতির ওপর চালিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং ধ্যান-ধারণাগত বিভ্রান্তি শুধু একটি অপরাধ নয়, রীতিমত অত্যাচারও।

ইসলামী সংস্কৃতির মৌলিক উপাদানের চতুর্থটি হচ্ছে মূলত ঐ সংস্কৃতি মানুষকে একজন মানুষ হিসেবে কি ধরনের মানুষ রূপে গড়ে তোলে অর্থাৎ কি ধরনের নৈতিক ট্রেনিং-এর সাহায্যে সে মানুষকে তার নিজস্ব আদর্শ মোতাবেক সার্থক জীবনযাপনের জন্যে তৈরি করে? কোন ধরনের স্বভাব-প্রকৃতি, গুণরাজি ও মন-মানস সে মানুষের মধ্যে পয়দা করে এবং তার বিকাশ-বৃদ্ধির চেষ্টা করে? তার বিশেষ নৈতিক তালিম-এর মানুষ কি ধরনের মানুষে পরিণত হয়? তার প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত। সত্যিকার অর্থে সংস্কৃতির আসল উদ্দেশ্য যদিও সমাজ ব্যবস্থার পুনর্গঠন কিন্তু ব্যক্তির উপাদান দিয়েই সে সমাজ-সৌধ নির্মিত হয়। আর সে সৌধটির দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব নির্ভর করে তার প্রতিটি ইটের পাকা-পোক্ত হওয়া, প্রতিটি কড়ি কাঠের মজবুত হওয়া, কোথাও ঘুণে ধরা কাঠ না লাগানো এবং কোথাও অপক্ক, নিকষ্ট ও দুর্বল উপকরণ ব্যবহার না করার ওপর।’

ব্যক্তি প্রশিক্ষণের এই সাংস্কৃতিক উপাদানটি ইসলামের গৌরবময় দিনগুলোতে পরিপূর্ণভাবেই বিকশিত হয়েছিলো যার সম্পর্কে মার্মেডিউক পিকথল একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন :

ইসলামে কোনো অজ্ঞ মুসলমানের অস্তিত্বের কথা পবিত্র কোরআনে কখনো ধারণা করাও হয়নি এবং মহানবী হযরত মুহম্মদ (সা.)ও তা কখনো কল্পনা করতে পারেননি। প্রকৃতপক্ষে ‘অজ্ঞ মুসলমান’ কথাটি মুসলমান পদবাচক সংজ্ঞার পরিপন্থী বা বিপরীতার্থক। ইসলামের গৌরবময় দিনে একজন ‘দরিদ্র মুসলমানের’ মতো একজন অজ্ঞ মুসলমানকেও খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত দুষ্কর হতো।

সংস্কৃতির মৌলিক উপাদানের পঞ্চমটি হচ্ছে, ‘সে সংস্কৃতিতে বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে মানুষে মানুষে কিভাবে সম্পর্ক স্থাপন করা হয়? তার আপন খান্দানের সঙ্গে, তার অধীনস্থ লোকদের সঙ্গে, তার উপরস্থ লোকদের, তার নিজ সংস্কৃতির অনুসারীদের সঙ্গে এবং তার সংস্কৃতি বহির্ভূত লোকদের সঙ্গে কি ধরনের সম্পর্ক রাখা হয়েছে? অন্যান্য লোকদের ওপর তার কি অধিকার এবং তার ওপর অন্যান্য লোকদের কি অধিকার নির্দেশ করে দেয়া হয়েছে? তাঁকে আজাদী দেয়া হলে কতো আজাদী দেয়া হয়েছে আর বন্দী করা হলে কতোদূর বন্দী করা হয়েছে? বস্তুত এ প্রশ্নগুলোর ভেতর নৈতিক চরিত্র, সামাজিকতা, আইন-কানুন, রাজনীতি এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সকল বিষয়ই এসে যায়। আর আলোচ্য সংস্কৃতি কি ধরনের খান্দান, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করে তা এ থেকেই জানা যেতে পারে।

দুনিয়ার প্রত্যেক সংস্কৃতি ঐ পাঁচটি মৌলিক উপাদান দিয়েই গঠিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, ইসলামী সংস্কৃতিরও সৃষ্টি হয়েছে এই উপাদানগুলোর সাহায্যেই।

‘ইসলামী [জীবনবোধ] সভ্যতা’ কবিতায় আল্লামা ইকবাল সাংস্কৃতিক উপাদানের একটি যুক্তিগ্রাহ্য এবং কাব্যকুশল বর্ণনা দিয়েছেন:

عِنا م اسح يس اوح القدس كاذوق جمال عجمكا حن طبيعت عرب كا سوزندرو

উপাদান তার জিব্রীলের সৌন্দর্যবোধ আজমের গুহ্র মনন আর আরবের হৃদয় উত্তাপ।

ইসলামী সংস্কৃতির ভিত্তি প্রস্তর

‘ইসলামী সংস্কৃতির ভিত্তিপ্রস্তর হচ্ছে পার্থিব জীবন সম্পর্কে একটি বিশেষ ধারণা। তা হলো এই যে এই দুনিয়ায় মানুষের মর্যাদা সাধারণ সৃষ্ট বস্তুর মতো নয় বরং তাঁকে এখানে বিশ্বপ্রভুর তরফ থেকে প্রতিনিধি বানিয়ে পাঠানো হয়েছে। এ ধারণার প্রেক্ষিতে একটি যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত হিসেবে আপন শ্রুষ্ঠা ও মনিবের সম্ভ্রুতি

অর্জন করা মানব-জীবনে স্বাভাবিক লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়, আর এ লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে:

প্রথমত খোদা সম্পর্কে নির্ভুল জ্ঞান লাভ করা। দ্বিতীয়ত শুধু খোদাকেই আদেশ ও নিষেধকারী, আইন ও বিধানদাতা, বন্দেগী ও আনুগত্য লাভের যোগ্য মনে করা এবং নিজের যাবতীয় ক্ষমতা ইখতিয়ারকে সম্পূর্ণ খোদায়ী বিধানের অধীন করে দেয়া। তৃতীয়ত খোদার সন্তুষ্টি অর্জন করার বিশেষ প্রণালী-পদ্ধতিগুলো জানা।

চতুর্থত খোদার সন্তুষ্টি বিধানের সফল অসন্তুষ্টি বিধানের কুফল অবহিত হওয়া, যাতে করে পার্থিব জীবনের সম্পূর্ণ ফলাফল থেকে কেউ প্রতারিত না হয়।

ব্যাখ্যা- ক

খোদা সম্পর্কে নির্ভুল জ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন এই জন্যে, যেনো মানুষ বিশ্ব-প্রকৃতির ক্রিয়াশীল শক্তিগুলোর কোনোটিকে প্রভু বলে মনে করে না বসে এবং প্রভুত্বের ব্যাপারে খোদা ছাড়া অন্য কাউকে শরীক ঘোষণা না করে।

ব্যাখ্যা- খ

নিজের যাবতীয় ক্ষমতা-ইখতিয়ারকে সম্পূর্ণ খোদায়ী বিধানের অধীন করে দেয়ার তাৎপর্য হচ্ছে, জীবনের সজ্ঞান ও সচেতন দিকেও মানুষ যেনো শুধু খোদারই কর্তৃত্ব স্বীকার করে। প্রতিটি ব্যাপারে খোদাকেই আইন-প্রণেতা এবং নিজেকে সেই আইনের অনুবর্তী জ্ঞান করে। নিজের ক্ষমতা-ইখতিয়ারকে খোদার নির্ধারিত সীমারেখার অধীন করে দেয়। এর ফলে মর্দে-মুমিনের ভেতর এক বিশেষ ধরনের বিবেকের সৃষ্টি হবে এবং এক বিশেষ ধরনের চরিত্র গড়ে ওঠে- যা খোদায়ী আইন-বিধানে বাধ্যতামূলক নয় বরং স্বেচ্ছামূলক অনুসৃতির জন্যে একান্ত প্রয়োজন।

ব্যাখ্যা- গ

খোদার সন্তুষ্টি অর্জন করার বিশেষ প্রণালী ও পদ্ধতিগুলো জানা এই জন্যে প্রয়োজন অর্থাৎ নবুওয়াত এবং আল কিতাবের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় পোষণ করা দরকার এই জন্যে যেনো মানুষ তার জন্যে খোদার নির্ধারিত আইন-কানুন এবং বিধি-বিধান সম্পর্কে বিস্তৃত জ্ঞান লাভ করে। মানুষের ক্ষমতা-ইখতিয়ারকে আল্লাহ যে সব সীমারেখার অধীন করে দিয়েছেন এ দুটির মাধ্যমেই মানুষ সেগুলো চিনে নিতে পারে।

খোদার সন্তুষ্টি বিধানের সুফল এবং অসন্তুষ্টি বিধানের কুফল অবহিত হওয়া, যাতে করে পার্থিব জীবনের অসম্পূর্ণ ফলাফল থেকে কেউ প্রভাবিত না হয় অর্থাৎ মানুষ যেনো পরকাল সম্পর্কে এতোটা জ্ঞান অর্জন করে এবং তার দৃষ্টি এতোটা প্রখর হয় যেনো দুনিয়াবী জীবনের এ বাহ্যদৃশ্যের পেছনে সে এক স্বতন্ত্র জগতের অস্তিত্ব দেখতে পায়। যেনো সে স্পষ্টত মনে করে— এ দুনিয়ার মজলামজল ও উপকার-অপকার খোদার সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির কোনো মাপকাঠি নয়। খোদার তরফ থেকে কর্মের সুফল ও কুফল এ দুনিয়ায় শেষ হয়ে যায় না বরং তার চূড়ান্ত ফায়সালা ও ফলাফল ঘোষিত হবে স্বতন্ত্র এক জগতে এবং সেই ফায়সালাই হবে সম্পূর্ণ নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য। সেই ফায়সালার সাফল্য ও কামিয়াবী লাভ করতে হলে এ দুনিয়ায় খোদায়ী আইন-বিধানের নির্ভুল অনুসরণ এবং তার নির্ধারিত সীমারেখার পূর্ণ সংরক্ষণই হচ্ছে একমাত্র উপায়। এ জ্ঞান ও বিশ্বাসের প্রতি সুদৃঢ় প্রত্যয়কেই বলা হয় ঈমান-বিল-আখেরাত বা পরকাল বিশ্বাস। বস্তুত ঈমান বিপ্লাহর পর মানুষকে ইসলামী আইন-কানূনের অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করার ব্যাপারে এটিই হচ্ছে সবচাইতে কার্যকরী শক্তি। আর ইসলামী সংস্কৃতির জন্যে মানুষকে মানসিক দিক থেকে যোগ্য ও সমর্থ করে তোলার ব্যাপারেও এ প্রত্যয়টির রয়েছে বিরাট ভূমিকা।

বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে ইসলামী সংস্কৃতির জন্যে যে মৌল প্রত্যয়ের প্রয়োজন, সে ব্যাপারে ঐ পাঁচটি বিষয়ের কোনো বিকল্প নেই। কেননা অন্য কোনো প্রত্যয়ের ভেতরে ইসলামী সংস্কৃতির ভিত্তি হবার মতো কোনো ধরনেরই উপযুক্ততা নেই। আর অন্য কোনো দর্শনই জীবন সম্পর্কে এ বিশেষ ধারণা ও লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়।

ঐ মৌল প্রত্যয়ের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সভ্যতা-সংস্কৃতির জয়গান গেয়েছেন এক যথার্থ বিশ্বকবি মহাকবি ইকবাল:

حقائق دبری یر اساس به ربکی یر زرکی بی نس به ظلم افلاطون

ভিত্ত তার চিরন্তন সত্যের ওপর জীবন সত্য এটি, প্রোটোর তেলসমাতি নয়।

মূলত ইসলামী সংস্কৃতির জন্যে উৎসর্গিকৃত প্রাণ জনশক্তি গড়ে উঠতে পারে কেবলমাত্র ঐ প্রত্যয়ের আলোকেই। চিরকালের ঐ ভিত্তিকে উপেক্ষা করার ভেতর দিয়ে আর যাই হোক ইসলামী সংস্কৃতির গণভিত্তি তৈরি হবে না কোনো কালেই।

ইসলামী সংস্কৃতির উৎস

উৎস হচ্ছে—প্রশ্রবণ, ঝরনা, ফোয়ারা। ঝরনার উৎস কোনো এক পর্বত। ঝরনাই নদী হয়ে বয়ে যায়। বয়ে বয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তরঙ্গ-বিস্কুদ্ধ সাগরে। পথ যেতে যেতে সে দান করে যায় উর্বরতার অপার আনন্দ, সৃষ্টি সুখের উল্লাস। কিন্তু যে মধুমতির নাম সংস্কৃতি তার উৎস কোথায়? 'সাহিত্য সংস্কৃতি ভাষা: ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট' গ্রন্থে বলা হয়েছে:

সাহিত্য হোক বা সংস্কৃতি [হোক] প্রচলিত সমাজই তার উৎস। সমাজ যে রূপে প্রতিষ্ঠিত আছে সাহিত্য-সংস্কৃতিও সেই রূপেই প্রতিভাত হবে। সমাজ যে ভাবধারায় অনুপ্রাণিত এবং যে আদর্শে উজ্জীবিত সাহিত্য ও সংস্কৃতি সেই আদর্শ ও ভাবধারার প্রতিচ্ছায়া মাত্র। তাই সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে কোনো নতুন ভাবধারায় উজ্জীবিত করতে হলে সমাজ ব্যবস্থায় সেই অনুসারে পরিবর্তন আনতে হবে।

ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ মুসলিম-সাহিত্যের উৎস সন্ধান করতে গিয়ে যে-কথা বলেছেন, তাতে মুসলিম সংস্কৃতির উৎসেরও ইশারা আছে। যেমন: হিন্দুরা সাহিত্য অনুপ্রেরণা পাচ্ছে বেদান্ত ও গীতা, হিন্দু ইতিহাস ও হিন্দু জীবনী থেকে, আমাদের সাহিত্য অনুপ্রেরণা পাবো কোরান ও হাদীস, মুসলিম ইতিহাস ও মুসলিম জীবনী থেকে।

ড. আবদুল বাসেত বদর মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তিনি তার 'ফসুল মিন নাযরিয়াহ আল আদাব আল ইসলামী' গ্রন্থে দু'টো প্রধান উৎসের সন্ধান দিয়েছেন। সন্ধান দিয়েছেন ইসলামী সাহিত্যের উৎস হিসেবে যদিও। তবু তা ইসলামী সংস্কৃতির উৎস হিসেবেও মান্য করা যায় :

প্রথম উৎস: বিশ্বাসীর হৃদয় অর্থাৎ যে বিশ্বাসীর হৃদয় বিশ্বাসের আলোয় উজ্জাসিত, প্রথমেই তার থেকে ইসলামী সাহিত্য আশা করা যায়।

দ্বিতীয় উৎস: Innate character বা মানুষের স্বভাব। আল্লাহ প্রত্যেক মানুষকে এই ফিতরতের ওপরই সৃষ্টি করেছেন— যা খুব বিরল এবং দুর্লভ। কোরানের ভাষায়: তাঁকে [অর্থাৎ মানুষকে] উভয় [অর্থাৎ ভালো-মন্দ] পথ দেখিয়ে দেয়া হয়েছে। তবু মানুষ আবলিতায় যতোই হাবুডুবু খাক না কেনো, কখনো কখনো তার প্রকৃতিপ্রদত্ত বিবেক তাঁকে জাগিয়ে তোলে। যেমন কবি আবু নুওয়াসের জীবন। তিনি নগ্নতা-বেহায়াপনায় ছিলেন প্রসিদ্ধ। পাপাচার ছিলো তার প্রতিদিনের কাজ। কিন্তু কখনো কখনো তিনি বিবেকের স্পর্শে চৈতন্য ফিরে পেয়েছেন, শিশুর মতো কেঁদেছেন, লিখেছেন, চেতনা জাগানিয়া কোনো পবিত্র লেখা। এই লেখা তো আমরা

খারিজ করতে পারি না। সুতরাং কোনো এক মানুষ সে যেই হোক না কেনো, কখনো কখনো তার জীবনাচারের মধ্যে যদি ইসলামী সংস্কৃতির কোনো রূপ ফুটে ওঠে, তাহলে তার সৌন্দর্যকে উপেক্ষা করার অধিকার কারো নেই।

ইসলামী সংস্কৃতির উৎস এবং সর্বজনীনতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিবেচনা করেছেন সুদানের খার্তুম বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সময়ের শিক্ষক প্রফেসর ইয়ুদ্দিন আল আমীন। তাঁর বিবেচনাটি হচ্ছে :

আমাদের ঐতিহ্য, সভ্যতা-সংস্কৃতি, আচার-অনুষ্ঠান, ধর্মীয় বিশ্বাস প্রভৃতির মূল শেকড় আমাদের ইসলামী সমাজে প্রাথমিক। সাহিত্যেও সে সব দিকগুলো আনার সময় ইসলামের দর্শন ও শিক্ষাকে সামনে রেখে আনতে হবে। বরং উচিত হবে ইসলামের উদ্ভাস যেনো সাহিত্যের ঝাঁজে ঝাঁজে মূর্ত থাকে।

অন্যের মূল্যবোধ, রীতি-নীতি যদি আমরা পর্যালোচনা করি, তবে দেখতে পারো, সেখানে কিছু কিছু দিক আছে যা ইসলাম প্রদত্ত না হলেও ইসলাম তাকে বাতিল করে না। ক্লাসিক সাহিত্যের এসব দিকগুলো আমাদের গ্রহণ করতে কোনো দ্বিমত থাকতে পারে না। এসব দিক আমাদের অযথা এড়িয়ে যাওয়াও ঠিক নয়। কারণ আমাদের দৃষ্টিতে সঠিক এমন কাজ যদি অন্য কেউ এনে দেয়, পৃথিবীতে আমাদের আগমন এ জন্যে হয়নি যে, সেগুলোরও আমাদের বিরোধিতা করতে হবে।

ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য

জীবনকে মহৎ করে গড়ে তোলাই সংস্কৃতির লক্ষ্য। এই যে বক্তব্য, এই বক্তব্যের মধ্যে একজন প্রত্যয়বাদীর জন্যে কোনো ফাঁক নেই; কিন্তু একজন সংশয়বাদীর জন্যে বিভ্রান্তি ছড়ানোর সুযোগ একটা থেকেই যায়। সে সুযোগ জীবনের চূড়ান্ত ব্যাখ্যা নিয়ে। কেননা একজন সংশয়বাদী অথও বিশ্বাসী নয়, অন্যদিকে একজন প্রত্যয়বাদী একটি খণ্ডিত জীবনকে মেনে নিতে পারে না।

মূলত ইসলামী সংস্কৃতি তার লক্ষ্য সম্পর্কে কখনোই কিন্তু গোজামিলের আশ্রয় নেয়নি; সুস্পষ্ট বক্তব্য রেখেছে। একজন প্রাজ্ঞ-পণ্ডিতের ভাষায়:

‘আনন্দেই জন্ম, আনন্দেই জীবন, আনন্দেই মৃত্যু— এই আনন্দই মুসলিম জীবনের পাথরে সে আনন্দে আছে সঞ্চারিত। আল্লাহর সন্তুষ্টির সঙ্গেই আপন সন্তুষ্টি মিলিয়ে এক চরম আনন্দে পরিপূর্ণ হলে সে মহানন্দে ধৈর্যে চলায় কোনো বিরোধ নেই— নেই কোনো দ্বন্দ্ব। না পাওয়ার অতৃপ্তির মাঝখানেও সন্তুষ্টি আর আনন্দ মিলে

এক মহাতৃপ্তির আত্মদান করে মুসলিম তাই। তার কাজে ইহজগৎ যতো সত্য পরজগৎ তেমনি সত্য বরং তার চাইতেও সত্য। ইহজগতের বস্তু অবয়ব কেবলই পরিবর্তিত হচ্ছে। কিন্তু সেখানে পরিবর্তন নাই, ধ্বংস নাই। সমগ্র বিশ্বের প্রকৃতির ও জাগতিক শৃঙ্খলা মেনে নিয়ে বিশ্বনিয়ন্ত্রার সংবিধানের ধারা অনুযায়ী চলার পথকে আনন্দময়, সুখের করে তোলা, সামগ্রিক মানব জীবনকে সুন্দরতর, মহত্তর মহিমাময় করে তোলাই ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য; কেবলমাত্র শিল্প-কলা, সাহিত্য, বিজ্ঞান মানবজীবনের ও এ বাড়তি উপকরণগুলোর সৌন্দর্যবর্ধন, পরিমার্জন ও পরিশীলনই তার একমাত্র লক্ষ্য হতে পারে না। কাজেই ‘Love for Art’ শিল্পানুরাগ যখন এমন পর্যায়ে পৌঁছে, যার সামনে জীবনের প্রধান লক্ষ্য গৌণ হয়ে পড়ে, তখন তা ইসলামবিরোধী।

ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য প্রসঙ্গে মর্মেডিউক পিকথল খোলাসা যে বয়ান দিয়েছেন তা যথার্থ গুরুত্বের দাবি রাখে:

অন্যান্য সংস্কৃতি হতে ইসলামী সংস্কৃতির সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। কেননা ইসলামী সংস্কৃতি কখনো কেবলমাত্র কোনো সংস্কৃতিবান ব্যক্তি-বিশেষ মানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পরিপূরক হতে পারে না। আরো পরিষ্কার ভাষায় বলতে গেলে, ইসলামী সংস্কৃতি শিক্ষা ও সংস্কৃতির অগ্রসর ব্যক্তি-বিশেষ মাত্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পরিপূরণের বাহন হতে পারে না এবং এখানেই বিভিন্ন সংস্কৃতির সঙ্গে তার পার্থক্য। এটা সুস্পষ্ট ও সর্বজনবিদিত সত্য যে, ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য সীমিত পর্যায়ে কোন ব্যক্তিবিশেষ কিংবা ব্যক্তি-সমষ্টির বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধন নয়- বস্তুত, সামগ্রিকভাবে গোটা মানবজাতির অগ্রগতি ও উৎকর্ষ সাধন। যতো বিরাট কীর্তিময় হোক না কেনো, কোনো যুদ্ধ কিংবা সন্ধি-চুক্তির সাফল্যকে ইসলামের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত সাফল্যের ফলশ্রুতি বলে অভিহিত করা যেতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, সর্বজনীন মানবিক ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠাই ইসলামের চূড়ান্ত লক্ষ্য- ইসলামের বিরামহীন অভিযাত্রা এই আদর্শের লক্ষ্যভূমির পথে অগ্রসরমান।

সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী (রহ.) সম্ভবত আলাদাভাবে ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখেননি। কিন্তু ইসলামী সংস্কৃতির কাঠামো নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে ঐ লক্ষ্য সম্বন্ধে খুব সংক্ষিপ্ত অথচ গুরুত্বপূর্ণ মতামত ব্যক্ত করেছেন:

‘এ সংস্কৃতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে চূড়ান্ত সাফল্যের [অর্থাৎ পরকালীন বিচারে বিশ্বপ্রভুর সম্মুখি লাভে ধন্য হওয়ার] জন্যে প্রস্তুত করা আর তার দৃষ্টিতে এ সাফল্য অর্জনটা বর্তমান জীবনে মানুষের নির্ভুল আচরণের ওপর নির্ভরশীল। পরন্তু চূড়ান্ত ফলাফলের দৃষ্টিতে কোন সব কাজ উপকারী, আর কোন সব কাজ অপকারী, তা জানা মানুষের সাধ্য নয়, বরং আখেরাতে ফয়সালাকারী খোদাই

তা উত্তমরূপে অবহিত। এ কারণেই এ সংস্কৃতি জীবনের সকল বিষয়াদিতে খোদার নির্দেশিত পন্থা অনুসরণ করার এবং নিজের কর্ম-স্বাধীনতাকে খোদায়ী শরীয়ত দ্বারা সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত করার জন্যে মানুষের কাছে দাবি জানায়।'

ইসলামী সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য

'মুসলিম তমদ্দুনের কর্মকথা' প্রবন্ধে ড. মুহম্মদ ইকবাল নবী (সা.) এর সৃষ্টিধর্মী প্রত্যাভর্তন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তমদ্দুনের বিকাশধারার প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেছেন। বলেছেন: 'নবীর প্রত্যাভর্তন কিন্তু সৃষ্টিধর্মী'। তিনি প্রত্যাভর্তন করেন কালের প্রগতির সাথে যোগদান করতে, ইতিহাসের ঘটনাবর্ত নিয়ন্ত্রণ করে নব আদর্শের পৃথিবী সৃষ্টি করতে, সুফীর কাছে অখণ্ড অভিজ্ঞতার প্রশান্তিই শেষ কথা, নবীর পক্ষে এ হচ্ছে যুগান্তর আনয়নকারী মানসিক শক্তির উদ্বোধন। এই শক্তি দিয়ে তিনি মানব-জগতের রূপান্তর সাধন করেন। নবীর পরম আকাঙ্ক্ষা তার ধর্মীয় অভিজ্ঞতাকে একটি জীবন্ত জাগতিক শক্তিরূপে প্রত্যক্ষ করা। এই রূপে তার প্রত্যাভর্তন তার ধর্মীয় অভিজ্ঞতার মূল্য নিরূপণের একটা প্রয়োগিক [Programatic] মানদণ্ড। সৃষ্টিধর্মী কর্মের মধ্যে নবী নিজের সংকল্পকে এবং যে সকল মূর্ত ঘটনার মধ্য দিয়ে তিনি একে রূপ দেবেন সেগুলিকে যাচাই করে দেখেন। সামনের দুর্লভ্য বাধা জয় করার মধ্য দিয়ে নবী নিজেকে আবিষ্কার করেন এবং ইতিহাসের সম্মুখে প্রকাশিত করেন। অতএব তার ধর্মীয় অভিজ্ঞতার মূল্য নিরূপণের আরেকটা মানদণ্ড হবে কি ধরনের মানুষ তিনি গড়ে তুলতে পেরেছেন এবং কী ধরনের তমদ্দুন বিকাশ লাভ করেছে তার ওপর।

শুদ্ধতম সংস্কৃতির বিকাশে প্রেরিত বিশেষ মানুষের ভূমিকার দিকে দৃষ্টিপাত করলে অন্তত এ-কথা বুঝতে কষ্ট হয় না যে, ইসলামী সংস্কৃতি এমনই একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সংস্কৃতি যার অখণ্ড দেহাবয়বে লেগে আছে সুদীর্ঘ ইতিহাসজাত স্পর্শের বৈভব।

ইসলামী সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যের একটি অন্যতম তরজমা দিয়েছেন এক প্রাজ্ঞ-দার্শনিক অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ। তিনি ইসলামী সংস্কৃতির চূড়ান্ত বিকাশধারাকে যুক্ত করতে চেয়েছেন 'আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হও' এই দর্শনের সঙ্গে এবং বলেছেন:

ইসলামের সত্যিকার নৈতিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রিক আদর্শের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। ইসলামের নৈতিক আদর্শ: সৃষ্টির জীবনের সবগুলো বৃত্তির সম্যক বিকাশ এবং তাদের মধ্যে সামঞ্জস্যের সৃষ্টি। এতে ব্যক্তিগত জীবনে শৃঙ্খলার

সৃষ্টি হয় এবং ব্যক্তি উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ পায়। সে উন্নতির আদর্শ আল্লাহর গুণাবলী জীবনে বিকশিত করে তোলা। আল্লাহর রসূল (সা.) আদেশ করেছেন অর্থাৎ ‘তাখান্নাকু বিআখাফিন্নাহ’ অর্থাৎ ‘আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হও’। ড. আবদুল বাসেত বদর ইসলামী সাহিত্যের বেশ কিছু বৈশিষ্ট্যের যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন সে সিদ্ধান্ত ইসলামী সংস্কৃতিরও এবং সেগুলো যথাযথ বলে আমরা মনে করি।

ড. বাসেত বদর বলেছেন:

ইসলামী সাহিত্যের বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য বর্তমান। যার অন্যতম দিকগুলো হলো :
প্রথমত: বিশ্বাসগত বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বল অর্থাৎ যে সাহিত্য-কর্মের ভেতর ইসলামের এবং ঈমানের সৌন্দর্য বিকশিত হয় তাই ইসলামী সাহিত্য।

দ্বিতীয়ত: শিল্পগত বৈশিষ্ট্য। জীবন, জগৎ এবং মানুষ থেকে লব্ধ অভিজ্ঞান এবং অনুভূতিকে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে সুসম্মতভাবে এবং শিল্পসমৃদ্ধভাবে প্রকাশ করার নামই ইসলামী সাহিত্য। শিল্পগত না হলে তার নাম অন্য কিছু হবে। ইসলামী সাহিত্য হবে না।

তৃতীয়ত: পরিব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য। ইসলামী সাহিত্য কোনো নির্দিষ্ট সময় বা স্থান দ্বারা পরিবেষ্টিত নয়। তার চর্চা শুধু আরবি হতে হবে তা নয়।

মূলত জীবনচর্চার ক্ষেত্রে ইসলামী সংস্কৃতি চায় পরিশীলিত জীবন-চর্চা। এই পরিশীলিত জীবন চর্চায় যখন বিশ্বাসের আলো ফুটে উঠবে, শিল্পসঙ্গত সৌন্দর্য ফুটে উঠবে, ফুটে উঠবে বিশ্বজনীনতা বুঝতে হবে সে জীবনচর্চায় ইসলামী সংস্কৃতিই বিকশিত হয়েছে।

মার্মেডিউক পিকথল বলেছেন :

ধর্ম হিসেবে ইসলাম নিজস্ব পরিসরে ও নিজের শ্রেণিগত অগ্রগতির পর অন্য যেকোনো ধর্মের চেয়ে অধিকতর ও ব্যাপক পর্যায়ে মানবীয় প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করে থাকে। শক্তি হিসেবে বিশ্বে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের পর ইসলাম যে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের জন্ম দিয়েছে, অন্য কোনো ধর্ম, সভ্যতা ও দর্শনের সম্মিলিত সাফল্যের সঙ্গে তার তুলনা হয় না। মানে: ইসলামে সাংস্কৃতিক অবদানকে বিশ্বের সমস্ত ধর্ম, কৃষ্টি ও সভ্যতার সামগ্রিক অবদানের সঙ্গে এক পাল্লায় ওজন করা যেতে পারে। ইসলামী সংস্কৃতি এক বিশেষ সংস্কৃতি, যার মধ্যে বিশ্বের সকল সংস্কৃতিই খুঁজে পাবে তার আধার অথচ তা নিজ বৈশিষ্ট্যে একক। ইসলামী সংস্কৃতির একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য তার ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের সুদীর্ঘ প্রেক্ষাপটে দেদীপ্যমান। সেই ইতিহাসের দিকে যতোই দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ

করা যাবে, সেই ঐতিহ্যের দিকে যতোই ফিরে তাকানো যাবে, ততোই ইসলামী সংস্কৃতির একটি চিরকালের বৈশিষ্ট্য স্পষ্টতর হবে।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী (রহ.) বলেন, একথা যদিও— সত্য যে, মানুষের বর্তমান কাল। চিরদিনই অতীত কাল দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে এবং সেহেতু প্রত্যেক নব রূপায়নেই পরবর্তী গঠন উপাদান থেকে সাহায্য গ্রহণ করা হয়, তথাপি একথা অনস্বীকার্য যে, ইসলামী সংস্কৃতি আপন প্রাণসত্তা ও মৌলিক উপাদানের দিক থেকে সম্পূর্ণরূপেই ইসলামী এবং এর ওপর কোনো অনৈসলামী সংস্কৃতির অনুমান ও প্রভাব নেই। অবশ্য এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সংস্কৃতিগুলোর কিছু না কিছু প্রভাব অবশ্যই পড়েছে। আসল ও মূল জিনিসের দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে, ইসলামী সংস্কৃতি সম্পূর্ণ ইসলামেরই গঠন-প্রক্রিয়ার ফল। ইসলাম অন্যান্য সংস্কৃতি থেকে খুব কম জিনিসই গ্রহণ করেছে। এমন কি বলা যেতে পারে যে, এরও বেশির ভাগই ইসলামেরই নিজস্ব জিনিস।

ইসলামী বুদ্ধিবৃত্তিক সংস্কৃতি

একবার এক রাষ্ট্র-প্রধান উচ্চারণ করেছিলেন :

Feel free in your mind, act freely in your expression and react freely to the environments around you. Let not the edge of your sensitivity be blunted by any sense of fear or expediency. On my behalf I cannot do better than assure you in the spirit of voltair, that I may differ even protest, against what you say but I will defend your right to say it unless it. is directed against they very existence of our homeland.

(অর্থাৎ স্বাধীনভাবে চিন্তা করুন, স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করুন এবং স্বাধীনভাবে কাজ করুন। ভয় কিংবা শক্তি প্রয়োগ কোনোভাবেই আপনার অনুভূতিকে অন্ধ-উদ্বেজনার শিকার হতে দেবেন না। আমি তো ভলটেয়ারকে আপনার চাইতে ভালোভাবে বুঝতে পারি না— যাতে মতোদ্বৈততা এমনকি বিরোধিতা করতে পারি। আমি বরং পারি আপনার বলার অধিকারকে প্রতিহত করতে — যেটা দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের মাতৃভূমির অস্তিত্ব নড়বড়ে করে দিতে সক্ষম।)

অন্তত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ঐ বক্তব্যের মধ্যে রয়েছে।

একটি হচ্ছে: মত প্রকাশের স্বাধীনতার ব্যাপারে। একটি হচ্ছে : বিরোধিতা করার ব্যাপারে। অন্যটি হচ্ছে: মাতৃভূমির অস্তিত্ব রক্ষার ব্যাপারে।

উল্লেখিত তিনটি বিষয়কে সামনে রাখলে এবং ইসলামী সংস্কৃতির বুদ্ধিবৃত্তিক কোনো ব্যাপারে প্রশ্ন দেখা দিলে আল কোরানের ছোট্ট একটি বাক্যই তার উত্তরের জন্য যথেষ্ট:

ধীনের ব্যাপারে বল প্রয়োগের কোনো সুযোগই নেই।

ইসলামী বুদ্ধিবৃত্তিক সংস্কৃতির আন্তর্জাতিকতার মানদণ্ড তৈরি হয়েছে কোরানের ঐ চিরন্তন বর্ণনার আলোকেই। ঐ আন্তর্জাতিকতা অন্য কোনো সংস্কৃতিতে নেই; থাকতে পারে না। চিন্তাবিদ আবুল হাশিম বলেন :

‘চিন্তা-বিবেক-মতবাদ প্রকাশের স্বাধীনতা এবং পরমত সহিষ্ণুতা ইসলামী বুদ্ধিবৃত্তিক সংস্কৃতির অন্যতম আদর্শ। এই কারণেই খিলাফত যুগে হেমলক বিষপানে, অগ্নি-কুণ্ডে অথবা ফাঁসির মধ্যে প্রাণ হারাতে হয়নি।’

ইসলামী সংস্কৃতি কপটতাকে অনুমোদন করে না এবং কপটতা উৎপাদনের কোনো প্রক্রিয়াকেই সে উদ্বোধন করে না। যেমন করে না ইসলামী সাহিত্যের ক্ষেত্রেও [ইসলামী সাহিত্য ইসলামী সংস্কৃতিরই একটি অংশ]। ড. আবদুল বাসেত বদর বলেছেন:

লেখক মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মতো স্বাধীন। তাঁকে কোনো ব্যাপারে বাধ্য করা সম্ভব নয়। আমরা ইসলামী সাহিত্যসেবীকে কোনো কিছু চাপিয়ে দিতে চাইনে। মূলত আমাদের বক্তব্য হলো, যদি আমরা কোনো লেখককে জোর করে কিছু চাপিয়েই দিই, তাহলে আমাদের মধ্য থেকে কপট সাহিত্যিকের উদ্ভব হবে। আমরা ঈমানের প্রভাবমণ্ডিত হৃদয় সুন্দর হতে যার সাহিত্য উৎসারিত হয় সেই স্বেচ্ছাসেবক চাই। আপনিই বলুন, আপনাকে কি কেউ রোজা রাখতে বাধ্য করতে পারে? কিংবা আপনার অনিচ্ছায় দান-সদকা করতে বল প্রয়োগ করতে পারে? আমরা কি আপনাকে স্বেচ্ছাচারীর মতো আদর্শ করতে পারবো- আপনাকে সদকা করতেই হবে। না বরং স্বেচ্ছাশ্রমাদিত হয়ে আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে তা করবেন। মুসলিম সাহিত্যিক তেমনি।

আসলে তিনি তার মুক্ত পাখায় ভর করে উড়ে চলবেন ঐহিক-পারিত্রিক হাজারো রাজ্যে। নাস্তিকতার জন্যে সে সব রাজ্য বিচরণের দ্বার রুদ্ধ। আমাদের সাহিত্যিকরা উড়ে চলেন আকাশ ও ধরণীর খাঁজে খাঁজে। নানান রাজ্যের চিত্র ফুটে ওঠে তার সাহিত্যে। অন্যদের চোখে সে-সব সুদূর-দিগন্তের ছবি তমসাবৃত। সুতরাং তাদের চেয়ে প্রশস্ত পৃথিবীতে আমাদের অধিবাস এবং সবইতো আমাদের; তারপরও চাপিয়ে দিতে হবে?

ইসলামী বুদ্ধিবৃত্তিক সংস্কৃতি এক সার্বত্রিক চরাচর এবং নিকট নীলিমারই সন্ধান দিয়েছে। তবু সে তার বুদ্ধিবৃত্তিকে লাগামহীন করে দেয়নি। বিষয়টি অর্থাৎ

স্বাধীনতার 'স্ব' এবং 'অধীনতার' মতো ঔদার্যকে বুঝবার জন্যে লিও টলস্টয়ের একটি শিল্পভাবনার সহযোগিতা নেয়া যায়। টলস্টয় বলেছেন:

সব শিল্পকে নিষেধ করা অসম্ভবকে সম্ভব করার মতো উদ্ভট পরিকল্পনা। শিল্পের উপস্থিতিতে মানব-জীবন দুর্বিষহ। তবে ইউরোপের মতো যে-কোনো আর্টকে মেনে নেয়া যায় না। আরো খানিক এগিয়ে গিয়ে একজন প্রতীচ্য সংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ বলেছেন:

প্রতীচ্য শিল্প ও সংস্কৃতিচর্চাকে- যাকে সংস্কৃতির একটি প্রাসঙ্গিক অথবা একটি গৌণ দিক বলা যেতে পারে- প্রায় উপাসনার মতো যে অপরিণীম গুরুত্ব দেয়া হয়েছে থাকে, একজন মুসলমান তাতে অবাক না হয়ে পারে না।

ইসলামী সংস্কৃতির রূপ

রূপ অর্থ: আকৃতি, চেহারা, সৌন্দর্য, নেত্রগ্রাহ্য বিষয়, প্রকার, রকম, স্বরূপ ইত্যাদি। আবার স্বরূপ অর্থ: স্বভাব, প্রকৃতি, নিজের রূপ, প্রকৃত অবস্থা ইত্যাদি। আমরা এখানে ইসলামী সংস্কৃতির স্বরূপ নিয়েই আলোচনা করতে চাই।

ইসলামী সংস্কৃতি জীবনের সার্বত্রিক সাফল্যই কামনা করে। সুতরাং সে কামনা করে সাহিত্যিক-শৈল্পিক-বৈজ্ঞানিক সাফল্যও। তার চোখে এগুলো হচ্ছে সহায়ক উপকরণ অথবা পথযাত্রীর শান্তি অপনোদনের মতো। পূজা কিংবা প্রতীক-আশ্রয়িতার পর্যায়ভুক্ত করে না আদৌ।

প্রতীচ্যের এক সংস্কৃতি-বিশেষজ্ঞ বলেন: ইসলামী সংস্কৃতি বলতে- তা যে কোনো সূত্র হতেই উদ্গত হোক না কেনো- আমি ইসলাম ধর্মের অনুসারীদের লব্ধ সংস্কৃতি বোঝাতে চাইনি। আর যে কোনো উৎস থেকেই এর বিকাশ হোক না কেনো, তা-ও বড় কথা নয়। বস্তুত: ইসলামী সংস্কৃতি বলতে আমি এমন একটি ধর্মমত কর্তৃক স্বীকৃত কথা বোঝাতে চাইছি, যাতে মানবিক অগ্রগতিই একটা নিশ্চিত ও সুস্পষ্ট লক্ষ্য। যে-সব মানুষ আল কোরানের পথনির্দেশ অনুসরণ করে এবং তার বিধানসমূহ মেনে চলে, তাদের প্রতি মহামুগ্ধ এ জগতে ও পরলোকে সাফল্যের যে প্রতিশ্রুতি দান করেছে- আল কোরানের শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত কোনো ব্যক্তিই তা অস্বীকার করতে পারে না। এর চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে সামগ্রিকভাবে গোটা মানবজাতির জন্য সাফল্য অর্জন। আর মানুষের সৃজনধর্মী অবদান ও মৌলিক গুণগুলোর বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনের ওপরই এর সাফল্য নির্ভরশীল।

উন্মোচনশীল মুসলিম সমাজের কোনো প্রসারণ-ব্যবস্থা; আল কোরআন কিংবা মহানবীর কোনো নির্দেশে বা আল হাদীসে অনুমোদিত না হলে বুঝতে হবে,

তা ইসলাম-বহির্ভূত এবং ইসলামী বিধি-ব্যবস্থার বাইরেই তার অনৈসলামিক মূলানুসন্ধান করতে হবে। সাফল্যের পরিপন্থী হওয়ার কোনো কারণ না ঘটলেও মুসলামনরা তাদের সমাজ-জীবনে এগুলোর সংযোজন বা ফলস্রাব্ধ দ্বারা কোনোরূপ সুফল আশা করতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, কোনো কর্মপন্থা আল কোরআনের সুস্পষ্ট কোনো বিধির পরিপন্থী হলে বুঝতে হবে তা ইসলাম বিরোধী; আর এটা নিশ্চিতভাবে সাফল্য ও অগ্রগতিরও পরিপন্থী এবং একে গ্রহণ করলে মুসলামনরা নিঃসন্দেহে এক অনিবার্য ধ্বংসের স্বীকার হবে।

গোড়ার দিকে পৌত্তলিক আরবদের প্রতীক-পূজা এবং এর পঙ্খিতা ও মণ্ডতাময় রূপ-বৈচিত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলো বলে কতিপয় শিল্পকলাকে ইসলাম নিরুৎসাহিত করে। কারণ, সমাজের এই প্রতীকবাদিতা ও এর পাপসর্বস্ব বৈশিষ্ট্যের মূলোৎপাটনের প্রয়োজন অনিবার্য ছিলো। তবে সুকুমার বৃত্তিজাত কাজগুলোর অনুরূপ এক জাতীয় শিল্পপদ্ধতির অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে নিরুৎসাহিত ও অন্যবিধ শিল্প-পদ্ধতির পৃষ্ঠপোষকতা- উভয়েরই গুরুত্ব অধস্তন বা গৌণধর্মী ছিলো। কেননা, ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য মানব-জীবনের বাড়তি উপকরণগুলোর সৌন্দর্যবর্ধন, পরিমার্জন ও পরিশীলন নয়- বস্তুত: সামগ্রিক মানবজীবকে সুন্দরতর, মহত্তর, মহিমাময় করে তোলাই ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য। ইসলামী সংস্কৃতির ন্যূনতম একটি প্রতিবাদী রূপ ফুটে উঠেছে বেশ কিছু কবিতায়।

মেয়েদের পর্দা প্রথার সাথে বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকের দিকে সংঘর্ষ বাধে নগ্নতার ও বেহায়াপনার। কবি শাওকী এই সংঘাতের চিত্র তার কিছু কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। তার দৃষ্টিভঙ্গি যদিও এখানে একান্তভাবে সমাজকেন্দ্রিক: ইসলামের প্রচারের বিষয়টি নেই। তবুও ইসলাম-অসমর্থিত নয়।

‘সুন্দরী’- ডাক শুনেই হলো প্রতারিত

জ্বতিই সব সুন্দরীকে ধোঁকায় ফেলে।

শুনে দেখো, আমার নামও ভুলেছে, যখন

ঘিরেছে তাঁকে প্রেমপিপাসু নটের দলে!

দেখলে আমায় অমনি ঘোরায়ে মুখটা, যেনো

দুই হৃদয়ে প্রেম ছিলো না কোনো কালে।

এই কবিতায় কবি শাওকী পাশ্চাত্য নগ্নতার যে অস্ত্রির চিত্র এঁকেছেন তা পাশ্চাত্য নগ্ন-সংস্কৃতিরই স্বরূপ। কবি আহমদ শাওকীর আর একটি কবিতা- পর্দা ও নগ্নতা পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে গ্রহণ করার জন্য; তার অঙ্গ অনুসরণের জন্য রীতিমত খিঙ্কার। ‘পর্দা ও নগ্নতা’ কবিতার কিছু অংশ:

সুধাই ও মোর কোকিল রাণী

আমার গানের বুলবুলি।

মা'বাদের সুর তোমার কণ্ঠে, কণ্ঠে তোমার মুণ্ডসেলী।
বন্দীনি মোর, হৃদয় তোমার ব্যথিত কিনা
বিরহভারে
রাত কেটে যায় বিন্দ্রি, না
ঘুমাও পংকে নয়ন ভরে?
বন্দী তুমি, খাঁচায় আমি?
ব্যাকুল তোমার প্রেমের টানে!
রাগ করো না মুক্তো-মানিক
সবাই লুকায় সজোপনে।
উজাড় করে প্রেম দেবো তাই
লুকিয়ে রাখি: লিঙ্ক-শাখে;
পক্ষ মেলে বের হয়ো না,
ভীড় করেছে শকুন, কাকে।

পাশ্চাত্য নগ্নতা ও বেহায়পনার ব্যাপারে, পরিপূর্ণ প্রত্যয়বাদী সাংস্কৃতিক যোদ্ধাদের সচেতন করবার লক্ষ্যে এবং ইসলামী সংস্কৃতির স্বরূপ উন্মোচনের লক্ষ্যে ঐ কবিতার উদ্ধৃতি টেনে প্রফেসর আল-আমীন বলেছেন: কবে না আবার আমাদের মেয়েরা: সমাজে চিৎকার শুরু করে দেয়, কবে না আবার বলে বসে- আমাদের নারীদের অবাধ স্বাধীনতা দিতে হবে; ইউরোপের নারীদের মতো অবাধ মেলা-মেশার দ্বার উন্মুক্ত করতে হবে, সামাজিকভাবে বয়স্কদেরকে স্বামীর মর্যাদা দিতে হবে এবং তাঁকে পরিবারেরও সদস্য করে নিতে হবে।

ইসলামী সংস্কৃতির স্বরূপ, তার প্রকৃতি অনুধাবনের জন্যে আধুনিক বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ইসলামী-সংস্কৃতি-বিশেষজ্ঞ ড. মুহম্মদ ইকবালের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বক্তব্য তুলে ধরতে হচ্ছে:

১. জাতি, গোত্র, বংশ, বর্ণ ও ভাষার পার্থক্য সত্ত্বেও দুনিয়ার জাতিসমূহের মধ্যে বাস্তব বৈষম্য দূর করে এবং তাদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে ইসলাম তেরশ বছরে এমন একটা কৃতিত্ব অর্জন করেছে যা অপর ধর্মবিধানসমূহ তিন হাজার বছরেও করতে পারেনি। আমি বলতে চাই যে, ইসলামী জীবন ব্যবস্থা হচ্ছে উপলব্ধি ও অনুভূতির অতীত এক জীবতাত্ত্বিক মনস্তাত্ত্বিক কর্মতৎপরতা, মিশনারী ব্যতীত মানবজাতির চিন্তা ও কর্মধারাকে প্রভাবিত করতে সমর্থ। বর্তমান রাজনৈতিক চিন্তানায়কদের উদ্ভাবিত নব-বিধান প্রয়োগ করে এসব কর্মতৎপরতাকে অগ্রাহ্য করে দিলে যেমন মানবজাতির অনিষ্ট সাধন করা হবে, তেমনি যে নবুত্তের বিশ্বজনীনতা থেকে তার জন্ম, তাকেও বিনষ্ট করা হবে।

২. দার্শনিক-কবি খাঙ্কানীর সমসাময়িক যে-সব মুসলিম চিন্তানায়ক ভাবতেন যে, গ্রিক-দর্শনের আলোকে ইসলামী সত্যের ব্যাখ্যা করলেই জ্ঞানের পরিপূর্ণতা সম্ভব হবে, তাদেরকে লক্ষ্য করেই কবি এ পঙ্ক্তি ক'টি লিখেছিলেন। এর অর্থে সামান্য একটু পরিবর্তন করলেই তা আজকের দিনের মুসলিম চিন্তানায়কদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে:

দ্বীনের বাহন আমাদের
জন্মালাভ করেছে আরবের মাটিতে,
চিহ্নিত করো না তার উরুদেশ
ইউনানী দাগে;
অপরিণত নয়া শিক্ষার্থী যারা,
বগলে তাদের দিও না
দুর্ভাগ্যের লিপি-ফলক!

৩. কোরানের মতে ইসলামই একমাত্র ধর্ম- যা সাংস্কৃতিক অথবা রাজনৈতিক অনুভূতির দিক দিয়ে একটি জাতি কায়ম করে দেয়। এই কারণেই কোরান সুস্পষ্ট ঘোষণা করে যে, ইসলামের জীবন-পদ্ধতি ব্যতিত যে কোনো পদ্ধতিকেই অস্বীকার করতে হবে। জ্ঞান এবং বুদ্ধির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। ইসলামী সংস্কৃতির স্বরূপ উদ্ভাসিত হয় ঐ দুটি বিষয়ের যথার্থ বিকাশের মধ্য দিয়ে। মূলত ইসলামী সংস্কৃতি জ্ঞান এবং বুদ্ধির চর্চাকে অপরিহার্য করে, তার বিকাশের পরিপন্থী কোনো মতাদর্শকে সে প্রণয় দেয় না।

সে একজন লেখককে বলে:

১. আপনার লেখনীকে যে কোনো ধারার আলোকে চালাতে চান, চালান।
২. যে কোনো পীযুষই আপনি পান করতে চান করুন।
৩. যে কোনো প্রজ্ঞাকে ধারণ করতে চান, আপনি করুন।
৪. অনুভূতি এবং কল্পনাকে আরো নিবিড়ভাবে উপস্থাপন করতে চান, করান।
৫. সমাজচিত্র পরিবেশনায় আরো সুতীক্ষ্ণ করতে চান, করান।
৬. আদর্শ সমাজ গড়ায় আরো প্রেরণাদায়ী বানাতে চান, বানান।

আপনার লেখাকে সমাজ গড়ায় আরো প্রেরণাদায়ী বানাতে চান, বানান। আপনার লেখায়, আপনার সাধনায় সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করুন, নন্দনতান্ত্রিকতা এবং সৌন্দর্য-দর্শনে আপনি অগ্রসর হোন: আপত্তি নেই। কিন্তু আপনাকে অস্বীকার করতে হবে: আপনার সাহিত্য হয় যেনো আরো পরিচ্ছন্ন-স্বচ্ছ-সুন্দর-মনোহর এবং বাস্তবতা-স্ট-সাহিত্য। শিল্পসমৃদ্ধ ঐ সাহিত্য যেনো এক মহৎ লক্ষ্যের পানে ধাবিত হয়। ভিক্টর কোযানের 'আর্টস ফর আর্টস সেক' এর ভূয়া দর্শন যেনো

বিভ্রান্ত না করে আপনাকে। এক মহান ইসলামী সংস্কৃতি বিশেষজ্ঞের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরাও বলতে চাই: হে সংস্কৃতিবেত্তা, আবৃত্তি ও উপস্থাপনায়, গানে এবং সংগীতে, নাটকে ও অভিনয়ে, বক্তব্যে ও বক্তৃতায়, কৌতুকে ও জীবন্তিকায়, শিক্ষা ও সাংবাদিকতায়, বয়নে ও সীবনে, চারুকলায় ও কারুকলায়, কর্ষণে ও মুদ্রণে, গণিতে ও গণনায়, চিন্তায় ও চিকিৎসায় আপনি আপনার মেধা ও প্রতিভা ইচ্ছে মতো বিনিয়োগ করুন আর শুধুমাত্র এই অঙ্গীকার করুন—সমাজ ও সৌন্দর্য ভুলে যাবেন না; মানুষ ও মানবতা ভুলে যাবেন না, ঐক্যচ্যুত হবেন না। লক্ষ্যচ্যুত হবেন না; শিল্পের এক গোলক—ধাঁধায় হারিয়ে যাবেন না।

ইসলামী সংস্কৃতির স্বরূপ উদ্ধারের জন্যে হযরত ওমর (রা.)'র সময়কালের একটি ঘটনা এবং হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (রহ.) আমলের একটি ঘটনাকে সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা যায়:

আদি ইবনে নযলা হজরত ওমর ফারুক (রা.)'র একজন প্রশাসক। অশ্লীল কবিতা পরিবেশনে খবর গেলো খোদা ওমর ফারুক (রা.)'র কাছে। আদি ইবনে নজলা অভিযুক্ত হলেন এবং পদচ্যুত হলেন।

হজরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজের আমলে আমার ইবনে রবীয়া এবং আবুল আহওয়াস কবিতায় অশ্লীলতা প্রয়োগের অভিযোগে অভিযুক্ত হলেন। এবার ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (রহ.) দু'জনকেই দেশান্তরিত করলেন। অবশ্য আমার ইবনে রবীয়া পরে তওবা করেছিলেন এবং তওবাকে গ্রহণ করা হয়েছিলো।

বাংলাদেশের ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলন একটি অন্তর্গত মূল্যায়নের খসড়া

সমস্ত কর্মপ্রয়াসেরই একটা শুরু থাকে এবং শুরু থাকে বলে, সেই কর্মপ্রয়াস ধীরে ধীরে অথবা দ্রুত গতিতে এগিয়ে যায়। এই এগিয়ে যেতে যেতে কোনো কোনো কর্মপ্রয়াস সফলতার উজ্জ্বল মুখ দেখতে পারে। আবার কোনো কোনো কর্মপ্রয়াস পরিপূর্ণতা পাবার আগেই শেষ হয়ে যায়।

বাংলাদেশে ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে যে কর্মপ্রয়াসের শুরু হয়েছিলো, সেই কর্মপ্রয়াস কখনোই খুব দ্রুতগতিতে এগোয়নি। বরং এগিয়েছে ধীরে ধীরে। এই ধীরে ধীরে এগোবার নিশ্চয়ই একটি কারণ আছে। কি সেই কারণ?

না, সেই কারণের অনুসন্ধান এখন না, পরে।

তবে একথা স্বীকার করতেই হবে, বাংলাদেশের ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কর্মপ্রয়াস কখনোই থেমে যায়নি। মূলত, অব্যাহত রয়েছে আজো সেই কর্মপ্রয়াসের ধারাক্রম এবং পূর্বেও চেয়ে অধিক গতি নিয়ে।

বাংলাদেশের জন্ম ১৯৭১ সালে। '৭১ সালের পরের সময়গুলোতে ইসলামী সংস্কৃতির আনুষ্ঠানিক বিষয়াদিকে পারতপক্ষে জীবন্ত রেখেছিলো কিছু শিশু-কিশোর সংগঠন। ঢাকার দিশারী, চট্টগ্রামের ঝিঙেফুল, সিলেটের গোলাপ কুঁড়ি, রাজশাহীর একঝাঁক পায়রা, খুলনার তরুণ সংঘ, কুমিল্লার সবুজ মেলা এসব সংগঠনের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।

দিশারী এবং ঝিঙেফুলের মতো সংগঠনগুলোর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ঐ '৭১-এর পরবর্তী সময়ে সত্যিই অনবদ্য ছিলো। তাদের নাটকগুলোয় ছিলো তুলনাহীন

মেথার উপস্থিতি এবং আনন্দ প্রদানের পরিশীলিত প্রয়াস। ঐ সব নাটক রচনায় প্রখ্যাত শিশু-কিশোর সংগঠক জনাব মাসুদ আলী এবং ডা. আকরাম হোসেনের অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা ইতিহাস হয়ে থাকলো।

দুই.

১৯৭৬ সালে সরাসরি একটি ইসলামী সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। এই প্রয়াসের পেছনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন জনাব মীর কাসেম আলী এবং তার সংগ্রামী সহকর্মীরা। ঐ প্রয়াসেরই চূড়ান্ত ফলশ্রুতি হিসেবে জন্ম লাভ করে, সাইমুম শিল্পীগোষ্ঠী, ঢাকায়; পাঞ্জেরী শিল্পীগোষ্ঠী, চট্টগ্রামে; হেরাররশ্মি শিল্পীগোষ্ঠী, বরিশালে; সিন্দাবাদ শিল্পীগোষ্ঠী; কুমিল্লায়।

একটি সফল শিল্পীগোষ্ঠী গড়ে তোলার ব্যাপারে ঢাকায় চেষ্টা চালিয়েছিলাম বক্ষ্যমাণ প্রাবন্ধিক মতিউর রহমান মল্লিক, ঢাকা আলিয়া মাদরাসার জনাব গিয়াস উদ্দিন আহমদ (বর্তমানে একটি কামিল মাদরাসার অধ্যক্ষ), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনাব আবদুল হালীম (বর্তমানে একটি প্রতিষ্ঠানের ডাইরেক্টর), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনাব লোকমান হোসেন (বর্তমানে একটি ফার্মের প্রধান হিসাবরক্ষক), জনাব নজরে মাওলা (বর্তমানে আমেরিকা প্রবাসী), জনাব তাফাজ্জল হোসাইন খান (বর্তমানে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-র উত্তরা শাখার ম্যানেজার), জনাব আখতার হোসেন (হাসান আখতার) (আল মানার অডিও-ভিজুয়াল সেন্টারের অন্যতম কর্মকর্তা), গণসঙ্গীত শিল্পী আবুল কাশেম (সাপ্তাহিক সমাজচিত্রের সম্পাদক), ইঞ্জিনিয়ার রাশিদুল হাসান প্রমুখ। একেবারে প্রথম দিকে, ঢাকায় আমাদের হাল ধরেছিলেন ড. মিয়া মোহাম্মদ আইয়ুব।

চট্টগ্রামে চেষ্টা চালিয়েছিলেন ডা. স ম রফিক, মোহাম্মদ সেলিম, আমীরুল ইসলাম প্রমুখ। ডা. আকরাম হোসেন কাজ করেছিলেন মূল প্রেরণা হিসেবে। ডা. শাহ মোহাম্মদ বুলবুল ইসলাম, ডা. মজুর মোর্শেদ, ডা. নাসির উদ্দিন, জনাব সিরাজুল করীম, জনাব খোরশেদ চৌধুরী ঐ সময়ের প্রেরণাদাতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

বরিশালে চেষ্টা করেছিলেন মরহুম আবদুল্লাহিল বাকী মহিউদ্দীন, জনাব আমিনুল ইসলাম (বর্তমানে দৈনিক ইনকিলাবের সার্কুলেশন বিভাগের অন্যতম কর্মকর্তা), জনাব সৈয়দ মজুর হোসেন প্রমুখ। তবে এঁদের সবার পেছনে অসাধারণ উৎসাহদাতা হিসেবে কাজ করেছিলেন যথাক্রমে বরিশাল জেলা ও শহর শাখার সভাপতি ডা. আবদুল জলীল এবং ডা. আবদুল্লাহ খান।

কুমিল্লায় চেষ্টা করেছিলেন মিয়া মোহাম্মদ নাসির, জাহিদ হোসেন, আমজাদ হোসেন প্রমুখ। এঁদের পেছনে প্রেরণা জুগিয়েছিলেন জনাব জসিমউদ্দীন সরকার, জনাব আশেক আহমদ জেবাল, জনাব শহীদ ফারুকী, জনাব হাবিবুর রহমান প্রমুখ।

সাইমুম-পাঞ্জেরী-হেরার রশ্মি-সিন্দাবাদ গড়ে ওঠার পরপরই দুই-এক বছরের মধ্যে বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি জেলাতেই গড়ে ওঠে ইসলামী সাংস্কৃতিক সংগঠন: ইসলামী শিল্পীগোষ্ঠী। বর্তমানে প্রায় প্রতিটি থানাতেই শিল্পীগোষ্ঠীর অস্তিত্ব মাথা উঁচু করে আছে। কোনো কোনো ইউনিয়নে পর্যন্ত গড়ে উঠেছে শিল্পীগোষ্ঠী অথবা সাহিত্য সংগঠন অথবা নাট্য সংঘ। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভিত্তিক সাংস্কৃতিক সংগঠন তো গড়ে উঠেছে থানাভিত্তিক সংগঠন গড়ে উঠবারও অনেক আগে।

সাইমুম-পাঞ্জেরী গড়ে উঠবার প্রেক্ষাপটে গড়ে উঠলো রাজশাহীর প্রত্যয়, খুলনার টাইফুন, বগুড়ার সমন্বয়, সিলেটের দিশারী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিকল্প ইত্যাদি। নিঃসন্দেহে এইসব শিল্পীগোষ্ঠী এখনো ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রাদেশিক সংগঠনের ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। বলতে দ্বিধা নেই, এদের কারো কারো তৎপরতা এখন জাতীয় পর্যায়ে।

বহুত এ '৭৬ সালে ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তুলবার লক্ষ্যে যে-কার্যক্রম শুরু হয়েছিলো, তারই ফলশ্রুতিতে একদিকে যেমন অসংখ্য শিল্পীগোষ্ঠী গড়ে উঠলো, অসংখ্য সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে উঠলো, অন্যদিকে তেমনিভাবে গড়ে উঠলো অনেক অনেক মেধাবী শিল্পী, সাংস্কৃতিক সংগঠক, গীতিকার, সুরকার, নাট্যকার, সাংস্কৃতিক কর্মী এবং অসংখ্য শ্রোতা দর্শক।

ইসলামী সাংস্কৃতিক অঙ্গনের শিল্পী হিসেবে আজ যারা সারাদেশে খ্যাতির শীর্ষে অবস্থান করছেন, তারা হলেন: গণসঙ্গীত শিল্পী আবুল কাশেম, তারিক মুনাওয়ার, সাইফুল্লাহ মানচুর, হাসনাত কাদের, মশিউর রহমান প্রমুখ।

একসময় খ্যাতির শীর্ষে ছিলেন রাশিদুল হাসান, আবদুল হালিম, সৈয়দ মজ্জুর হোসেন, আমীরুল ইসলাম, শেখ বেলাল, গোলাম মাওলা, ডা. সিরাজ উদ্দীন, হাসিনুর রব মানু প্রমুখ।

এ-কথা সর্বাধিক পরিমাণে সত্য যে, গায়কের চাহিদা বেড়ে যাবার অর্থই হলো গানের চাহিদা বেড়ে যাওয়া। সুতরাং গানের চাহিদা অর্থাৎ ইসলামী গানের চাহিদা বেড়ে গেলো বলে তা পরিবেশনের প্রয়োজনীয়তা প্রচণ্ডভাবে পরিলক্ষিত হতে থাকলো। এ-ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম এগিয়ে এলেন প্রখ্যাত সংগঠক জনাব সিদ্দিক জামাল। বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের মাধ্যমে তিনি প্রতিষ্ঠিত স্টুডিও থেকে রেকর্ড করে, ইসলামী গানের ক্যাসেট পরিবেশনের দায়িত্ব নিলেন। আলোড়ন

সৃষ্টিকারী অনেকগুলো ক্যাসেট এই ইসলামিক সেন্টার থেকে বের হলো। স্বীকার করতেই হবে, ইসলামী গানের ক্যাসেটের যে-প্রবাহ আজ আমরা লক্ষ্য করছি, তার শুভ সূচনা করেছিলো ঐ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারই। ঐ সময় প্রচণ্ড শক্তিশ্বর কয়েকজন গীতিকার, সুরকার এবং গায়কের নাম সমান্তরালভাবে ছড়িয়ে গেলো সারাদেশে। চৌধুরী আবদুল হালিম, চৌধুরী গোলাম মাওলা, রাশিদুল হাসান তপন, তাফাজ্জল হোসাইন খান, আবুল কাশেমের নাম এ-ক্ষেত্রে সর্বাত্মে উল্লেখ করা যায়। এ সময়ের গীতিকারদের মধ্যে আবু তাহের বেলাল, জাকির আবু জাকির, লিটন হাফিজ মানসসম্পন্ন গান রচনায় অগ্রসর হলেন।

মূলত ইসলামী গানের ক্যাসেটের চাহিদা বেড়ে যাবার কারণে এবং আদর্শ প্রচারের জন্যে ঐ ধরনের ক্যাসেটের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি যুক্তিসঙ্গতভাবে বৃদ্ধি পাবার কারণে, ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রথম দিকের গতিধারা শেষ পর্যন্ত অবরুদ্ধ হলো না। সাময়িকভাবে হলেও থেমে গেলো 'বাজনাবিহীন গানও নাজায়েজ'-এর মতো অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্ত।

বাংলাদেশে ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রথম দিকের প্রয়াসের ধারাবাহিকতা শুধু শিল্পী-সুরকারই উপটৌকন দেয়নি, দিয়েছে একদল সুদক্ষ সাংস্কৃতিক সংগঠক। এসব সংগঠকদের মধ্যে আমীরুল ইসলাম, নোমান আযামী, তারিক মুনাওয়ার, সাইফুল্লাহ মানছুর, সালমান আযামী, আকরাম মুজাহিদ, গোলাম মাওলা, মোহাম্মদ জামালুদ্দিন, শরীফ বায়জীদ মাহমুদ, সৈয়দ মঞ্জুর হোসেন, ডা. এহসানুল কবীর, মাহফিজুর রহমান আখন্দ, হাসনাত আবদুল কাদের, হাসিনুর রব মানু, আবদুল গফুর, লিটন হাফিজ চৌধুরী, আমিনুল ইসলাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশের ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলন শিশু-আন্দোলন থেকে পেয়েছে বিপ্লবের মেধা ও প্রতিভার এক হিরক খনি। এ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা সম্ভব নয়। বরং প্রয়োজন স্বতন্ত্র কোনো গবেষণার।

তিন.

ইসলামী সাংস্কৃতিক তৎপরতার পেছনে সবসময়ই ছিলো মূল সংগঠনের অপেক্ষাকৃত কম মনোযোগ। এই মনোযোগ ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই সঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছে জনগণের আগ্রহেরও। এই আগ্রহের একটি প্রমাণ ১৯৮৪ সালের একটি ঘটনা :

জনাব এ এফ এম ইয়াহইয়া সাহেব তখন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক।

সিরাতুলনবী (সা.) উদ্যাপন উপলক্ষে তিনি বিশাল কর্মসূচি হাতে নিলেন। ইসলামী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করার কর্মসূচিও রাখলেন তিনি।

যথাসময়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রথম দিনে এলেন রেডিও-টিভির খ্যাতিমান শিল্পীবৃন্দ। লোক সমাগম হলো না তেমন একটা, কিন্তু দ্বিতীয় দিনে, সাইমুম শিল্পীগোষ্ঠীর অনুষ্ঠানে লোক সমাগম হলো প্রচুর; সাইমুমের অনুষ্ঠানও হলো আশাতীত রকমের ভালো। ঐ অনুষ্ঠান সম্পর্কে মহাপরিচালক মহোদয় একটি ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন:

‘আমি বাস্তবিকই অভিভূত হয়েছি সাইমুম শিল্পীগোষ্ঠীর এই অপূর্ব-সুন্দর অনুষ্ঠান দেখে। আমার বিশ্বাস, আপনারাও আমার মতোই খুশি এবং অভিভূত হয়েছেন। আল্‌হামদুলিল্লাহ, আজকে আমাদের সমাজে আমাদের ছোট ভাইয়েরা, তরুণরা, কিশোররা আল্লাহর দীন কায়েমের জন্য মানুষের যে-অনুভূতি, শিল্পী মনের অনুভূতি, তার মাধ্যমে, এই প্রচেষ্টা চালাবার সৎসাহস দেখিয়েছে। আমি তাদেরকে ব্যক্তিগতভাবে এবং আপনাদের প্রত্যেকের তরফ থেকে আন্তরিক মোবারকবাদ ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি আশা করবো, ভবিষ্যতে তারা আরো উন্নতমানের অনুষ্ঠান পরিবেশন করতে সক্ষম হবে।

বাংলাদেশের মানুষ শিল্পীমনা। বাংলাদেশের মানুষ কবিতা এবং গানকে ভালোবাসে। তাই বাংলাদেশের মানুষের কাছে আল্লাহর দ্বীনের সত্যিকার রূপ এইভাবে তুলে ধরলে, এই দেশে ইকামাতে দ্বীনের কাজ বলিষ্ঠভাবে এগিয়ে যাবে বলে আমি বিশ্বাস করি। এক কালে, আমরা যখন ছোট ছিলাম, বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের লেখা কবিতা-গান এবং বাংলার বুলবুল আব্বাস উদ্দীন আহমদের কণ্ঠ সারা বাংলাদেশের মুসলমানদের অনুপ্রাণিত করেছিলো। আজকে আমাদের সমাজে বহু আব্বাস উদ্দীনের জন্ম হয়েছে। ফররুখ আহমদ, তালিম হোসেন, বেঁজীর আহমদ এঁদের লেখার মাধ্যমে, এঁদের কবিতা এবং গানকে কেন্দ্র করে, আমি আশা করবো এই তরুণরা ভবিষ্যতে সারা বাংলা, সমগ্র বাংলাদেশে এমন এক প্রাণবন্ত পরিবেশের সৃষ্টি করবে, যেখানে আমরা বলিষ্ঠভাবে, সাহসিকতার সাথে বলতে পারবো, কোনোরকম সাংস্কৃতিক অনুপ্রবেশ আর আমরা হতে দেবো না ইনশাআল্লাহ।

রাজনৈতিকভাবে আমরা প্রমাণ করে দিয়েছি যে, আমরা একটি স্বাধীন মুসলিম জাতি-পৃথিবীতে আর কারও মনে এ সম্বন্ধে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। অর্থনৈতিক দিক থেকে আমরা মুসলিম জাহানের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার জন্য সচেষ্ট। এ-ব্যাপারেও সারা পৃথিবী আমাদের প্রচেষ্টাকে পর্যবেক্ষণ করছে এবং আমরা আশা করবো ইনশাআল্লাহ, এই ক্ষেত্রেও আমরা

ঘনির্ভর হতে সক্ষম হবো এবং আমাদের ইসলামী সন্তাকে আমরা পৃথিবীর ছোবল থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হবো ।

সবচেয়ে যে-ক্ষেত্রে আমরা বারবার মার খেয়েছি আমাদের ইতিহাসে এবং এখনও মার খাবার ভয় রয়েছে, সেটি এই সংস্কৃতির ক্ষেত্রে । আমি মনে করি, সাইমুম শিল্পীগোষ্ঠী বাংলাদেশের মুসলমানদের সবচেয়ে দুর্বল এই দিককে পাহারা দেবার জন্য বীর মুজাহিদ হিসেবে দুনিয়ার বুকে সর্বোচ্চ ইনশাআল্লাহ নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করবে এবং তারা ইসলামের অভেদ্য দুর্গ হিসেবে সাংস্কৃতিক অনুপ্রবেশের হাত থেকে- বাংলাদেশকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে । পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সাথে আরো যে সংস্কৃতি আমাদেরকে আজ দ্রুত ধ্বংসের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, সে সম্বন্ধেও আমাদেরকে সজাগ হতে হবে । আমি পুনরাবৃত্তি করছি আমার এই বক্তব্যের যে, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির চাইতেও যেটা আমাদেরকে তিলে তিলে খেয়ে ফেলেছে, সেই পৌত্তলিক সংস্কৃতি সম্বন্ধে আমাদেরকে আরও বেশী সজাগ এবং সচেতন ও সতর্ক হতে হবে ।

আমরা আজকের এ-অনুষ্ঠান দেখে বাস্তবিকই মুগ্ধ হয়েছি । আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করবো যে, আল্লাহ তাদের তৌফিক দিন, যেনো তারা আরো সুন্দর এবং আরও উন্নততর অনুষ্ঠান পরিবেশন করতে পারে । ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আমি সাইমুম শিল্পীগোষ্ঠীকে আমার ক্ষুদ্র ও সীমিত ক্ষমতায় যতোটুকু সম্ভব সাহায্য এবং সহযোগিতা করার ওয়াদা করছি । তাদের এই মহান প্রচেষ্টার সাথে আমাদের আরও গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য আমি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করছি । যদিও টাকার অঙ্কটি বড় নয়, আমাদের মনে তারা যে-জায়গা দখল করলো সেটি বড় জিনিস এবং ভবিষ্যতে এ সম্পর্ক আরো উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে ইনশাআল্লাহ ।

সবশেষে আসুন, আমরা আল্লাহ রাহমান-আর-রহিমের কাছে অবনত মস্তকে দোয়া করি যে, তাদের এ প্রচেষ্টা, আমাদের এ প্রচেষ্টা, আপনার-আমার সবার এ প্রচেষ্টা, আল্লাহর হুকুম-আহকাম, আল্লাহর দীনকে সারজমীন বাংলাদেশে কয়েমের প্রচেষ্টা যেনো মালিক কবুল করেন । মালিক যেনো তৌফিক দেন, সাহস দেন এবং আমাদের সাহায্য করেন, আমাদের সাফল্যমণ্ডিত করেন । নির্ভেজাল তৌহিদের আদর্শে আবার যেনো আমরা উদ্বুদ্ধ হতে পারি । তার মধ্যে যেনো কোনো রকমের ফিতনা, কোনো রকম বিদায়াহ এবং কোনো রকমের কুসংস্কার না থাকে ।

জারী গানের মাধ্যমে এই তরুণ কিশোররা আমাদের চোখে আভুল দিয়ে যে সমস্ত কুসংস্কার, যে সমস্ত শিরক, যে-সমস্ত কুফর-এর কথা তুলে ধরেছে, সে সম্বন্ধে আমাদের সজাগ হতে হবে এবং আমাদের দীনকে এইসব ভেজাল

থেকে, এইসব আবর্জনা থেকে পরিষ্কার করে একমাত্র আল্লাহর জন্য খালিস করে তুলতে হবে। আমরা আল্লাহর মাকবুলিয়াত পাবো। আল্লাহর মাকবুলিয়াত পেলেই আল্লাহর সাহায্য পাবো। আর আল্লাহর সাহায্য পেলেই পৃথিবীর কোনো ক্ষমতা, কোনো রষ্ট্র, কোনো দেশ, সে যতো বড়ই হোক, কোনো প্রতিবেশী, সে যতো বড়ই হোক, আমাদের দেশে ইসলামী হুকুমাত কায়ম করতে বাধা দিতে পারবে না, আমাদের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের এতোটুকু খর্ব করতে তাদের সাহস হবে না ইনশাআল্লাহ।

আমাদের অস্তিত্ব আমাদের মুসলমানত্বের মাধ্যমে, আমাদের অস্তিত্ব আমাদের ইকামাতে ধীনের মাধ্যমে, আমাদের অস্তিত্ব ইসলামের মাধ্যমে। আমাদের সমস্ত কিছু ইসলামের জন্য। ‘ইন্না সালাতি ওয়া নুসুকি-অ-মাহইয়াইয়া অ-মামাতি লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন’- এই আদর্শ, মিল্লাতে ইবরাহিমের এই আদর্শ আমাদের সামনে নতুনভাবে, বলিষ্ঠভাবে পরিস্ফুটিত হয়ে উঠুক।’

ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত পঞ্চকালব্যাপী ঐ সিরাতুল্লবী অনুষ্ঠানে সাইমুম শিল্পীগোষ্ঠীর পরিবেশনা ছিলো সত্যিকার অর্থেই অনুপ্রাণিত করার মতো। ১৯৮৪ সালের ১৫ জানুয়ারির সেই অনুষ্ঠানের পর শিল্পীরা নিজেদের গান এবং সুরের ব্যাপারে আত্মাশীল হয়ে উঠেছিলো। উপরন্তু সাধারণ জনগণের মধ্যে অনুষ্ঠান করবার ব্যাপারে সাহসী হয়ে উঠেছিলো। এতো দিন যারা ছিলো নিজেদের মধ্যে, এবার তারা অন্যের মধ্যেও সঞ্চারিত হবার মনোবল অর্জন করলো।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুষ্ঠানটির সাফল্যের পেছনে ডা. স ম রফিক, কবি আসাদ বিন হাফিজ, শিল্পী নোমান আযামী এবং কবি সোলায়মান আহসানের পরিকল্পনা এবং পরিচালনা যথার্থভাবেই কাজে লেগেছিলো।

কিন্তু তার আগে ১৯৮২ সালের ১৮ জানুয়ারির ঘটনা শিল্পীদের মনে একটা গাঢ় বিশ্বাস এনে দিয়েছিলো যে, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ওপর আল্লাহর রহমত আছে, তা না হলে শিল্পী তাফাজ্জল হোসাইন খান এবং জনাব আজীজ সাইফুল্লাহ গান গাইতে গাইতে পা হারাবেন কেনো? কেনো আকরাম মুজাহিদের মতো এক কিশোর শিল্পী গুরুতররূপে আহত হবে? শিল্পী শেখ মহিউদ্দীনের সমস্ত শরীর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাবে কেনো? ঐ পা হারানোর ঘটনা এবং অনেক-অনেক ভাই আহত হবার ঘটনা ঘটেছিলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ রহমান হলের সামনে।

ডাকসুর নির্বাচন উপলক্ষে ‘এনাম-কাদের’ পরিষদের বিরাট মিছিল গান গেয়ে গেয়ে মাতিয়ে তুলেছিলো বিশ্ববিদ্যালয়ের আকাশ-বাতাস। শত্রুদের এটা সহ্য হয়নি। এফ রহমান হলের সামনে মিছিল পৌছে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই চালালো বোমা হামলা।

সে-দিনের হামলার লক্ষ্য ছিলো আল্লাহর রাহে নিবেদিত প্রাণ অগ্রগতির পথকে চিরতরে রুদ্ধ করে দেয়া। কিন্তু আদৌ তা সম্ভব হয়নি বরং ঐ আঘাতের পর সমস্ত বিশ্বাসীরা দৃঢ় বিশ্বাসীতে পরিণত হয়েছিলো, সমস্ত শিল্পীরা পরিণত হয়েছিলো অবিসংবাদিত লড়াকু শিল্পীতে।

আলো এবং অন্ধকারের মধ্য দিয়েই এগিয়ে চলে সময়ের বিশাল বহর। ঠিক তেমনিভাবে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনও এগিয়ে গেছে নানাবিধ চড়াই এবং উত্তরাইয়ের মধ্য দিয়ে।

বস্তুত ঐ সময়ে সাইমুম শিল্পীগোষ্ঠী যেমন বিবিধ প্রয়াসের মাধ্যমে জায়গা করে নিয়েছে জনগণ মনপ্রান্তরে- পাঞ্জেরী ও অন্যান্য শিল্পীগোষ্ঠীও ঐ সময়ে একইভাবে সারাদেশে সাড়া জাগিয়েছে অপ্রতিহত গতিতে।

চার.

ইসলামী গানের ব্যাপক প্রসারতা এসেছে ক্যাসেটের মাধ্যমে। এ-ক্ষেত্রে প্রথম উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের নাম আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। পরবর্তী সময়ে এ-কাজে উদ্যোগী হয় সাইমুম শিল্পীগোষ্ঠী নিজেই। আরো পরে শিল্পী সাইফুল্লাহ মানছুরের কোম্পানি লিমিটেড-সি এইচ পি- এই প্রচেষ্টায় বলিষ্ঠভাবে এগিয়ে আসে। এক পর্যায়ে, ‘সুশিক্ষা কার্যক্রম’, ‘মিশন বুক কর্ণার’ ‘ইসলাম প্রচার সমিতি’ এবং চট্টগ্রামের ‘জাহিদ ইলেক্ট্রনিক্স’ এগিয়ে আসে ঐ কর্মকাণ্ডে।

ব্যক্তিগতভাবে গীতিকার-শিল্পী আবুল হোসেন মাহমুদও ইসলামী গানের ক্যাসেট প্রকাশনায় হাত দিয়েছে বেশ আগেই।

ক্যাসেট প্রকাশনায় ‘শিবির প্রকাশনী’র ভূমিকা প্রশংসনীয়।

ইসলামী গানের প্রচারের ক্ষেত্রে ইসলামী গানের বই প্রকাশের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ-ব্যাপারে প্রথম ভূমিকা রাখেন ডক্টর মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব। তাঁরই তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হয় ‘সুর শিহরণ’ নামের একটি চমৎকার সংকলন। উল্লেখ্য, ‘সাইমুম শিল্পীগোষ্ঠী’ নামকরণও করেছিলেন ডক্টর মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব। ১৯৭৭ সালে, অধুনালুপ্ত শতাব্দী প্রকাশনী থেকে, জনাব বাশারাত হোসেন বকুলের তত্ত্বাবধানে, প্রকাশিত হয় ‘ঝংকার’ নামের গানের বই। ‘ঝংকার’ নামটি শিল্পী আবদুল হালিমের দেয়া নাম।

‘পদ্মা-মেঘনা-যমুনার তীরে’ নামের সংকলন প্রকাশের পেছনে সবচেয়ে বড় অবদান হলো ঢাকা মহানগরীর বর্তমান এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি জনাব মোহাম্মদ আমিনুল ইসলামের।

ইসলামী গানের সবচেয়ে বড় সংকলনটির নাম 'প্রত্যয়ের গান'। এই সংকলনে সারা বাংলাদেশের গীতিকারদের গান মুদ্রিত করার প্রয়াস লক্ষণীয়। এটি প্রকাশের পেছনে জনাব তাসনীম আলম, জনাব সৈয়দ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের, জনাব আ জ ম ওবায়দুল্লাহর প্রশংসনীয় ভূমিকার কথা স্বীকার করতেই হবে। গ্রন্থটির নামকরণ করেন কবি সোলায়মান আহসান।

ইসলামী গানের সংকলন-১ এবং ইসলামী গানের সংকলন-২ নামে দুটি মূল্যবান সংকলন বের করেছে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার। এ-ক্ষেত্রে অধ্যাপক এ কে এম নাজির আহমদের আগ্রহ ছিলো প্রবলতর। ইতিপূর্বে পাঞ্জেরী শিল্পীগোষ্ঠীও একটি সংকলন বের করেছে।

সংকলন প্রকাশের মহৎ কাজে ব্যক্তিগতভাবে কবি আসাদ বিন হাফিজই তাঁর প্রীতি প্রকাশনীর মাধ্যমে এগিয়ে এসেছেন।

আর এগিয়ে এসেছে গীতিকার আবুল হোসাইন মাহমুদ।

পাঁচ.

সাংস্কৃতিক আন্দোলন এগিয়ে যায় নানাবিধ কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে। এ-ক্ষেত্রে অনুষ্ঠানাদির ভূমিকা তর্কাতীতভাবেই মুখ্য। আজকাল একটি অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায়- এখনকার গানগুলোতে কেনো আর আগের মতো প্রেরণা খুঁজে পাওয়া যায় না? অভিযোগটি পুরোপুরি সত্য না হলেও কিছুটা তো সত্য অবশ্যই।

সেই '৭০-এর দশকে, ৮০-এর দশকে প্রায় প্রতিটি টি এস, টি সি এবং সাংগঠনিক অনুষ্ঠানে অবশ্যই গান গাইতে হতো। ফলে অনুপ্রেরণাধর্মী গান লিখতেও হতো। বর্তমান সময়ে শিল্পীরা কি সেই সুযোগ পাচ্ছে? উল্লিখিত অভিযোগের প্রথম উত্তর এখানেই নিহিত রয়েছে। মূলত ইসলামী আন্দোলনের প্রতিটি কর্মকাণ্ডের সঙ্গে শিল্পী এবং সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোকে যুক্ত করতে না পারলে কাজকর্ম মানের গান বলুন আর নাটক বলুন কিছুই পাওয়া যাবে না।

সাংস্কৃতিক আন্দোলন এগিয়ে যায় নানাবিধ আয়োজনের মধ্য দিয়ে। ১৯৮৯ সালে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের একটি তাৎপর্যপূর্ণ চারিত্র্য দাঁড়িয়ে গেলো। আমরা এখন সাংস্কৃতিক উৎসবের কথাই বলছি। সত্যি কথা বলতে কি, ঐ উৎসব প্রথম অনুষ্ঠিত হলো শিল্পকলা একাডেমীতে এবং যা ছিলো গুণে-মানে সত্যিই সময়োত্তীর্ণ।

উৎসবের ঐ ধারাবাহিকতা এগিয়ে নিয়ে গেলো সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ধারাক্রমকে আরো বহুদূর। উৎসব আয়োজনের এই কর্মধারায় প্রথম ভূমিকা পালন করেন শিল্পী সাইফুল্লাহ মানছুর।

১৯৯০ সালে উৎসবের সঙ্গে প্রথম সংযোজিত হয় নাটক। এ-ক্ষেত্রে সালমান আযামীর ভূমিকা ছিলো মুখ্য। মূলত এ-সময় থেকে উৎসবের আকর্ষণ বহু গুণে বেড়ে গেলো; বেড়ে গেলো ঐ নাটকের কারণেই।

সাইমুম শিল্পীগোষ্ঠী উৎসবের এই প্রক্রিয়াকে এখনো অব্যাহত রেখেছে। উৎসব ঢাকায় শুরু হলো বলে, দেশের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোতেও এ-ধরনের আয়োজন পরিলক্ষিত হতে লাগলো।

উৎসব আশাবিত্ত করলো তাদেরকে, যারা অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে ভূমিকা রাখতে চায়। অন্যদিকে শিল্পীরাও সচেতন হলো সবকিছু মানসম্পন্ন করে উপস্থাপন করার ব্যাপারে। এক পর্যায়ে সাইমুম শিল্পীগোষ্ঠীর শিল্পীরা সুযোগ পেলো টিভিতে হামদ-না'তের অনুষ্ঠান করার। এ-ব্যাপারে নেতৃত্ব দিলেন শিল্পী সাইফুল্লাহ মানছুর এবং সর্বাত্মক সহযোগিতা করলেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অন্যতম প্রধান কর্মকর্তা জনাব মোফাজ্জল হোসাইন খান। টিভিতে অনুষ্ঠান করার মধ্য দিয়ে আরো আস্থা অর্জন করলো গোটা সাংস্কৃতিক অঙ্গন।

ছয়.

সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে জোরদার করে সাহিত্যের আন্দোলন। ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কথা ভাবাই যায় না সাহিত্যের আন্দোলন ছাড়া। বাংলাদেশে এ-ব্যাপারে সবচেয়ে অগ্রসর ভূমিকা পালন করেছে সিলেটের সংলাপ সাহিত্য সংস্কৃতি ফ্রন্ট, ঢাকার বিপরীত উচ্চারণ সাহিত্য-সংস্কৃতি সংসদ; চট্টগ্রামের চট্টগ্রাম সংস্কৃতি কেন্দ্র, মুক্তকণ্ঠ, রাজশাহীর পরিচয় সাহিত্য পরিষদ; কিশোরগঞ্জের কিশোরগঞ্জ সাহিত্য পরিষদ ইত্যাদি।

কবি আফজাল চৌধুরীর নেতৃত্বে এবং সিলেটের নবীন-প্রবীণ ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী সাহিত্যিকগণ সংগঠিত হয় সংলাপের প্র্যাটফর্ম। যে-কারণে জাতি পেয়েছে কবি সোলায়মান আহসান, কবি মুকুল চৌধুরী, কবি তমিজ উদ্দীন শোদী, কবি নিজামউদ্দিন সালেহের মতো স্বনামখ্যাত সাহিত্য প্রতিভা।

বিপরীত উচ্চারণ সাহিত্য-সংস্কৃতি সংসদের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছেন কবি আসাদ বিন হাফিজ, কবি হাসান আলীম, কবি নাসির মাহমুদ, কবি বুলবুল সরওয়ারের মতো তীক্ষ্ণ মেধার কবি-সাহিত্যিক।

রাজশাহীর পরিচয় সাহিত্য পরিষদ সারাদেশের সাহিত্যিকগণে পরিচিত করেছে গল্পকার নাজিব ওয়াদুদ, সাংবাদিক সরদার আবদুর রহমান, প্রবন্ধকার খুরশীদ

আলম বাবু, কবি সায়ীদ আবুবকর, গল্পকার মাতিউর রহমান, কবি ফজলুল হক তুহিনের মতো মেধাবীদের।

বাংলা সাহিত্য পরিষদ বাংলাদেশের ইসলামী সাহিত্য-অঙ্গনের প্রথম জাতীয় সাহিত্য প্রতিষ্ঠান। এ-সংগঠনের মাধ্যমে একদল তরুণ কবি সাহিত্যিক এখন মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। এইসব তরুণদের মধ্যে রফিক মুহাম্মদ, শাহীন হাসনাত প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের আগে এখান থেকে বেড়ে উঠেছেন প্রখ্যাত গ্রন্থকার নাসির হেলাল এবং প্রখ্যাত কবি গোলাম মোহাম্মদ। উল্লেখ্য, বাংলা সাহিত্য পরিষদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন প্রখ্যাত লেখক-সম্পাদক জনাব আবুল আসাদ, প্রখ্যাত গবেষক আবদুল মান্নান তালিব এবং বাংলাদেশের প্রধান কবি আল মাহমুদ।

চট্টগ্রাম হচ্ছে ইসলামী সংস্কৃতির শহর। আদর্শবাদী সাহিত্য আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও এ-শহরের অগ্রভূমিকার কথা চিরস্মরণীয়। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর কবিতায় দুর্দান্ত দাপট দেখালেন কবি জহুর-উশ-শহীদ, কবি আশরাফ আল দীন, কবি চৌধুরী গোলাম মাওলা প্রমুখ। এদের পরপরই এক অসম্ভব শক্তিদর কবির আবির্ভাব ঘটলো এখানে, নাম শাহেদ আজীজ। আরো পরে এলো কবি মাস্টারউদ্দীন জাহেদ, কবি ইকবাল করিম রিপন এবং আরো অনেকে।

নাটকের অঙ্গনে এলেন এক ঝাঁক অপ্রতিদ্বন্দ্বী নাট্যপ্রতিভা। ডা. আকরাম হোসেন, আ স ম শাহরিয়ার, চৌধুরী গোলাম মাওলা, আহমদ নাসিমুল হুদা নওশাদ, আ জ ম ওবায়দুল্লাহ, অধ্যাপক আহসান সাইয়েদ এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিজয় পতাকা উড়িয়ে দিলেন ডা. নাসিরউদ্দিন, মোহাম্মদ সেলিম, আহমদ নাজির, মিজানুর রহমান মিজান প্রমুখ।

সত্যিকথা বলতে কি, ইসলামী সাহিত্য এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলন এগিয়ে নেবার ক্ষেত্রে চট্টগ্রামের ভূমিকা ছিলো সবসময়ই উজ্জ্বল। সেই উজ্জ্বল-ভূমিকা অব্যাহত রয়েছে আজো। সুতরাং আমাদের সবচেয়ে শক্তিশালী কবি কাজী নজরুল ইসলাম চট্টগ্রামের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে- মন্তব্য করেছিলেন, ইনশাআল্লাহ তা একদিন বাস্তবায়িত হবেই। তিনি বলেছিলেন :

‘আমাদের ইসলামাবাদ [চট্টগ্রাম] হোক গুরিয়েন্টাল কালচারের পীঠস্থান আরাকাত। দেশ-বিদেশের তীর্থ যাত্রীরা এখানে ভীড় করুক।’

বাংলাদেশে ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলন এগিয়ে নেবার ক্ষেত্রে বরিশালের সাহিত্য সংগঠন 'শিকড়' অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছে। কবি নয়ন আহমেদ, কবি আল হাফিজ, কবি জাহাঙ্গীর ওবায়দুল্লাহ প্রমুখ খ্যাতিমান কবিরা ঐ সংগঠনের মধ্য দিয়ে উঠে এসেছেন। শিকড় যে-শক্তি নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিলো, সে শক্তি আজো অপ্রতিহত রয়েছে।

সাত.

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলন আরো একধাপ এগিয়ে গেলো উন্মুক্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে। এই উন্মুক্ত অনুষ্ঠান সর্বপ্রথম শুরু করে ঐতিহ্য-সংসদ। বায়তুল মোকাররম মসজিদের উত্তর গেটে। ১৯৯১ সাল থেকে। ঐতিহ্য-সংসদের এইসব অনুষ্ঠানে একদিকে যেমন যোগদান করেছেন ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নিজস্ব শিল্পীরা; অন্যদিকে যোগদান করেছেন রেডিও-টিভির দেশখ্যাত নবীন এবং প্রবীণ শিল্পীরা। ঐতিহ্য-সংসদের উন্মুক্ত অনুষ্ঠান দীর্ঘ দিন অব্যাহত থাকেনি। তবু তা জনতার মধ্যে বিপুলভাবে সাড়া জাগিয়েছিলো।

মূলত উন্মুক্ত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সাংস্কৃতিক কর্মসূচির গুণগত পরিবর্তন সূচিত হচ্ছিলো। সাংস্কৃতিক কর্মীরা সম্ভবত এই প্রথম অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পেলো যে, জনগণ কী ধরনের অনুষ্ঠান পছন্দ করে।

উন্মুক্ত অনুষ্ঠান সমন্বয়েরও একটি পরিবেশ তৈরি করে দিলো। সমন্বয় হলো বুদ্ধিজীবী-সাংস্কৃতিক কর্মী-রেডিও-টিভির শিল্পী-রাজনৈতিক সংগঠক এবং বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে। উন্মুক্ত অনুষ্ঠানের ঐ ধারাবাহিকতাকে অব্যাহত রাখতে পারলে সবচেয়ে বেশি লাভবান হতো এদেশের স্বাধীনতা এবং এদেশের সার্বিক সংগ্রামের কার্যাবলী।

মূলত ঐতিহ্য-সংসদ আয়োজিত উন্মুক্ত অনুষ্ঠানের মধ্যে এসে যারা গভীরভাবে আবেগ এবং আনন্দ অনুভব করেছিলেন, তাঁদের অনেকেই নাম উল্লেখ করা যায়, যেমন- বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী, স্পীকার মির্জা গোলাম হাফিজ, অভিনেতা নাট্যকার ওবায়দুল হক সরকার, কবি আল মাহমুদ, ওস্তাদ আবদুল লতিফ, শিল্পী বেদার উদ্দীন আহমদ, শিল্পী সোহরাব হোসেন, শিল্পী খালিদ হোসেন, শিল্পী এম এ মান্নান, শিল্পী মুজাফা জামান আক্বাসী, শিল্পী ইন্দ্রমোহন রাজবংশী প্রমুখ।

বেশ-কিছু-শিল্পীগোষ্ঠীর উপস্থিতি উন্মুক্ত অনুষ্ঠানের সৌন্দর্য বাড়িয়ে দিয়েছিলো।
এসব শিল্পীগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সাইমুম শিল্পীগোষ্ঠী, ঢাকা; পাঞ্জেরী শিল্পীগোষ্ঠী,
চট্টগ্রাম; প্রত্যয় শিল্পীগোষ্ঠী, রাজশাহী উল্লেখযোগ্য। ঐহিত্য-সংসদ গড়ে তোলার
পেছনে জননেতা আবদুল কাদের মোল্লার ভূমিকাই ছিলো মুখ্য।

আট.

১৯৯৪ ইংরেজি সালের ১ বৈশাখ ১৪০১ প্রতিষ্ঠিত হলো সমন্বিত সাংস্কৃতিক
সংসদ-সসাস। এই প্রথম একটি উদ্যোগ নেয়া হলো সারাদেশের সাহিত্য এবং
সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোকে একত্রিত করার। বাংলাদেশের সার্বিক সাংস্কৃতিক
আন্দোলন গড়ে তোলবার ক্ষেত্রে সসাসের প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

সসাসের প্রথম আহবায়ক হলেন জনাব হামিদুর রহমান আযাদ।

বাংলাদেশের ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলন যথাযথভাবে এগিয়ে নেবার জন্যে
একটি কেন্দ্রীয় সংগঠনের প্রয়োজন ছিলো। সসাস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সেই
প্রয়োজন যথার্থ অর্থে পূরণ হলো।

সারাদেশের ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত সাহিত্য-সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর সমন্বয়ে
সমন্বিত সাংস্কৃতিক সংসদ-সসাস গড়ে উঠলেও এর একটি কেন্দ্রীয় চরিত্র
দাঁড়িয়ে গেছে। এখন প্রয়োজন, সসাসকে যথার্থ একটি কেন্দ্রীয় সংগঠন হিসেবে
প্রতিষ্ঠিত করা। যে-প্রচেষ্টা একদা অব্যাহত রেখেছিলেন এ্যাডভোকেট সাইফুর
রহমান।

নয়.

বাংলাদেশের ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলন এগিয়ে নেবার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ
ভূমিকা রেখে চলেছে নারী অধিকার আন্দোলন, লেখিকা সংসদ এবং রাইয়ান
শিল্পীগোষ্ঠী। নারী অধিকার আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ
অধ্যক্ষ চেমন আরা। লেখিকা সংসদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন মোহতারিমা কামরুন্নেসা
মাকসুদা। অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে রাইয়ান
শিল্পীগোষ্ঠী।

দশ.

১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় এলো ভারতের আশীর্বাদপুঁট এক সরকার। ইসলামী
সংস্কৃতির ওপর সরাসরি হামলা শুরু হয়ে গেলো; হামলা শুরু হলো ইতিহাসের

ওপর, ঐতিহ্যের ওপর। বসে থাকলো না সাংস্কৃতিক যোদ্ধারা, বরং একত্রিত হলো সর্বস্তরের দেশপ্রেমিক-জাতীয়তাবাদী-ইসলামী সংস্কৃতির দুঃসাহসী সৈনিকেরা। শুরু করলো লড়াই। বিপুল বিক্রমে উদ্‌যাপিত হলো- বঙ্গবিজয় বার্ষিকী, পলাশী ট্রাজেডি দিবস, বঙ্গভঙ্গ দিবস, নজরুল জন্মশতবার্ষিকী।

অবিসংবাদিত এই সংগ্রামে নেতৃত্ব দিলেন জনাব মীর কাশেম আলী, আরিফুল হক, গিয়াস কামাল চৌধুরী, ওবায়দুল হক সরকার, আল মাহমুদ, আবদুল হাই শিকদার, মাসুদ মজুমদার, খন্দকার আবদুল মোমেন, মতিউর রহমান শিকদার, ড. আবদুল ওয়াহিদ, এহসানুল মাহবুব জোবায়ের, নূরুল ইসলাম বুলবুল প্রমুখ।

সমস্ত অপশক্তির বিরুদ্ধে বাংলাদেশ গর্জন করে উঠলো। এক লাফে বাংলাদেশের ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রতিষ্ঠার পর্ব অতিক্রম করে, প্রবেশ করলো প্রতিরোধ পর্বে। পর্যুদন্ত একটি জাতির বৃকে সঞ্চারিত হলো আশা ও আশ্বাস।

এ সময়ের ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলন শুধু র‍্যালি এবং সেমিনার করে সারা বাংলাদেশ উন্মাতাল করলো না, উপহার দিলো এক একটি অমোঘ সংকল্পন, একত্রিত করলো রাজনীতিবিদদের, সম্মিলিত করলো সমস্ত দেশপ্রেমিক এবং ইসলামী বুদ্ধিজীবীদের; বুঝিয়ে দিলো স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কত বেশি প্রয়োজন।

এগার.

ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রতিরোধ পর্বের মধ্যেই ঘটে গেছে এক আত্মবিপ্লব। এ দেশের বৃহত্তম ইসলামী আন্দোলন- প্রতিটি জেলা শহরে সাহিত্য বিভাগ, সাংস্কৃতিক বিভাগ এবং শিক্ষা বিভাগ গড়ে তোলবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এবং সারাদেশে এ ব্যাপারে সার্কুলারও জারি করেছে। যাতে বলা হয়েছে:

১ সেপ্টেম্বর, ২০০০ তারিখে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের অধিবেশনে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে- প্রত্যেক জিলায় শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিভাগের জন্য আলাদা-আলাদা দায়িত্বশীল নিয়োগ করতে হবে।'

সার্কুলারটি সারাদেশের জেলা শহরগুলোতে পাঠানো হয়েছে সেক্রেটারি জেনারেল জনাব মতিউর রহমান নিজামী সাহেবের নামে। দায়িত্বশীল নিয়োগের বিষয়টি নিয়ে আমিরাতে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের সঙ্গে এই নিবন্ধকারের ২৯/৮/২০০০ তারিখ বিকেলে একটি আলোচনা হয়। আলোচনার পর নিবন্ধকার বাংলাদেশে ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ব্যাপারে যারপর নাই আশাবাদী হয়ে ওঠে।

শারীরিকগত দিক থেকে এ-ঘোষণাটি মেদহীন বটে। কিন্তু এর ক্ষমতা সহজেই অনুমান করা যায়। সুতরাং এখন এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে বিজয়ী করার জন্যে যে- সাংগঠনিক শক্তির প্রয়োজন তা ঐ নির্দেশনা বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে অচিরেই অর্জিত হ'বে ইনশাআল্লাহ।

বার.

‘জাতীয় নাগরিক ফোরামের’ উদ্বোধনী সম্মেলন ২৮ অক্টোবর, ২০০০, সকাল ৯ টায়, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এ-সম্মেলনে এক হাজারেরও বেশি বুদ্ধিজীবী উপস্থিত হবেন- আশা করা যায়। সভাপতিত্ব করবেন ফোরামের প্রথম সভাপতি বাংলাদেশের প্রধান কবি: কবি আল মাহমুদ।

সারাদেশ থেকে শীর্ষস্থানীয় বুদ্ধিজীবীরা এই প্রথম একত্রিত হচ্ছেন এক মঞ্চে। একত্রিত হচ্ছেন সর্বমহলের প্রতিনিধি হয়ে। ইসলামপন্থী মহলের, জাতীয়তাবাদী মহলের, দেশপ্রেমিক মহলের- সর্বমহলের।

সাংস্কৃতিক আন্দোলন বুদ্ধিবৃত্তিকে উপেক্ষা করতে পারে না বরং বুদ্ধিবৃত্তিই হলো তার নিয়ামক শক্তি। বাংলাদেশের ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের এ-দিকটিও শেষাবধি পূর্ণ হতে চলেছে।

এ প্রবন্ধ যখন প্রকাশিত হবে, তার আগেই অনুষ্ঠিত হয়ে যাবে জাতীয় নাগরিক ফোরামের উদ্বোধনী সম্মেলন- ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে বলা যায়, জাতীয় নাগরিক ফোরাম দেশের স্বাধীনতা রক্ষায়, জনগণের ঐক্য প্রতিষ্ঠায়, অপসংস্কৃতির মূল উৎপাতনে সর্বোপরি আল কোরআনের সমাজ প্রতিষ্ঠায় রাজনৈতিক আন্দোলনের আদর্শিক ধারাকে সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা করবে।

মনে রাখা প্রয়োজন যে, এতোদিনের সমস্ত সাফল্যই হচ্ছে দ্বিতীয় স্তরের সাফল্য। চূড়ান্ত সাফল্যের জন্য একটি জাতীয় সাংস্কৃতিক সংগঠনের এখন প্রয়োজন। এ-প্রয়োজন পূরণ করতে না-পারলে পুনরায় শুরু করবার অভিযানই চালিয়ে যেতে হবে বারবার।

ভের.

বাংলাদেশের ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলন মজবুত করার কাজ এ-পর্যন্ত একেবারে কম হয়নি। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কতোটুকু এগিয়েছে?

এ পরিসংখ্যানে গেলেই সমস্যা। সমস্যা এই কারণে যে, আজো এ-অঙ্গনে নির্মিত হয়নি একটি কালচারাল কমপ্লেক্স এবং কমপ্লেক্স নেই বলে, নেই দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণের সুযোগ, নেই কোনো স্থায়ী মঞ্চ, নেই কোনো নিয়মিত গ্রুপ, নেই কোনো প্রতিরোধ করবার মতো উদ্যোগ।

তার আগে নেই- যেটা আগেই বলেছি- ‘জাতীয় সাংস্কৃতিক সংগঠন’ এবং জাতীয় সাংস্কৃতিক সংগঠন নেই বলে, নেই সাংস্কৃতিক সম্মেলন, নাট্য-সম্মেলন, সাহিত্য-সম্মেলন, সাংস্কৃতিক ফেডারেশন গড়ে তোলবার মতো বৈপ্লবিক উদ্যোগ এবং নেই অস্তুত মোহাম্মদী এবং সওগাতের মতো কোনো সাহিত্য-সাংস্কৃতিক পত্রিকা গড়ে তোলবার আশ্রাণ প্রয়াস।

সুতরাং খুব গভীরভাবে মহাকবি ইকবালের সেই সব বাণীকে আজ স্মরণ করতে হবে। আল্লামা ইকবাল বলেছিলেন :

এক. ‘আমি সবগুলো বড় বড় শহরে সাংস্কৃতিক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব করি।’

দুই. ‘শুধু অর্থনৈতিক সমস্যাই দেশের একমাত্র সমস্যা নয়। সাংস্কৃতিক সমস্যা মুসলমানদের পক্ষে আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ।’

তিন.

‘হারায় গরিমা-সম্মান
মাটি-আকাশ খিলান তলায় :
হারায় যখন সে আত্মজ্ঞান
ধর্ম; কাব্যকলায়।’

একটি সফল ইসলামী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রস্তুতি ও সাবধানতার অনুষঙ্গে

আমি এখানে ইসলামী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের কথা উল্লেখ করেছি। আমি কিন্তু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বলতে পারতাম। তা না বলে আমি বলেছি ইসলামী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের কথা। আসলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং ইসলামী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মানেই যে ইসলামী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে, এমনটি ধারণা করা ঠিক নয়। মরহুম কবি গোলাম মোস্তফার একটি প্রবন্ধ আছে। প্রবন্ধটির নাম হচ্ছে ‘ইসলামী সাহিত্য’। তিনি ঐ প্রবন্ধের মধ্যে অনেক অনেক মূল্যবান কথা বলেছেন। কিন্তু সে-সব কথার মধ্যে একটি মূল্যবান কথা আমাকে সারাজীবন অনিবার্যভাবে অনুপ্রাণিত করে রেখেছে।

ঐ প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, শুধু সাহিত্যের কথা বললেই হতো, কিন্তু বর্তমান সময়ে সাহিত্যের নামে যে-অনাচার চলছে ঐ অনাচারের মোকাবেলায় সংসাহিত্যের কথা বলতে গেলেই আমাদেরকে ইসলামী সাহিত্যের কথা বলতে হবে। যদিও সাহিত্য বললে অসং-সাহিত্যের কথা আসে না, অসং-সাহিত্যের কথা আসাটা ঠিকও নয়, তবুও সাহিত্যের পবিত্রতাকে আলাদাভাবে বুঝানোর জন্যে ইসলামী প্রসঙ্গতা আনতে হয়। তেমনি সংস্কৃতির কথা বলতে গেলেও সংস্কৃতির পবিত্রতার বিষয়টি উচ্চারণের ক্ষেত্রে ইসলামী কথাটা আনা অত্যন্ত প্রয়োজন।

লক্ষ্য নির্ধারণের অনিবার্যতা

ইসলামী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কথাটা উচ্চারিত হলে স্বাভাবিকভাবে সেখানে পবিত্রতা ফুটে ওঠে; এই পবিত্রতাকে তুলে ধরার জন্য আমি ইসলামী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের কথা বলেছি। আমার আসল আলোচনার লক্ষ্য হলো, একটি সফল ইসলামী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কিভাবে করা যায়। আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই, আজকাল সারাদেশে যে-সব ইসলামী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আমরা দেখতে পাচ্ছি।

এই অনুষ্ঠানগুলো ইসলামী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বটে, কিন্তু সফল কিনা তা আমাদের ভেবে দেখতে হবে। ইসলামী সংস্কৃতির নামে যে-সব অনুষ্ঠান হচ্ছে, সে-সব যে, সর্বদিক থেকে সফল হচ্ছে তা কিন্তু নয়। সে-জন্যে সফল ইসলামী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কিভাবে করা যায়, তার জন্য কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত, তার জন্য কি কি সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত, সে-সম্পর্কে আমাদের ধারণা থাকা প্রয়োজন এবং খুবই প্রয়োজন।

ইসলামী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্যে পূর্ব প্রস্তুতির খুবই দরকার এবং এই দরকারের ক্ষেত্রে প্রথম প্রয়োজনীয় বিষয় হচ্ছে, আমরা যে-ইসলামী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি করতে যাচ্ছি তার লক্ষ্য কি হবে তা নির্ধারণ করা। অর্থাৎ আমরা এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কি অর্জন করতে চাই, আমি বা আমরা দর্শক-শ্রোতাদের কি দিতে চাই, এই যে দেওয়ার বিষয়টি, এই বিষয়টিই লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমি একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করতে গেলাম কিন্তু প্রথমেই লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ঠিক করলাম না, যখন আমি লক্ষ্য নির্ধারণ করলাম না, তখন এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আসলে যে-শেষ পর্যন্ত কি অর্জিত হবে, সে-ব্যাপারে একটি বড় ধরনের শূন্যতা তৈরি করলাম।

আমি একবার কোনো একটি বিভাগীয় শহরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উদ্বোধনের জন্যে গেলাম। পুরো অনুষ্ঠানটার মধ্যে যদিও আকর্ষণ ছিলো, কিন্তু যারা সততাকে গ্রাহ্য করে না, যারা আদর্শকে গ্রাহ্য করে না, তাদের অনুষ্ঠানের সঙ্গে আর ঐ বিভাগীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে আমি কোনো পার্থক্য নির্ণয় করতে পারলাম না। মূলত পুরো অনুষ্ঠানটার মধ্য দিয়ে মানুষকে অসম্ভব রকমের উদ্বেলিত করা হলো, আনন্দিত করা হলো কিন্তু ইসলামী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে যা অর্জন করা উচিত ছিলো, তার কোনো কিছুই অর্জন করা গেলো না। কারণ হলো, অনুষ্ঠানের লক্ষ্য নির্ধারণ বলতে যা বোঝায়, তা আগের থেকে করা হয়নি। দেখা গেলো, অনুষ্ঠানের মধ্যে এমন কিছু কৌতুক ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে, যে-কৌতুকের সাথে যৌনতা জড়িয়ে রয়েছে, আদর্শবিরোধী বক্তব্য জড়িয়ে রয়েছে, যে-কৌতুকের মধ্যে হাসাহাসি ছাড়া আর কিছুই নেই বরং ঐ কৌতুক হয়ে উঠেছে অপসংস্কৃতির বাহন এবং যা নৈতিকতা অর্জনের দিকে মোটেই ধাবিত করে না। এই কৌতুক দেখে আমি নিজেও অপসংস্কৃতির একটি প্রভাবকে লক্ষ্য করেছি।

যাই হোক, আমি একটি কথা জোর দিয়ে বলতে চাই, সফল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করবার জন্যে আগেভাগেই লক্ষ্য নির্ধারণ করে নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে রাসূল (সা.) এর যে-নির্দেশনা, সেই নির্দেশনাকেই সামনে রাখতে হবে। রাসূল (সা.) এর সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কিত বক্তব্যের মধ্যে একটি বক্তব্য আমি কোনোক্রমেই

ভুলতে পারি না। যদিও হুবহু আমি ঐ বক্তব্যটি বলতে পারছি না, তবুও ঐ হাদীস থেকে আমি যে-শিক্ষা পেয়েছি, সেই শিক্ষাকে আমি সত্যিই ধরে রেখেছি। এবং রাসূল (সা.) এর ঐ শিক্ষা আমার মাঝে সবসময় কাজ করে। তিনি বলেছেন, যারা শুধুমাত্র মানুষের মনোরঞ্জননের জন্য সাহিত্যচর্চা করে, আল্লাহ রাসূলুলামীন তাদের কাছ থেকে কিছুই গ্রহণ করবেন না। অর্থাৎ যারা মানুষের মনোরঞ্জননের জন্য, মানুষের আনন্দদানের জন্য কাজ করে এবং এই কাজ করতে গিয়ে আল্লাহর তোয়াক্কা করে না, আল্লাহর কথা শ্রবণ করে না, তাদের এই প্রচেষ্টাটা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়ে যায়। এই প্রচেষ্টার কোনো বিনিময় আল্লাহর পক্ষ থেকে পাওয়া যাবে না। সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি শিক্ষা— রাসূলের নির্দেশের মধ্য থেকে আমি পেয়েছি, তা হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যারা সাহিত্যচর্চা করে, মানুষের তোয়াক্কা করে না, আল্লাহ রাসূলুলামীন তাদেরকে দান করবেন উত্তম বিনিময়। এখন আল্লাহর রাসূলের এই হাদীসটিকে যদি সংগঠকরা সামনে রাখেন লক্ষ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে— তাহলে তারা সবসময় সচেতন থাকতে পারবেন। সেই কারণে, সফল ইসলামী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নির্মাণের যথার্থতায় লক্ষ্যের বিষয়টিকে সর্বপ্রথম গুরুত্ব দিতে হবে।

লক্ষ্য অর্জনের জন্য আরো কতোগুলো প্রয়োজনীয় দিক আছে। যেমন অনুষ্ঠানটি আমি কোথায় কোন জায়গায় করবো, সেটি নিয়ে আমাকে ভাবতে হবে। আমি হয়তো একটি নবীনবরণ অনুষ্ঠান করতে যাবো। সেখানে তরুণ আছে, তরুণী আছে এবং তারা ইসলামী সংস্কৃতির সাথে পরিচিত নয়। সেখানে এমন কিছু পরিবেশনা রাখতে হবে, যে-পরিবেশনায় নিছক উল্লাস আছে। যে-উল্লাসে না আছে খারাপ দিক, না আছে ভালো কিছু। তার মানে এমন একটি পরিবেশনা করতে হবে, যাতে মন্দের কিছু নেই, আর চূড়ান্তভাবে হয়তো ভালো কিছুও নেই। বলতে গেলে নিরপেক্ষ একটি হাস্যরসের বিষয় সেখানে থাকতে পারে। হাস্যরসের মধ্য দিয়ে আঙে আঙে এমন জায়গায় আমি অনুষ্ঠানকে পৌঁছে দেবো, যেখানে গেলে স্বাভাবিকভাবে শ্রোতা এবং দর্শকদের মাঝে আবেগ তৈরি হবে। সেই আবেগ আর কিছুই নয়, সেই আবেগ হচ্ছে সত্যের পক্ষের আবেগ, সেই আবেগ হচ্ছে সৌন্দর্যের পক্ষের আবেগ, সেই আবেগ হচ্ছে জাতির স্বার্থের পক্ষের আবেগ, সেই আবেগ হচ্ছে দেশের স্বার্থের পক্ষের আবেগ। যেমন- কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন,

‘সত্যকে আজ হত্যা করে অত্যাচারীর খাঁড়ায়,
নেই করে কেউ সত্য সাধক বুক খুলে আজ দাঁড়ায়’।

নবীনবরণের মতো একটি সফল ইসলামী অনুষ্ঠান নির্মাণের বেলায় কাজী নজরুল ইসলামের কবিতার শিক্ষাকেও আমরা সামনে রাখতে পারি।

যখন চতুর্দিকে অঙ্ককার, মিথ্যা, অপসংস্কৃতি, চরিত্রহীনতা, দুর্নীতি তখন অবশ্যই সমস্ত অঙ্ককারের বিরুদ্ধে- আনন্দদানের মধ্য দিয়ে আমাকে সত্যের কথা বুক টানটান করে বলতে হবে। এই সত্যের কথাকে আমি গানের মধ্যে পরিবেশন করতে পারলাম না, এই সত্যের কথাকে আমি কৌতুকের মধ্য দিয়ে বলতে পারলাম না কিন্তু আমি হয়ত নাটকের মধ্য দিয়ে সেই কথাটি বলতে পারলাম। আসল কথা হলো, আমাকে সত্য কথা বলতে হবে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে বলতে হবে। নাটকের মধ্য দিয়ে যদি আমি বলতে না পারি, তাহলে এমন কিছু গান আমাকে অবশ্যই গাইতে হবে, যে-গানের মধ্য দিয়ে সত্য কথাকে বুক ফুলিয়ে বলা যায়।

একণ্টয়েমি বাদ দেয়ার প্রসঙ্গে

একটি সফল ইসলামী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উদ্যোগের আবশ্যিকতায় নিছক যে-বিষয়টি আমি একান্তভাবে উল্লেখ করতে চাই, সেটি হলো, একটি ইসলামী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সফল করবার জন্য নিজের ইচ্ছা, নিজের একণ্টয়েমিকে সত্যিই বিসর্জন দিতে হবে। অনেক সময় যেটা দেখা যায়, সেটা হলো- একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নির্মাণের জন্যে আমি যেটা বুঝেছি, সেটারই প্রাধান্য দিতে চাই। শ্রোতাদের, দর্শকদের চাহিদার প্রতি লক্ষ্যেপ করি না। নিজেকে মনে করি, 'আমি বড় কোনো শিল্পীগোষ্ঠীর প্রভাবশালী ব্যক্তি, আমি যা বুঝি আমার চেয়ে কেউ-ই আর বেশি বোঝে না'। ঐটি মোটেই ঠিক নয় বরং একটি সফল ইসলামী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নির্মাণের সময় শ্রোতা-দর্শকদের মন-মানসিকতাকে বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে অবশ্যই।

আমি একবার শুনেছিলাম যে, খুব প্রতিষ্ঠিত একটি শিল্পীগোষ্ঠী, আমি নাম বলবো না, কোনো একটি ওয়াজ মাহফিলে গিয়েছে অনুষ্ঠান করতে। ওয়াজ মাহফিলে গিয়ে তারা কৌতুক অভিনয়ের একটি ব্যবস্থা করেছে। এটা তারা করেছিলো কোনো একজন বড় শিল্পীর একণ্টয়েমির কারণে। এখন এই যে কৌতুক অভিনয় করলো, কোথায় করলো, একটি ওয়াজ মাহফিলের মধ্যে। ওয়াজ মাহফিলে সাধারণত কারা আসে, ওয়াজ মাহফিলে সাধারণত তারাই আসে যারা দ্বীনের কথা শুনতে চায়, কোরআন-হাদীসের কথা শুনতে চায় এবং আমাদের দেশের মফস্বল অঞ্চলে শ্রোতা-দর্শকরা এখনো এতোটা তৈরি হয়নি, যারা ওয়াজ মাহফিলের মধ্যে কৌতুক দেখবে। সুতরাং আমি কোথায় কোন প্রোথাম করবো, আমার শ্রোতারা কেমন, আমার দর্শকরা কেমন, সেটা আমাকে ভাবতেই হবে। এই জন্যে দেখা যায় যে, অত্যন্ত পরিশ্রম করে একটি অনুষ্ঠান করা হলো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনো পরিশ্রমই কাজে আসলো না। এর কারণ

হলো, আমরা শ্রোতা-দর্শকদের যে একটা মন-মানসিকতা আছে, তা মূল্যায়ন করতে শিখিনি। এখন এ-ব্যাপারে কি করতে হবে? এ-ব্যাপারে শিল্পীগোষ্ঠীর সকল সদস্যদের নিয়ে আলোচনা করতে হবে এবং সবার পরামর্শ নিয়ে অনুষ্ঠান সাজাতে হবে। যেমন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা প্রোগ্রাম করতে যাচ্ছি, সেখানে কি কি গান, কৌতুক, নাটক করবো জনশক্তির সঙ্গে পরামর্শ করে পূর্বাঙ্কেই সেটি আমাদের ঠিক করতে হবে। তারপর আমাদের শিল্পীগোষ্ঠীগুলোর পরামর্শদাতা, উপদেষ্টামণ্ডলী, পৃষ্ঠপোষকমণ্ডলী এবং তত্ত্বাবধায়কবৃন্দকে একত্রিত করতে হবে, তাদের সামনে আমাদের অনুষ্ঠানকে উপস্থাপন করতে হবে। বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীলরা পরামর্শ দেবার বিষয়ে—আমি মনে করি আমাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বিরাট রহমত। আমরা অনেক সময় বলে থাকি যে, তারাতো সংস্কৃতি বোঝেন না, সে-অবস্থায় আমি প্রায়ই বলে থাকি, ক্রিকেট, ফুটবল খেলা দেখতে যায় সাধারণ মানুষ এবং ঐ যে-চতুর্দিকে অসংখ্য দর্শক থাকে, তারা যদি খেলার মূল্যায়ন করতে না পারবে, তাহলে পয়সা খরচ করে খেলা দেখতে যাবে কেন? তাই দেখা যায়, কোনো চ্যানেলের প্রতিবেদকরা দর্শকদের কাছ থেকে মতামত নিচ্ছে যে, আজকে অমুক দল হেরে গেলো কেনো, আজকে অমুক দল জিতে গেলো কেনো, আপনাদের একটি মূল্যায়ন আমরা জানতে চাই। আসলে যারা দর্শক থাকেন, তারা হয়ত খেলতে পারেন না, কিন্তু তারা খেলার কলাকৌশল সম্পর্কে অবশ্যই কিছু-না-কিছু জানেন। সেখানে একটি কথা খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে, আমি যতোই উন্নতমানের অনুষ্ঠানের নির্মাণ করি না কেনো, সেটা যদি দর্শক-শ্রোতা গ্রহণ না করে, তাহলে সেই উন্নতমানের অনুষ্ঠান করার কোনো অর্থ হয় না। সুতরাং যখন কোথাও অনুষ্ঠান করতে যাবো, সেখানকার দর্শক-শ্রোতাদের মন-মানসিকতাকে অবশ্যই মূল্যায়ন করবো। এই মূল্যায়ন যদি আমি করতে না পারি, এখানে যদি আমার মোহকে কাজে লাগাই, একগুঁয়েমিকে কাজে লাগাই, আমার সিদ্ধান্তকেই প্রাধান্য দেই, তাহলে আমি একটি সফল ইসলামী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নির্মাণের অযোগ্য হয়ে গেলাম। সেই জন্যে যে-বিষয়টির গুরুত্ব দিতে হবে, সেটি হলো, আমি দর্শক-শ্রোতাদের আনন্দ দেবো ঠিকই কিন্তু আমার আদর্শকে বিসর্জন দিয়ে নয়, আমার লক্ষ্যকে বর্জন করে নয়। আমি আমার লক্ষ্য অর্জনে অটল থাকবো, অনড় থাকবো শেষ পর্যন্ত।

সামর্থ্যের দিকে সতর্ক থাকার অভিপ্রায়ে

বস্ত্তত আমি যেখানে অনুষ্ঠান করতে যাবো, সেখানকার অর্থনৈতিক সামর্থ্যের দিকেও খেয়াল রাখবো। আমি সম্মান রেখে বলছি, নাম বলব না, একটি জেলা শহরে বার্ষিক সাংস্কৃতিক উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। আমি শুনলাম যে, সেখানে দেশের শ্রেষ্ঠ শিল্পীগোষ্ঠীগুলো অর্থাৎ সাইমুম, টাইফুন, বিকল্প,

পাঞ্জেরী, সমন্বয়, হেরার রশ্মিকে দাওয়াত করা হয়েছে। আমি সেখানকার আয়োজকদের জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কি শিল্পীগোষ্ঠীগুলোর সমস্ত খরচ বহন করতে পারবেন? তারা আমাকে চমৎকার করে হেসে বললেন- মল্লিক ভাই, আপনি কোনো চিন্তা করবেন না, ইনশাআল্লাহ সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। দুঃখজনক ঘটনা হলো, অধিকাংশ শিল্পীগোষ্ঠীকে তারা পুরো খরচ দিতে পারেননি। ঐ উৎসবে দাওয়াতস্রাণ্ড একটি শিল্পীগোষ্ঠীর খবরও আমি পেলাম যে, তাদেরকে পরিষ্কার বলে দেয়া হয়েছে, ‘আপনাদের যাওয়ার খরচ তো দেয়া সম্ভব হচ্ছে না, আপনারা এসেছিলেন, সেই আসার খরচটাই আমরা দিয়ে দিলাম মাত্র’। চিন্তা করা দরকার, একটি শিল্পীগোষ্ঠীর ১৬/১৭ জন শিল্পী দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যাবে, তাদের ন্যূনতম খরচ কতোটা লাগতে পারে। পরবর্তীতে আরো খবর পেলাম, যে-অঞ্চলের শিল্পীগোষ্ঠী ঐ অঞ্চলেরই ইসলামী ব্যাংকে চাকরী করেছেন এমন এক কর্মকর্তার কাছ থেকে টাকা ঋণ নিয়ে ঐ গোষ্ঠীকে ফিরে যাবার ভাড়া জোগাড় করতে হয়েছে।

স্থানীয় শিল্পীদের গুরুত্ব দেয়ার ঔদার্য্যে

যে-বিষয়টির আরো খেয়াল রাখতে হবে তা হলো, যে-এলাকায় প্রোথাম করতে যাবো, সে-এলাকার শিল্পীদের গুরুত্ব দিতে হবে। হয়তো আমি সাইমুমের পরিচালক, যাচ্ছি নরসিংদী প্রোথাম করতে, তাই আগেভাগেই উচিত হবে- সেখানকার স্থানীয় সংগঠকদের সাথে পরামর্শ করে, সেখানকার পরিবেশ-পরিস্থিতি জেনে নেয়া এবং যে-অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করে নিয়ে যাচ্ছি, স্থানীয় শিল্পীদের সাথে পরামর্শ করে, যদি ঐ পরিকল্পনায় কিছুটা পরিবর্তন আনতে হয়, তাহলে তা অবশ্যই আনতে হবে। আমি জানি যে, সাইমুম বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ শিল্পীগোষ্ঠী, তবুও মনে রাখতে হবে- রাসূল (সা.) যখন কোথাও যেতেন, তখন তিনি স্থানীয় ইমামের পেছনে নামাজ পড়ার আত্মহ প্রকাশ করতেন। কিন্তু স্থানীয় ইমামদার যারা ছিলেন তারাতো রাসূলের পিছনে নামাজ পড়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকতেন। রাসূল (সা.) তাঁদের অনুরোধ উপেক্ষা করতেন না হয়তো। কিন্তু তার এই যে মহান আদর্শ, এই আদর্শের গুরুত্ব দিতে হবে। সময় নিয়ে তাদের গান শুনতে হবে এবং তারা যে-সব গান ভালো গাইতে পারে, সেইসব গান গাওয়ার সুযোগও করে দিতে হবে। মনে রাখতে হবে, যে যতো বড়, সে ততো উদার।

অনুষ্ঠান নির্মাণের দায়িত্ব অর্পণের সতর্কতায়

অনুষ্ঠান নির্মাণের দায়িত্ব আমি কাকে দেবো? এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যথার্থ আদর্শবাদী সাংস্কৃতিক প্রতিভার হাতে যদি অনুষ্ঠান নির্মাণের দায়িত্ব না দেয়া হয়, তাহলে আমি প্রকৃত লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে-কথা বলেছি, ঐ লক্ষ্য অর্জিত হবে না।

আমি একটি উৎসবে গিয়ে লক্ষ্য করলাম যে, পরিচালক ব্যস্ত রয়েছে অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারে। কিন্তু পুরো অনুষ্ঠানের দায়িত্ব দিয়েছে এমন এক ব্যক্তিকে, যে-একসময় ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলো, অথচ পরবর্তী সময়ে ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়ে বের হয়ে গেছে, বের হয়ে গেছে ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের যে-মূলধারা তার সাথে বিদ্রোহ করে। আবার তাকেই উৎসবের মূল অনুষ্ঠান পরিকল্পনার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে এবং প্রশিক্ষণের দায়িত্বও দেয়া হয়েছে। উৎসবতো প্রতিদিন হয় না। প্রতিমাসেও হয় না, বছরে একবার হয়। দেখা গেলো যে, ঐ সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সাবেক নেতা, যে-এখন ইসলামী আদর্শকে মানতে চায় না, ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মূলধারাকে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখায়, সে-তার মতো করে পুরো অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করেছে। উৎসবের পুরো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটা দেখে আমার মনে হলো, আমরা যে-একটি আদর্শিক পরিবেশ গড়ে তুলতে চেয়েছিলাম; সত্য-সুন্দরের দিকে, আল্লাহর দেয়া পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থার দিকে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মানুষকে আকৃষ্ট করতে চেয়েছিলাম, গোটা অনুষ্ঠানের মধ্যে তার কোনো চিহ্ন মাত্র নেই। এই যে-সারা বছরের পরে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত একটি গোষ্ঠীর উৎসব হলো, পুরো উৎসবটাই মাটি হয়ে গেলো। তো এই ধরনের উদ্যোগ কেনো আমরা নেবো? কেনো আমরা আদর্শচ্যুত লোকদের হাতে অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা, পরিচালনা এবং পরিবেশনার সমস্ত দায়িত্ব ছেড়ে দেবো?

অনুষ্ঠানের বিচ্ছিন্নতার প্রয়োজনে

এখন আমি আলোচনা করতে চাই, অনুষ্ঠানের বৈচ্ছিন্ন্য নিয়ে। অনুষ্ঠানের বৈচ্ছিন্ন্য আনার জন্য আগে থেকেই পরিকল্পনা করা দরকার। একটি সফল ইসলামী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নির্মাণের জন্য অনুষ্ঠানের ভেতরে বিষয় বৈচ্ছিন্ন্য আনা অপরিহার্য। বিষয় বৈচ্ছিন্ন্য কেমন? আমি সাইমুম শিল্পীগোষ্ঠীর একটি অনুষ্ঠানে গিয়েছি একবার। সেখানে গিয়ে আমি হামদ, না'ত, দেশের গান, ইসলামী গান পেলাম, হাস্যরসে ভরা কৌতুক পেলাম এবং হঠাৎ করে আমি মুস্তাগিছুর রহমান মুস্তাকের আবৃত্তি পেলাম। এই হলো বিষয় বৈচ্ছিন্ন্যের একটি সংযোগ অর্থাৎ পুরো অনুষ্ঠানের মধ্যে একটি আবৃত্তির সংযোজনা। আমি এই ধরনের আরো সংযোজনকে বৈচ্ছিন্ন্য হিসেবে আখ্যায়িত করতে চাই। সুতরাং দেখতে হবে যে, অনুষ্ঠানের মধ্যে বিভিন্ন স্বাদ আনার উদ্দেশ্যে আরো কি কি সংযোজন করা যায়।

সাইমুমের ঐ অনুষ্ঠানে কিছুক্ষণ পরে দেখি, ইসলামী সাংস্কৃতিক জগতের শ্রেষ্ঠ গণসঙ্গীত শিল্পী আবুল কাশেম ভাই তার গণসঙ্গীত নিয়ে হাজির। তার একটি গণসঙ্গীত পুরো অনুষ্ঠানকে মাতিয়ে তুললো। আমার চোখ দিয়ে পানি ঝরতে লাগলো- অন্ধকারের মধ্যে কেউ লক্ষ্য করল না, আমি সাইমুমের পরিকল্পনাকে

গভীরভাবে গ্রহণ করলাম, আমার এই চোখের অশ্রুর ভেতর দিয়ে সাইমুমের জন্য দোয়া বের হয়ে এলো। আবার এক সময় লক্ষ্য করলাম, সাইমুম তাদের অনুষ্ঠানের সঙ্গে আঞ্চলিক গানেরও ব্যবস্থা করেছে। এই আঞ্চলিক গান একটি বড় ধরনের সম্পদ এবং বৈচিত্র্যময় সংযোজন সন্দেহ নেই। পারতপক্ষে প্রত্যেক জেলার শিল্পীদের উচিত তাদের আঞ্চলিক সুর কাজে লাগানো।

সুতরাং রাজশাহীর শিল্পীদের উচিত প্রতিটি অনুষ্ঠানে গম্ভীরাকে প্রাধান্য দেয়া। রংপুরের শিল্পীদের উচিত প্রতিটি অনুষ্ঠানে ভাওয়াইয়াকে প্রাধান্য দেয়া। সিলেটের শিল্পীদের উচিত তাদের আঞ্চলিক ভাষার গানকে প্রাধান্য দেয়া। সিলেটের একটি অসাধারণ আঞ্চলিক সুর আছে, যে-সুরকে হাছন রাজা সমৃদ্ধ করেছেন। এই সুরে- সব গানে নয়, কোনো কোনো গানে হাছন রাজা পরিপূর্ণ আদর্শকে ধারণ করেছেন। হাছন রাজার ওই সব আদর্শবাহী গানকে সিলেটের শিল্পীরা মন ভরে গাইতে পারে। মোটকথা, আমি বলবো ইসলামী সংস্কৃতির জন্য যারা কাজ করেছেন, তাদের বিভিন্ন বিষয়কে, অনুষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা। উদাহরণ হিসেবে আমি বলতে চাই, শিল্পীসম্রাট আব্বাস উদ্দীনের একটি গান- ‘শোন মুমিন মুসলমান, করি আমি নিবেদন, এই দুনিয়া ফানা হবে জেনে জানো না’।

আমি আজকে সারাদেশে যে-অবস্থাটা লক্ষ্য করছি সেটা হলো, একদিন যে-সব গান বিশ্বাসীদের উদ্ধুদ্ধ করেছিল দেশপ্রেমে, দেশপ্রেমিকদের উদ্ধুদ্ধ করেছিল সত্যের দিকে, আমরা সেই গানগুলোকে গাই না, আমরা নজরুলের, ফররুখের, আব্বাস উদ্দীনের পল্লীগীতি, আব্দুল আলীমের সুন্দর সুন্দর পবিত্র গানগুলো গাই না। কতো চমৎকার চমৎকার গান শিল্পীরা আগের দিনে গেয়েছেন, সেই গানগুলোর দিকে আমরা একেবারেই নজর দেই না।

নজরুলের গান গাওয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত যত্নশীল হওয়া দরকার। নজরুলের গানের সুর কোনোভাবেই যাতে ভুল না হয়, সেজন্যে প্রশিক্ষণ নিতে হবে। প্রশিক্ষণ না নিয়ে নজরুলের গান গাওয়া ঠিক হবে না। নজরুলের গানগুলো যারা গাইতে পারে, কেবল তারাই যেনো গায়। আর এ-জন্য যথার্থ শিল্পী বাছাই করতে হবে।

মুখস্থকরণের অপরিহার্যতা

অনুষ্ঠানে পরিবেশিতব্য গান, অভিনয়, আবৃত্তি এবং অনুষ্ঠানের জন্য বর্ণনাধর্মী যা-কিছু-তা মুখস্থ করে ফেলাতে হবে। একজন উপস্থাপক যদি তার উপস্থাপনাকে মুখস্থ করতে পারে, তাহলে তার উপস্থাপনায় বৈচিত্র্য আসবে। আমি নিজেও অনেক সময় দেখে দেখে গাই, কখনো কখনো শিল্পীদের দেখে গাওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়ে, কিন্তু এটা সঠিক কাজ নয়। একটি সফল ইসলামী অনুষ্ঠানের জন্য যা অপরিহার্য তা হলো, যা কিছু পরিবেশন করবো তা যেনো সত্যিই আমার মুখস্থ

থাকে। পরিবেশনার বিষয়গুলো সমস্ত দাবি-দাওয়াসহ যেমন সুর, তাল, লয়, উচ্চারণের সমস্ত অধিকার পূরণসহ একেবারেই কঠিন না শুধু, আত্মতৃপ্ত করতে হবে, তাহলে পরিবেশনায় প্রাণ সম্ভারিত হবেই। একটি জারী আমি গাইবো, আমার যদি জারী গাইতে হয় এবং তার জন্য যদি বিশ মিনিট সময় দিতেও হয়, তাহলে সেই বিশ মিনিট সময়ের জারী আমাকে মুখস্থ করতে হবে। এ-ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার প্রয়োজন। আমরাতো অহরহ দেখছি রেডিও, টেলিভিশনে বিরাট বিরাট জারী-গম্ভীরা শিল্পীরা গাইছে, বিভিন্ন গান পরিবেশন করছে, সবই তাদের মুখস্থ। আমরা যদি মুখস্থ করার ব্যাপারে প্রতিযোগিতা না করি, তাহলে কিন্তু আমরা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবো।

আব্বাহর রাসূল (সা.) বলেছেন, ‘তুমি যখনই কোনো কাজ করবে, তখনই তা প্রতিযোগিতার মনোভাব নিয়ে করবে’। অর্থাৎ তুমি গবেষণা করবে, যে-বিষয়ে তুমি গবেষণা করবে, ঐ বিষয়ে আর যারা গবেষণা করছে, তাদের চেয়েও যেনো তোমার গবেষণা তুলনামূলকভাবে সুষ্ঠু হয়, তুমি যদি ছাত্র হয়ে থাকো, তাহলে তোমার প্রতিযোগিতা হবে শ্রেষ্ঠ ছাত্রত্বের জন্য, অন্য সবার চেয়ে তোমার রেজাল্ট অবশ্যই ভালো করতে হবে। তেমনি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বেলাও রাসূলের এই আদর্শকে মান্য করতে হবে। ইসলামকে নিশ্চিত করতে চায় যারা, বাতিলকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় যারা, তারা সাংস্কৃতিক পরিবেশনার ক্ষেত্রে যে-পরিশ্রম করে, যে-আন্তরিকতার পরাকাষ্ঠা দেখায়, আমাদের তাদের চেয়েও বেশি পরিশ্রম করতে হবে, বেশি আন্তরিকতার পরিচয় দিতে হবে, বেশি কোরবানি করতে হবে। একটি সফল ইসলামী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য পকেটকে উজাড় করে দিতে হবে এবং পর্যাপ্ত সময়ও দিতে হবে, শ্রম দিতে হবে।

যে-শিল্পীগোষ্ঠী একটি সফল ইসলামী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপহার দিতে চায়, একটু ব্যাখ্যা করে বলতে গেলে বলতে হয়, সেই শিল্পীগোষ্ঠীর প্রত্যেক শিল্পীকে পারতপক্ষে ঐ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য খরচ করতে হবে, ঐ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। আব্বাহর একটি নির্দেশ সূরা বাকারায় এই রকম, ‘ভালো কাজে প্রতিযোগিতা কর’। আমরা চাইছি ইসলামী সংস্কৃতির বিজয়। আমরা চাইছি রাসূলের সংস্কৃতির বিজয়, আমরা চাইছি আব্বাহ রাসূল আলামিনের সংস্কৃতির বিজয়। সুতরাং এই সংগ্রামে আমাদেরকে সর্বশক্তি নিয়োগ করতেই হবে এবং এই সংগ্রামে— ইচ্ছাকৃতভাবে হোক অথবা অনিচ্ছাকৃতভাবে হোক— যতোটুকু ফাঁক থাকবে, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেও ততোটুকু ফাঁক থাকবে।

বহুত একটি সফল ইসলামী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য, অনুষ্ঠান নির্মাণের জন্য আমি মাত্র গুটিকয়েক দিকেরই উল্লেখ করেছি। এই বিষয়ের ওপরে আরো চিন্তা করা যায়, আরো গবেষণা করা যায়। তাই প্রয়োজন ওয়ার্কশপ করার। সুতরাং ওয়ার্কশপ করার উদ্যোগও আমাদের নিতে হবে।

ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଗୌରବ

[ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧିତ]

স্বাণ ও গৌরব

মতিউর রহমান মল্লিক



প্রসঙ্গ কথা

‘ব্রাণ ও গৌরব’ কবির একটি গুরুত্বপূর্ণ পাণ্ডুলিপি। এতে ৭টি প্রবন্ধ রয়েছে। এই পাণ্ডুলিপির অধিকাংশ লেখা বিভিন্ন কবি, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিবর্গদের নিয়ে। এর অধিকাংশ লেখা কবির জীবদ্দশায় বরেন্য, কবিক্ষনি, দৈনিক সংগ্রামসহ বিভিন্ন স্মারক সংকলনে প্রকাশিত হয়। বাকী লেখা কবির ডায়েরি থেকে এই পাণ্ডুলিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পাণ্ডুলিপিটির প্রচ্ছদ ঐকেছেন সাইফ আলি।

সূচিপত্র

ধ্যানমগ্ন এক সাধকের প্রতিচ্ছবি/ ২৫৫

কবি আল মাহমুদ; তাঁর ৬৩তম জন্মদিনের স্মরণ ও গৌরব/ ২৬১

কবি ফারুক মাহমুদ/ ২৬৭

একজন কবি আবদুল হাই শিকদার/ ২৬৯

বেগম ফররুখ : যিনি আমাদের খালান্না ছিলেন/ ২৭৭

আমাদের সিদ্দিক জামাল ভাই/ ২৮৭

প্রিয় কবি গোলাম মোহাম্মদ স্মরণে/ ৩১৮

ধ্যানমগ্ন এক সাধকের প্রতিচ্ছবি

কিছু কিছু মানুষ পৃথিবীতে আসেন অনুপ্রেরণা হয়ে এবং আকাঙ্ক্ষিত আদর্শ হয়ে। তাঁরা আসেন প্রচলিত অন্ধকারের প্রতিবাদ হয়ে, বিদ্রোহ হয়ে। সর্বোপরি সাধ্য ও সাধনার প্রতীক হয়ে, প্রতিচ্ছবি হয়ে। ড. সৈয়দ আলী আশরাফ স্যারকে আমার এসব মহামানুষের একজন বলে মনে হয়েছে প্রথমাবধি।

আলো ও আশ্বাসের মতো ক্ষমতায় তখন মরহুম জিয়াউর রহমান। একটি আন্তর্জাতিক শিক্ষা সম্মেলন হচ্ছে ঢাকায়। শুনলাম সৈয়দ আলী আশরাফ স্যারও সম্মেলনে যোগদান করেছেন: শুনেছিলাম এক কালের মেধাবী ছাত্রনেতা এবং বর্তমানে রেডিও সৌদিতে কর্মরত প্রখ্যাত লেখক-গবেষক এ এন এম সিরাজুল ইসলাম ভাইয়ের কাছে। মনে আছে, সিরাজ ভাই চমৎকার এক প্রস্তাবও দিয়েছিলেন সে সময়:

‘চলেন আলী আশরাফ স্যারের সাথে দেখা করে আসি’।

- “কোন আলী আশরাফ স্যার?’ আমি প্রশ্ন করেছিলাম।

“ঐ যে আলী আহসান স্যারের ভাই ড. আলী আশরাফ স্যার, ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার এক মহান প্রবক্তা”। তিনি জবাব দিয়েছিলেন।

তখন থেকে আলী আহসান স্যারের ‘আমার পূর্ব বাংলা’ আমাকে আকর্ষণ ছুঁয়েছিলো, ছুঁয়েছিলো তাঁর সমুদ্রগামী অসংখ্য গদ্য। তাঁরই ভাই ড. আলী আশরাফ স্যার নিশ্চয়ই আরেক মহান পণ্ডিত। আমিও এক বড় মাপের ভাগ্যবান, না হলে ঐ মহান পণ্ডিতের সাথে দেখা করার প্রস্তাব আমাকে কেনো? এরকম ভাবতে ভাবতে হাজির হলাম সরকারী অতিথি ভবন ‘মেঘনায়’।

সম্ভবত সিরাজ ভাইকে আগে থেকেই আলী আশরাফ স্যার চিনতেন। সেই কারণে কলিং বেলের শব্দ পেয়ে নাকি অতিথি ভবন মেঘনার কোনো খাদেমের আহ্বানে স্যার বাইরে এসেছিলেন, আজ আর মনে নেই- বাইরে এসে সালামের উত্তর দিতে দিতে জিজ্ঞেস করেছিলেন আমার নাম, আমার কাজ কারবার সম্পর্কে।

সিরাজ ভাই সংক্ষেপে এবং সোজাসুজি আমার পরিচয় দিয়েছিলেন:

- ‘গান গায়, কবিতা লেখে, মতিউর রহমান মল্লিক নাম’।

আমি জনাগতভাবে লাজুক হবার কারণে অনেক অনেক ইচ্ছে থাকলেও সেদিন কিছুই জিজ্ঞেস করতে পারিনি স্যারকে। সিরাজ ভাই আর আলী স্যার ঐ আন্তর্জাতিক শিক্ষা সেমিনারে বাংলাদেশের শিক্ষানীতি সম্পর্কে অনেক কথাই

বলেছিলেন। বলেছিলেন মেঘনার দোতলার বারান্দার ঠিক পশ্চিম দিকটায় বসে-বসে।

আমি মুহূর্তশ্রোতার মতো সব কথাই সে-দিন শুনেছিলাম এবং সে দিনই প্রথম আকৃষ্ট হয়েছিলাম স্যারের প্রতি- তাঁর পাণ্ডিত্যের গভীরতা অনুভব করে, তাঁর ভেতরের অসাধারণত্ব অনুভব করে এবং তাঁর বাইরের সাধারণত্ব অনুভব করে। কেননা বিন্দু-বিনীত এই মানুষটিকে বাইরের দিক থেকে সে সময় সাধারণই মনে হয়েছিলো। কিন্তু আলোচনায় প্রবৃত্ত হবার সাথে সাথেই মনে হয়েছিলো, এক অসাধারণ পাণ্ডিত্যের সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য হয়েছে আমার।

দুই.

এখন থেকে ১৪/১৫ বছর আগের কথা। ‘বৃটিশ এয়ার ওয়েজে’ লন্ডন যাচ্ছি। মরহুম মেজর জলিল সাহেবের সাথে দেখা। গভীর আবেগ নিয়ে কিছু কথা বলতে-না-বলতে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি-কী এক গভীর মনোযোগ দিয়ে কোরান অধ্যয়ন করছেন আলী আশরাফ স্যার।

সারাটা পথের প্রায় সবসময়ই আমি তাঁকে কোরান পড়তে দেখে-বিশ্রাম-খাওয়া-দাওয়ার সময় ছাড়া-তেলাওয়াতের মধ্যে নিমজ্জিত থাকতে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

লন্ডনের হিথরোতে নেমে তিনি আমাকে ঠিকানা দিয়েছিলেন। ঠিকানা দিয়েছিলেন কিছুক্ষণ কথা বলার পর এবং যাবার জন্যে বলেছিলেন। আমার অবশ্য যাবার সৌভাগ্য হয়নি বিলেতের দিনগুলোর নানাবিধ তাড়াহুড়োর কারণে।

তিন.

‘এইতো মাত্র ক’টি বছর আগে কবি আল মাহমুদ ভাই বললেন:

- ‘চলো, এক চমৎকার জায়গা থেকে ঘুরে আসি।’

- কোথায়? বললাম আমি।

- আরে, চলোই না মিয়া। বললেন বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় কবি আল মাহমুদ।

কবি আল মাহমুদ ভাইয়ের সাথে গিয়ে পৌছলাম নিউ এলিফ্যান্ট রোডের এক বাড়ির সামনে-সাইনবোর্ডের দিকে চোখ পড়তেই দেখি- ‘ইসলামিক একাডেমী’।

এক যথার্থ ভক্তের মতো কবির পেছনে পেছনে ভেতরে ঢুকলাম। স্যার ইশারায় বসতে বললেন এবং একেবারে কাছে বসতে বললেন।

জিকিরের মাহফিল শুরু হলো। নজর বুলালাম চতুর্দিকে। দীর্ঘদেহী কয়েকজন সাদা মানুষ ধ্যানমগ্ন হয়ে আছেন। আলো নিভে গেলো। কিছুক্ষণ পর-তা পনের মিনিট হবে-স্যার কবি আল মাহমুদ ভাইকে জিজ্ঞেস করলেন:

- 'কি কবি, কিছু কি উপলব্ধি করতে পারছেন?'

- জি একটা আলোর তরঙ্গ যেনো আমার ভেতরে খেলা করছে।

- বললেন আল মাহমুদ ভাই। এবার আমাকেও স্যার ঐ একই প্রশ্ন করলেন।

আমি ভড়কে গেলাম। কিন্তু স্বাভাবিক বললাম:

'না স্যার, কিছু অনুভব করতে পারছি না।'

স্যার উপর্যুক্ত প্রশ্ন আবারও করেছিলেন। কবি আল মাহমুদ ভাই আগের চেয়েও গভীর এবং গভীন জবাব দিয়েছিলেন। কিন্তু আমার জবাব ছিলো একেবারে হতাশ হবার মতো:

'না স্যার কিছুই তো অনুভব করতে পারলাম না।'

ড. সৈয়দ আলী আশরাফ স্যার আর কোনো কথা বললেন না। ডুবে গেলেন অন্য জগতে। পরবর্তী সময়ে স্যারের আরো খানিকটা কাছে গিয়েছিলাম দীপুর মাধ্যমে। ওঁরা একবার জানালো- স্যার তরুণ কবিদের নিয়ে একটা ক্লাশ করতে চান। ক্লাশ করতে চান কবিতার ক্লাশ। খবরটা শুনে আমার আনন্দের সীমা থাকলো না।

স্যার ক্লাশ নিয়েছিলেন অনেকগুলো। বিশ্বসাহিত্য সম্পর্কে, ইসলামী সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানের গভীরতা দেখে অবাক-চোখে তাকিয়ে থাকতাম। তাকিয়ে থাকতাম-ক্লাশ চলাকালে অনেক সময়-স্যারের দিকে। তাকিয়ে-তাকিয়ে নিজেকে সৌভাগ্যবান বলে মনে হতো। মনে হতো-যে-ভাবেই হোক-না-কেনো ছাত্র তো হতে পারলাম তাঁর। সারাজীবন গৌরব করতে পারবো।

ঐ ক্লাশগুলো করার পর একটা ব্যাপারে আমার সন্দেহ রইলো না, আমাদের দেশের ইসলাম-বিরোধী বুদ্ধিজীবী-লেখক-গবেষকদের চেয়ে, পশ্চিমা-বুদ্ধিজীবী-লেখক-গবেষকদের অনেকে অনেক বেশী উদার এবং প্রজ্ঞাবান এবং ইসলামী ইতিহাস-ঐতিহ্য-সাহিত্য-সংস্কৃতির অনেক উপাদান তাঁদের লেখায়, অনেক প্রমাণাদি তাদের রচনায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। বস্তুত এসব প্রমাণাদি ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাঁদের দ্বিধা-দ্বন্দ্বও ছিলো না।

একদিন এক ক্লাশের ফাঁকে আমাদের দশকের সকল কবিদের কাব্যগুলো পড়বার আহ্বাহ প্রকাশ করেছিলেন। পরে শুনেছিলাম আমাদের কাব্যকর্মের ওপর যথার্থ মূল্যায়নেরও তিনি একটি উদ্যোগ নিয়েছেন।

ক্লাশগুলো করার সময় ড. আলী আশরাফ স্যারের সাথে সম্পর্ক আরো বেড়ে যাওয়ায় দুটি লাভ হলো। একটি তাঁর লেখা চেয়ে নিয়ে ‘মাসিক কলমে’ ছাপানোর সুযোগ; দ্বিতীয়টি তার নানাবিধ আয়োজনে অংশগ্রহণের সুযোগ। বিশেষ করে, দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে ঐ নানাবিধ আয়োজনে অংশগ্রহণের বিষয়টা হয়ে উঠেছিলো একেবারে প্রতিদিনের বিষয়ের মতো।

মনে পড়ে, মাসিক কলমে তার একটি দীর্ঘ এবং দুর্দান্ত সাক্ষাৎকার ছেপেছিলাম। ছেপেছিলাম কবি ইশারফের সহযোগিতা নিয়ে। ছেপেছিলাম কিছু কবিতাও। তাঁর সেই প্রতিটি লেখায় আমি আত্মার মুক্তির প্রসঙ্গটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছি এবং এই ব্যাপারে আসিকের গুরুত্বের চেয়ে ভাবের গুরুত্ব দিকেই তাঁর বেশী নজর ছিলো বলে মনে হয়েছে।

একবার এক তরুণ কবি স্যারের বদনাম করতে গিয়ে বলেছিলো স্যার সুদ খান। আমি চমকে উঠেছিলাম এবং দীর্ঘদিন আমি কষ্টও পেয়েছিলাম। কিন্তু যেদিন আমার সুযোগ হয়েছিলো স্যারের ‘সুদ’ কবিতাটি পড়ার, সেইদিন থেকে ঐ তরুণ কবির প্রতি আমার ভারী রকমের অশ্রদ্ধা জায়াত হয়েছিলো। সুদ কবিতাটির কয়েকটি চরণ :

সুদের সাহায্যে কোনো মানুষের
ভালো পাথরের বাড়ি নির্মিত হয়নি!
যে পাথর এমন মসৃণভাবে কাটানো
এবং মিল করে বাঁধানো।
যেনো এর বুক নকশী খোদাই দিয়ে
ঢেকে দেয়া সম্ভবপর হয়।

ড. আলী আশরাফ স্যারকে মরহুম কবি ফররুখ আহমদ গভীরভাবে ভালোবাসতেন। একবার কবিপুত্র কবি আহমদ আখতার বলেছিলো :

“সৈয়দ আলী আশরাফ চাচা সম্পর্কে আব্বা বলতেন, ও আমাদের তিন রকম আত্মীয়” সত্যিই কবি ফররুখ আহমদের পরিবারের প্রতি স্যারের মমত্ব ছিলো আজীবন।

ড. সৈয়দ আলী আশরাফ স্যারের ইন্তেকালের পরে পরম শ্রদ্ধেয় সৈয়দ আলী আহসান স্যার একদিন তাঁর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছিলেন:

“ইসলামের জন্যে যারাই কাজ করছে, তাদের সবার সাথেই ওর একটি আন্তরিক সম্পর্ক ছিলো। এইতো সেদিনও গোলাম আযমের বাসা থেকে দাওয়াত খেয়ে এসেছে।”

আসলেই স্যার ছিলেন বিশ্বনাগরিক। বিশ্ব পরিভ্রমণের মধ্য দিয়ে তিনি অর্জন করেছিলেন এক বিশাল হৃদয়। সেই সঙ্গে একজন যথার্থ মুসলমান হবার কারণে তিনি জয় করতে পেরেছিলেন সমস্ত সংকীর্ণতা।

মাত্র দু'বছর আগে একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রত্যাশা প্রাক্ষণে কাজ শুরু করলাম। আমি নিজে কোনো পণ্ডিত লোক নই বলে পণ্ডিত জ্ঞানী-গুণীদের প্রতি আমার রয়েছে প্রচণ্ড এক আকর্ষণ। সেই কারণে “প্রত্যাশা প্রাক্ষণে”, পর্যায়ক্রমে যাতে, সকল পণ্ডিতদেরই আগমন ঘটে, এবং বারবার ঘটে, সে-প্রচেষ্টা আমার সবসময়ই ছিলো এবং আছে এখনো, থাকবেও ইনশা আল্লাহ।

এক সময় তাই ড. আলী আশরাফ স্যারকে প্রত্যাশা প্রাক্ষণে এনে গর্বিত হতে চেয়েছিলাম। ১৯৯৮-এর ফররুখ জন্মবার্ষিকীর সেমিনারে তিনি এসেছিলেন। এসেছিলেন প্রধান অতিথি হয়ে। এক অসাধারণ বক্তৃতা করেছিলেন সেদিন। তাঁর বক্তৃতায় তিনি মুসলমানদের ইতিহাস-ঐতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতির ব্যাপারে অধিকতর সচেতন হবার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

আমার যতোদূর মনে পড়ে, তিনি একটি বিষয়ের ওপর সবিশেষ জোর দিয়েছিলেন, আত্মসচেতন জাতিই এবং আত্মমর্যাদাসম্পন্ন জাতিই পৃথিবীতে টিকে থাকে। সুতরাং যে-জাতি কেবল মুখাপেক্ষী, সে-জাতির অস্তিত্ব বিপন্ন হবেই। ফররুখ আহমদ তাঁর কাব্য সাধনার মধ্য দিয়ে গোটা জাতিকে আত্মসচেতনতার দিকেই অধিকতর প্রভাবিত করতে চেয়েছিলেন এবং সে ব্যাপারে তিনি সাফল্যও অর্জন করেছিলেন। সাফল্য অর্জন করেছিলেন মর্দে মুমিন ছিলেন বলেই। এই মর্দে মুমিন হবার বিষয়টিতে সেই কারণে- আমাদের সবারই গুরুত্ব দিতে হবে।

স্যারের সেদিনের বক্তৃতায় আমি জাতির বিবেকের কণ্ঠস্বরই শুনতে পেয়েছিলাম, শুনতে পেয়েছিলাম ধ্যানমগ্ন এক সাধকের। সেমিনার শেষ হলো। স্যার ব্যস্ত হয়ে পড়লেন আর একটি প্রোগ্রামের জন্য। আমি ভয়ে ভয়ে সম্মানীর একটি খাম স্যারের হাতে তুলে দিতে চাইলাম। স্যার নিলেন না। গম্ভীরভাবে বললেন :

“বড়াবটাকে আর খারাপ করো না মল্লিক, ঠিক আছে, তোমার প্রতিষ্ঠানের কাজে লাগিও।”

সম্মানী না নেয়ায় আমি একটু লজ্জিত হয়েছিলাম ঠিকই। কিন্তু তার প্রতি আমি আরো ঝুঁকে পড়েছিলাম সেদিন এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম- সৈয়দ আলী আহসান

স্যারের মতো তাঁকেও আমি 'প্রত্যাশা প্রাক্কণের' যাবতীয় আয়োজনের সঙ্গে সন্নিহিত করবো।

হায়! কতো না আশা ও আকাঙ্ক্ষার মতো ঐ আশাও আমার অপূর্ণ রয়ে গেল।

ইংরেজী ভাষা-সাহিত্যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, অনার্সে তিনি ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর রেজাল্টের চেয়েও ছিলেন প্রজ্ঞাবান এবং জ্ঞানী ছিলেন তিনি তাঁর পিএইচডি ডিগ্রির চেয়েও। ড. আলী আশরাফ স্যারের কীর্তি অনেক, অবদান অনেক, কীর্তির একটি দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটি, অবদানের অন্যতম ক্ষেত্র আধুনিক ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার নতুন চিন্তার। তবু তাঁর সকল কীর্তি এবং সকল অবদানের চেয়ে আমি তাঁকে অনেক মহান বলে মনে করি।

কবি আল মাহমুদ

তার ৬৩তম জন্মদিনের ঘ্রাণ ও গৌরব

শাহীন হাসনাতের একটা ফোন পেলাম ৭/৮ তারিখের [জুলাই '৯৯] সকালের দিকে। ফোনটা ছিলো গভীরভাবে আন্দোলিত করার মতো- মল্লিক ভাই, ১১ জুলাই যে, আল মাহমুদ ভাইয়ের জন্মদিন, কিছু একটা করতেই হবে। আমি বললাম, মনে করিয়ে দিয়ে ভালোই করেছো, তা তোমরা কি করতে চাচ্ছে বলা। শাহীন একটু গভীরভাবে জবাব দিলো, সাজজাদ (সাজজাদ হোসাইন খান) ভাইয়ের সাথে কথা হয়েছে- মাহমুদ ভাইয়ের ওপরে, জন্মদিন উপলক্ষে, ক্রোড়পত্র বের করা হবে। আমি বললাম, খুবই ভালো চিন্তা করেছো, এখন আমার কি করতে হবে তাই বলা। শাহীন বললো- একটা লেখা পাঠান, আর প্রত্যাশা প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠান করতে হবে। আমি- আগামীকাল প্রত্যাশা প্রাঙ্গণে এসো বলে, ফোন ছেড়ে দিলাম।

পরের দিন আর শাহীন এলো না। অপেক্ষা করতে করতে ভাবলাম সাংবাদিকতা গোলাচুটের মধ্যে পড়ে গেছে, তা না হলে ওতো ওয়াদার পবিত্রতায় দাগ দেবার মতো ছেলে নয়।

শাহীন এলো না। তবুও শাহিদ মুবিনকে আল মাহমুদ ভাইয়ের জন্মদিনের বিষয়টি বলতেই সদ্যফোটা গন্ধরাজের গুপ্ততার মতো একচিলতে হাসি উপহার দিলো। বুঝে ফেললাম- ওর এতে উৎসাহের স্তম্ভ থাকবে না। কিন্তু আমি পড়লাম অন্য ভাবনায়।

একদিন পরের কথা। আল মাহমুদ ভাই ফোন করে বললেন- শাহীনের সাথে কি তোমার কোনো কথা হয়েছে? বললাম- হয়েছে। মাহমুদ ভাই বললেন- আমার শরীর ভালো না, তাছাড়া ঐদিনটা আমি বাসা ছেড়ে কোথাও যেতে পারবো না।

১০ জুলাই, সন্ধ্যা তখন হয়-হয়। অবশ্য ইতিমধ্যে আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি- যাবো, কবির জন্যে যাবো, দীর্ঘায়ু কামনার জন্যে যাবো, দোয়া আনবার জন্যে যাবো, জাতির জন্যে যাবো, দেশের জন্যে যাবো, ধ্বিনের দিপালীকে দীপান্বিত করার জন্যে যাবো। হ্যাঁ, তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। ভাবলাম- আমি একা যাবো কেনো? সবাইকে নিয়ে যাবো। কিন্তু সময় তো নেই। খবর দেবার মতো সময় নেই। শাহিদ মুবিনকে ডেকে বললাম- এখনই সবগুলো পত্রিকায় প্রেস রিলিজ পাঠাতে হবে। পাঠাতে হবে আল মাহমুদ ভাইয়ের জন্মদিবসের প্রেস রিলিজ। যাতে করে আমাকে কেউ- খবর দিইনি বলে- দোষী করতে না পারে।

১১ জুলাই। ভোরবেলায়ও মুশল ধারায় বৃষ্টি আর বৃষ্টি। তবুও সময় মতো সবগুলো দৈনিকেই গেলো প্রেস রিলিজ। অফিসে এসে প্রধান প্রধান সবগুলো দৈনিকেই আল মাহমুদ ভাইয়ের ৬৩ তম জন্মদিনের অনুষ্ঠানের খবর দেখতে পেলাম।

উল্লেখ্য, কবিকে নিয়ে সবচেয়ে আগে এ বছর লেখা ছেপেছে সংগ্রাম, ইন্ডেক্সাক, ইনক্সিলাব। প্রবন্ধ ও অন্যান্য লেখা।

প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে তরুণ কবিদের নিয়ে প্রত্যাশা প্রাঙ্গণ থেকে, কবির মীরবাগের বাসার দিকে রওয়ানা দিলাম। রওয়ানা দিলাম আমি- মাহফুজুর রহমান আখন্দ, আহমদ বাসির- শোভন, আফসার নিজাম- ফয়েজ রেজা- রেদওয়ানুল হক প্রমুখ কবিবৃন্দ।

অনেকগুলো অস্থায়ী নদী-খাল-কিল পেরিয়ে আমরা যখন শেয়াল- ভেজা হয়ে, মগবাজার ওয়ারলেন্স মোড় পার হচ্ছি তো প্রচণ্ড এক চিৎকার- মল্লিক ভাই- শুনে ঘাড় ফিরিয়ে দেখি, কবি জাকির আবু জাফর। হাসতে হাসতে- ভিজতে ভিজতে বললো, রিকশা ছেড়ে দিলাম? বললাম- দাও, তাড়াতাড়ি উঠে পড়ো।

আল মাহমুদ ভাইয়ের বাসায় পৌঁছে দেখি, নবী ভাই- শাহীন হাসনাত এক মনে নজরুল-গীতি শুনেছে। সম্ভবত আমাদের আগওয়াজ পেয়ে কবি বৈঠকখানায় তাশরিফ আনলেন। তাঁর সঙ্গে এলো ফুটফুটে দুটি শিশু- কবির পৌত্র। একজনের মুখমণ্ডল প্রায় কবির মতো, বিশেষ করে তার চোখ দুটি।

কবিকে দেখে আমরা সব কলকলিয়ে উঠলাম। পরণে তাঁর লুঙ্গী, গায়ে পাজাবী- সাদা পাজাবী। আমাদের কলকলিয়ে ওঠা দেখে, এমনভাবে হাসলেন, যেনো ঘুম থেকে সদ্য জেগে ওঠা এক কিশোর স্বপ্নের ভেতরের হাসিটাকে এখনো হারিয়ে যেতে দেয়নি।

কোনো ভূমিকা ছাড়াই তিনি বলে উঠলেন- এই ভরবৃষ্টির মধ্যে তোমরা এসেছো, কী যে ভালো লাগছে। মায়ের কাছে শুনেছি, আমি যেদিন জন্মেছিলাম সেদিনও নাকি বৃষ্টি নেমেছিলো মুশলধারায়।

জিজ্ঞেস করলাম- কবি ফজল শাহাবুদ্দীন ভাই, আল মুজাহিদী ভাই আসবেন নাকি? বললেন- রাতে আসবে, ফজল তো রাতে এসে খাবে, দাওয়াতই নিয়ে নিয়েছে, আবদুল হাই শিকদার, সাজজাদও আসতে পারে। কিন্তু এই অবিরাম বৃষ্টির মধ্যে কে আসবে বলো?

হঠাৎ কবি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। বললেন, চারটে খেয়ে নাও আগে। তারপরে আর সব।

কবির মুখ থেকে খাবারের প্রসঙ্গ উচ্চারিত হবার আগেই দেখি, টেবিলগুলো ভরে আছে গোশতে-গোশতে, মিষ্টিতে-মিষ্টিতে, লুচিতে-লুচিতে। মূলত কবির

আলীগড় ইউনিভার্সিটিতে পড়া ছেলেরা কোন ফাঁকে যে, ঐ কাজটা করে ফেলেছে কবির সঙ্গে আলাপে নিমজ্জমান ছিলাম বলে বুঝে উঠতে পারিনি। বুঝলাম তখন যখন দেখলাম, বৈঠকঘরের পর্দা সরিয়ে আরো সব কি কি নিয়ে ঢুকছে কবির ঐ আলীগড়ে পড়ুয়া এক ছেলে, তারপর আরেক ছেলে।

ইতোমধ্যে কবি ও প্রাবন্ধিক মাহফুজুর রহমান আখন্দ ঢুকে পড়লো দলবলসহ। হাতে ওর প্রমাণ সাইজের ফুলের ডালি।

আর দেরী না করে আউজ বিল্লাহ.... বিস্মিল্লাহ.... পড়ে ঘোষণা দিলাম- আমাদের প্রাণপ্রিয় কবির জন্য এখন আমরা দোয়া করবো। কিন্তু তার আগে ‘মূলধারা’ পত্রিকার সম্পাদক এবং দৈনিক সংগ্রামের তরুণ সাংবাদিক শাহীন হাসনাত ফুলের তোড়া দিয়ে কবিকে শুভেচ্ছা জানাবে। শাহীন মানলো না, বললো- আগে প্রত্যাশা প্রাক্তন, তারপর অন্যরা। শেষ পর্যন্ত তা-ই হলো। তলিয়ে গেলো আমার ঘোষণার আওয়াজ। শুভেচ্ছা জানাবার পালা শেষ হলো। ফুলে ফুলে ভরে গেলো সারা ঘর। ‘সুগন্ধি ভরপুর’ হলো সবার মনও।

মোনাজাত শুরু করলাম দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে। নবী ভাই সাজিয়ে দিলেন কাতার। এসময় কেনো যেনো মনটা গলে- গেলো। পরিপূর্ণ একত্বাভাব নিয়ে মোনাজাত করলাম-

মোনাজাতের সময় অনেক কবিই ডুকরে ডুকরে কাঁদলো। বুঝতে বাকী থাকলো না, কবি তাঁদের কতোটা আপনজন। কতোটা কাছের মানুষ।

নাও খেয়ে নাও এবার- বারবার বলতে লাগলেন কবি। শুরু করলাম খাওয়া। জাকির আবু জাফর স্বাস্থ্যবান দীর্ঘদেহী এক তরুণ কবির নাম। ওই প্রথম বলে উঠলো বড়ই মজাদার খাবার রে। ফিস্ ফিস্ করে পাশের কবিকে বললাম- বেশী বেশী খাবার জন্যে এটা হলো এক ধরনের ঘোষণা। এর অর্থ হলো- আমি আসলে বেশী খাই না। তবে আজকের রান্নাটা খুব ভালো তো তাই একটু বেশী খাচ্ছি। পাশের কবি বললো- একদম ষাঁটি কথা বলেছেন আপনি।

খাওয়া শেষ, শুরু হলো কবিতা পাঠের আসর। প্রথমে সুযোগ নিলাম আমি। ‘এমন একটা সময়’ অদৃষ্টবাদীদের রান্নাবান্না কাব্যগ্রন্থের একটি বিখ্যাত কবিতা। আমার খুব প্রিয়। এতো প্রিয় যে, এটি দৈনিক ইন্তেকাকে প্রকাশিত হবার সাথে সাথেই আমি মুখস্থ করে ফেলেছিলাম। আবৃত্তি করার আগে, আমি একটি ভূমিকা দিলাম :

তখন ছড়াকার সাজজাদ হোসাইন খান ভাই বিআইসিতে বসেন। তাঁর এবং আবদুল মান্নান তালিব ভাইয়ের সম্পাদনায় ত্রৈমাসিক কলম বেরুচ্ছে এবং সমৃদ্ধ হয়ে বেরুচ্ছে। কবি আল মাহমুদ ভাই রাবেতা আলমে ইসলামীর দাওয়াতে মাত্র হজ্জ করে এসেছেন। বিআইসি কবির হজ্জ-উত্তর সম্বর্ধনার আয়োজন করলো।

আমি সুযোগ পেলাম আবৃত্তির। 'এমন একটা সময়' যেহেতু হজ্বের সময় লেখা এবং আমার মুখস্থ, সেই জন্যে ঐ কবিতাটিই আমি আবৃত্তি করা শুরু করলাম।

দেখি, কবি কাঁদছেন। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন ঠিক তখন, যখন আবৃত্তি করলাম, প্রভু, আমার গতি কোন দিকে/আমি এখন কোথায় যাবো!/বহুকাল যাবত আমার কোনো ঘর নেই।/মানবিক নির্মাণের প্রতি/আমি আত্ম হারিয়েছি। তারপর মিষ্টি বিতরণের সময়, কবি কাছে ডেকে আমাকে মিষ্টি খাওয়ালেন। মিষ্টি খাওয়ালেন এবং আদর করলেন।

কবির ৬৩ তম জন্মদিবসে ঐ কবিতাটিই পড়লাম। আজ আর কাঁদলেন না। ভূমিকা শুনে এবং কবিতা শুনে মৃদু হাসলেন এবং কিছুক্ষণ নিমগ্ন হয়ে থাকলেন।

শাহীন হাসনাভের অনেকগুলো গুণের মধ্যে একটি গুণ হচ্ছে আবৃত্তি করার গুণ। কবির রচিত জেহাদের বিষয় সম্পর্কিত একটি কবিতা ও-ই দরাজকণ্ঠে আবৃত্তি করলো। এক অপার্থিব আনন্দে ফেটে পড়লো কবির।

কিন্তু অবাক করে দিলো কবি জাকির আবু জাফর। কবির শিশুতোষ কবিতা ও একটার পর একটা আবৃত্তি করে যেতে লাগলো। সবাই উপলব্ধি করতে পারলো কবির শিশুতোষ কবিতাও কত অসম্ভব শক্তিশালী। তখন কবিদের করতলে শুরু হয়ে গেলো বৃত্তির মধ্যে তুমুল বৃত্তি!

কবির কবিতা পাঠের একপর্যায়ে মাহফুজুর রহমান আখন্দও কবির একটি ছড়া পড়ে শোনালেন :

মামুদ মিয়া বেকার

তাই বলে কি সাধ নেই তার বিশ্বঘুরে দেখার

আসলে পরে চেকার

বললো হেঁকে মামুদ মিয়া, ট্রেন কি তোমার একার

কবি শুনলেন, তারপর একটুখানি হেসে দিয়ে বললেন- না, এ ছড়াটি আমার না।

মাহফুজ পড়লো বিপদে, আমরা সবাই মুখ চাওয়া-চাওই করতে লাগলাম। কবিতা পাঠে একটা ছন্দপতন এলো। কিন্তু পুষিয়ে দিলো শাহীন। আমিও আবৃত্তি করলাম, 'ফররুখের কবরে কালো শেয়াল'। দেখি কবি আল মাহমুদ ভাই গভীর মনোযোগ দিয়ে কবিতাটি শুনছেন। একেবারে শেষের দিকে গিয়ে যখন পড়লাম-

আমি ফররুখের কবর পেছনে রেখে,

একটা কালো শেয়ালকে তাড়াতে তাড়াতে

বাংলাদেশের মানচিত্রের উপর দিয়ে

আমার কাফন নিয়ে দৌড়াতে লাগলাম।

তখন এক তরুণ কবি-সম্ভবত আহমদ বাসির- জিজ্ঞেস করলো, এই কালো শেয়ালটা কে? একটু ব্যাখ্যা করবেন মাহমুদ ভাই? কবি বললেন, কবিতা একজন পাঠককে বুঝতে হয়, বুঝে নিও। আমি বললাম, ঐ তরুণ কবিকে,

হ্যাঁ, পাঁচাত্তরের এক চিত্র প্রদর্শনীতে
এই শেয়ালটাকে আমি দেখেছিলাম,
কামরুলের কালো শিল্পের মধ্যে
এই ধূর্ত লেজ উঁচিয়ে ছিলো,

এই লাইনগুলো একটু নাড়াচাড়া করলেই শেয়ালটা সম্পর্কে তোমার অস্পষ্টতা দূর হয়ে যাবে। একপর্যায়ে আমরা কবিকে ধরলাম আমাদের উদ্দেশ্যে তাঁর জন্মদিনের এই তাৎপর্যময় মুহূর্তে কিছু বলবার জন্যে। প্রথমে বলতে চাইলেন না। তারপর সারা মুখমণ্ডলে এবং সদ্য রেখে দেয়া চমৎকার দাড়িতে হাত বুলিয়ে নিয়ে বলতে শুরু করলেন- সাহিত্য করতে হলে, শুধু সাহিত্যই করতে হয়, অন্য কিছু করতে গেলে সাহিত্যেরই ক্ষতি হয়। আমার উচিত ছিলো কেবল সাহিত্য করা। কিন্তু জীবিকার তাড়নায় আমি তা পারিনি। তোমরা দোয়া করো, যতোদিন বেঁচে থাকি, সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে যেনো দেশ এবং জাতির খেদমত করে যেতে পারি।

আজকের দিনে, আমার জীবনের সাথী ও বন্ধুদের ভালোবাসায় সত্যিই আমি মুগ্ধ এবং কৃতজ্ঞ।

ঐ বক্তব্য রাখছিলেন যখন, কবিকে দেখাচ্ছিল বিশ্বাস দীপ্ত এবং মহান মানুষের মতো, আল্লাহ তাঁলার এক কৃতজ্ঞ ও পরিতৃপ্ত বান্দার মতো।

আগে থেকেই সাদা পাজাবী, ধবধবে পাজাবী ছিলো গায়ে। আনুষ্ঠানিকতার জন্য আমরা পাজামা পরার অনুরোধ করেছিলাম! সে অনুরোধ তিনি রেখেছিলেন। সেই কারণে পরনে ছিলো সাদা পাজামা। অন্যদিকে সাদা দাড়ি এবং মৃদু হাসির উজ্জ্বলতায় কবিকে লাগছিলো অপূর্ব-অপূর্ব। যেমন অপূর্ব লাগে গন্ধরাজের বাগানের ভেতর দিয়ে যেতে লাগলে, যেমন অপূর্ব লাগে রজনীগন্ধার বাগানের ভেতর দিয়ে যেতে। কবির সাথে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলো সবাই। উঠতে চাচ্ছিল না কেউ-ই। আসলে ওঠার কথা কারুরই মনে ছিলো না। থাকবে কি করে? চতুর্দিকে দুঃশাসন! এই দুঃশাসনের মধ্যে নির্মল-আনন্দ-লগ্ন এখন তো কমই মেলে। আজ মিলেছে বলে কবিদের হুঁশই নেই।

তবুও তাকালাম। তাকালাম ঘড়ির দিকে। দুপুর সাড়ে বারোটো। আর দেরী করলে ভাবীরই সমস্যা। একবোঝা লোকের জন্যে তাঁর আবারও রান্না করতে হবে। সুতরাং কবির কাছে দোয়া চেয়ে বিদায় নিতে গেলে বললেন- শরীরটা ভালো না, কেবল শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করছিলো, তবু তোমরা এলে বলে ভালো লাগছে।

কবির ঘর থেকে বের হচ্ছি, পেছনের দিকে তাকিয়ে দেখি, দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন কবি, চোখে তাঁর অতলান্ত শ্লেহের সমুদ্র।

প্রত্যাশা প্রাক্তনে ফিরে এলাম প্রায় দু'টোর দিকে। বৃষ্টিভাঙে কেবল মনে পড়তে লাগলো জ্ঞানতাপস ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর বাণী- যা হবহ আমার মনে থাকে না কিন্তু তাৎপর্যটা কখনই ভুলতে পারি না :

যে দেশে গুণের কদর হয় না, সে দেশে গুণী জন্মায় না।

প্রাক্তনে তখন কেউ নেই। অন্তত আমার কক্ষে নেই। মনের গভীরে সাঁতার কাটতে লাগলো মন। মনই বলতে লাগলো- সময়মত নজরুলকে কদর করা হয়নি, সময়মতো ফররুখকেও কদর করা হয়নি, সময়মত সম্ভবত আল মাহমুদকেও কদর করা হবে না। কদর করা হবে না কাউকেই। হঠাৎ দেখি চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছে, হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে শিখার মতো উঠে গেছে উর্ধ্বে, দুই ঠোঁটের মধ্যস্থান থেকে বেরিয়ে গেছে তীরের ফলার মতো অঙ্গীকারের শব্দমালা :

কদর কেউ করুক-আর-না করুক, ইনশাআল্লাহ আমি করবো, আমরা করবো।

ইতিমধ্যে কখন যে একটা ফোন এসেছিলো মনে নেই। কিন্তু সেই ফোনের বিষয় যে আমার অঙ্গীকারকে উদ্ধে দিয়েছিলো তাতে সন্দেহ নেই।

ফোনটি ছিলো দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর জাতীয় অধ্যাপক প্রজ্ঞামহীকর সৈয়দ আলী আহসান স্যারের অফিসের। দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটির কবি ইশারফ হোসেন জানালো- কবি আল মাহমুদের জন্মদিনে, আলী আহসান স্যার বাণী দিয়েছেন এবং কবির বাসায় পৌঁছে দিতে বলেছেন। বাসার ঠিকানা কি আপনার কাছে আছে? বললাম- লিখে নাও। ৮/ই মীরবাগ, আর স্যারের বাণীটা একটু বলো না। ও বলতে লাগলো।

“শ্লেহের আল মাহমুদ তোমার জন্মদিনে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রইলো। জীবনের বহু সংকট তুমি অতিক্রম করেছো এবং একমাত্র সততা ও নিষ্ঠার জন্য তুমি অস্বাচ্ছন্দ্য থেকে রক্ষা পেয়েছো। বিনয় এবং বিশ্বাস তোমার জীবনকে সফলকাম করেছে।

আমি তোমার দীর্ঘ, পরিচ্ছন্ন এবং সফলকাম জীবন কামনা করি।” বাণীটা লিখে নিলাম এবং ফোন ছেড়ে দিলাম।

কবি আল মাহমুদ ভাইয়ের জন্মদিনের দ্বাণে ও গৌরবে যে-মন এতোটা উদ্বেলিত হবে, পূর্বাঙ্কে বুঝতে পারিনি।

কবি ফারুক মাহমুদ

কবি ফারুক মাহমুদ ইন্তেকাল করেছেন সম্প্রতি। ২৮ জুন ১৯৯৯। জন্মগ্রহণ করেছিলেন বাগেরহাটের মুন্সাইট গ্রামে। তাঁর আসল নাম কাজী নজরুল ইসলাম। কাজী নজরুল ইসলাম দ্বিতীয় নামে তিনি লেখালেখি শুরু করেছিলেন। ফারুক মাহমুদ নামেই তিনি পরিচিত ছিলেন।

নুরুল আমীন হাইস্কুলের ছাত্র থাকা অবস্থায় বাংলা ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। এ জন্য তাঁকে স্কুল থেকে বহিষ্কার করা হয়।

পরবর্তী সময় তিনি তমদ্দুন মজলিসে যোগদান করেন। এক সময় কবি ফারুক মাহমুদ তমদ্দুন মজলিসের সহসাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ‘ছাত্রশক্তি’ নামে একটি সংগঠন দেশব্যাপী সংগঠিত করার ব্যাপারে তাঁর ভূমিকা সত্যিই অমরনীয়।

দৈনিক, সাপ্তাহিক ও গবেষণামূলক পত্রিকায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে গেছেন।

বিভিন্ন সময়ে তিনি কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ ও চিন্তাবিদ আবুল হাশিম, খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ ও তমদ্দুন মজলিসের প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল আবুল কাশেম, স্বনামধন্য ইসলামী চিন্তাবিদ এবং দার্শনিক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, অধ্যাপক শাহেদ আলী, সাংবাদিক সানাউল্লাহ নূরী, অধ্যাপক আবদুল গফুর প্রমুখের সঙ্গে।

কবি ফারুক মাহমুদ একাধারে ছিলেন— রাজনীতিবিদ, প্রাবন্ধিক, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক এবং সমাজ সংস্কারক। তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি আপসহীন এক লড়াকু লেখক।

তিনি একদা সম্পাদনা করেছিলেন ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা। ‘নয়া দুনিয়া’ নামে একটি প্রকাশনা সংস্থাও তিনি গড়ে তুলেছিলেন। সম্পাদিত সংকলনের মধ্যে ধোলাই কাব্য-ই সবচেয়ে বেশী খ্যাতি অর্জন করেছিলো।

অন্তত দুই ডজন গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন। জাযত মুসলিম আফ্রিকা এবং ইতিহাসের অন্তরালে— তার মধ্যে বেশী খ্যাতি অর্জন করেছে। ‘পোড়া ফসলের গান’ তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ।

মতিউর রহমান মল্লিক রচনাবলী ৫ম খণ্ড ২৬৭

মর্দে মুজাহিদ, মর্দে মুমিন এবং সৎমানুষ হিসেবে তাঁর তুলনা বিরল। তিনি বাগেরহাটেরই কৃতি সন্তান।

তাঁর ইচ্ছেকালে আলোচনা সভা ও দোয়ার মাহফিলের আয়োজন করতে পেরে বাগেরহাট সংস্কৃতিকেন্দ্র গৌরব বোধ করছে এবং তাঁর মাগফেরাত কামনা করছে।

কেন্দ্রের পক্ষ থেকে আজকের আলোচনা সভা ও দোয়ার মাহফিলে অংশগ্রহণ করার জন্য সবাইকে স্বাগত জানাই।

[বাগেরহাট সংস্কৃতিকেন্দ্র আয়োজিত কবির মৃত্যুতে আলোচনা সভা ও দোয়ার মাহফিলে প্রদত্ত বক্তব্য]

একজন কবি আবদুল হাই শিকদার

কবি আবদুল হাই শিকদার, আমাদের সময়ের একজন অন্যতম কবি, একজন ধীমান ব্যক্তিত্ব। কবি আবদুল হাই শিকদারের নামটি উচ্চারিত হলে অন্তত আমি রোমাঞ্চিত হই। আমি যেনো দেখতে পাই একজন আগাগোড়া কবিকে, গবেষককে, সাংবাদিককে, পরিব্রাজককে, সর্বোপরি একজন শ্রেষ্ঠ বন্ধুকে। কবি আবদুল হাই শিকদারের মধ্যে একসঙ্গে অনেকগুলো প্রতিভার সমন্বয় ঘটেছে। এরকমটি সাধারণত পূর্বে আর কোনো কবির মাঝে দেখা যায় না। আমরা প্রায় দেখে থাকি, একজন বড় কবি শুধু মাত্র কবি, কিংবা একজন ঔপন্যাসিক কেবল ঔপন্যাসিকই, একজন গবেষক কেবল সে গবেষকই, কিন্তু আমি মোটেও অভ্যক্তি করছি না যে কবি আবদুল হাই শিকদার সাহিত্য এবং সংস্কৃতির অনেকগুলো ক্ষেত্রে অসাধারণ। যখন তাঁকে কবি হিসেবে দেখি, তখন আমার কাছে মনে হয় সে একজন বড়ো মাপের কবি। যখন তাঁকে গবেষক হিসেবে দেখি, আমার কাছে মনে হয় তিনি উঁচু মানের গবেষক। আমি যখন সাংবাদিক হিসেবে দেখি তাঁকে তখন মনে হয় যে সে অনেক বড়ো একজন সাংবাদিক। আবার যখন তাঁকে শিশু সাহিত্যে হাত দিতে দেখি তখন মনে হয় যে সত্যিই একজন সফল শিশু সাহিত্যিক। আবার সংগ্রামে আন্দোলনে তাঁকে আমরা অগ্রসেনানী হিসেবে পাই। ঐতিহ্যের দিক থেকেও আবদুল হাই শিকদার একজন অত্যন্ত সচেতন মানুষ। আমাদের জাতীয় জীবনের অনেকগুলো বড় বড় বিষয়ে তাঁকে আমরা উদ্যোগী হতে দেখি। আমার কাছে মনে হয়, কিছু মানুষ সময়ের প্রয়োজনকে পূরণ করে। সময়ের প্রয়োজন পূরণ করার সৌভাগ্য সবার হয় না। এই ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে কবি আবদুল হাই শিকদার একজন সৌভাগ্যবান মানুষ। আমাদের দেশে আগে কখনো বঙ্গবিজয় বার্ষিকী পালন হয়নি। আগে কখনো পলাশী দিবস উদ্‌যাপিত হয়নি এবং এই ধরনের আরো অনেকগুলি ঐতিহাসিক দিবস আছে যা আগে কখনো উদ্‌যাপিত হয়নি। এগুলোর উদ্‌যাপনের ক্ষেত্রে আবদুল হাই শিকদার সিপাহসালারের ভূমিকা পালন করেছেন। আমরা উপকৃত হয়েছি, জাতি উপকৃত হয়েছে। একটি কথা আমি আগেভাগেই বলে নিতে চাই যে, আবদুল হাই শিকদার সম্পর্কে একাধারে শুঁছিয়ে কথা আমি বলবো না। আমি তাঁকে সর্বসময়ে যেভাবে অনুভব করি সেইভাবেই আমি তাঁকে উপস্থাপন করতে চাই। আমাদের

সমাজে এমন কিছু মানুষ আছে যাকে বিভিন্ন সময়ে মনে পড়ে, আবদুল হাই শিকদার সে রকম মনে পড়ার যতো মানুষ। তার কবিতার মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যে বৈশিষ্ট্যগুলো আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনের সাথে সম্পৃক্ত। আর যে কবি, দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনের সাথে সম্পৃক্ত সেই কবিকে বারবার মনে পড়াই স্বাভাবিক। আমাদের বাংলাদেশের সীমানার ওপর যখন আক্রমণ হয় তখন আবদুল হাই শিকদারকে মনে পড়ে। আমাদের জাতীয় স্বত্তার ওপরে যখন আক্রমণ হয় তখন আবদুল হাই শিকদারকে মনে পড়ে। আমাদের ঐতিহ্যের ওপর যখন আক্রমণ হয়, তখনও আবদুল হাই শিকদারকে মনে পড়ে। আমাদের জাতীয় কবি নজরুলকে যখন মনে পড়ে, তখন আবদুল হাই শিকদারকে মনে পড়ে। আমাদের জাতীয় জীবনের স্বাতন্ত্র্য এবং বৈশিষ্ট্য নিয়ে যখন আলোচনা হয়, তখন আবদুল হাই শিকদারকে মনে পড়ে। আমাদের জীবনের প্রতিটি সংকটে আবদুল হাই শিকদারকে পাই, যেমন রাজপথে তেমনি তার সাহিত্যচর্চার মধ্য দিয়েও। আমি গত মে এর আগে চুরুলিয়ায় গিয়েছিলাম, নজরুলের গ্রামের বাড়িতে গিয়েছিলাম, কবি আবদুল হাই শিকদার আগেই নজরুলের গ্রামের বাড়িতে গিয়েছিল। সেই গ্রামের বাড়ি দেখার পরে তিনি যে ভ্রমণ কাহিনি লিখেছিলেন, সেই ভ্রমণ কাহিনি আমাকে বিশেষভাবে উপকৃত করেছিলো এবং আমি সেই বইটির মাধ্যমে যেনো নজরুলকে নতুনভাবে দেখেছি। এতো গেলো নজরুলকে নিয়ে ভাবনার ক্ষেত্রকথা। আমার সৌভাগ্য হয়েছিলো একসময় সিরাজ-উদ-দৌলার কবর জিয়ারত করার। কবি আবদুল হাই শিকদার সিরাজ-উদ-দৌলার কবর অনেক আগেই জিয়ারত করেছেন। গোটা মুর্শিদাবাদ তিনি পরিভ্রমণ করেছিলেন এবং এই পরিভ্রমণের পরে তিনি যে ভ্রমণ কাহিনী লিখেছিলেন, সেটিও আমাকে আলোড়িত করেছিলো। কবি আবদুল হাই শিকদারের উচ্চারণ অত্যন্ত স্পষ্ট, কবি আবদুল হাই শিকদারের যা কিছু বলার তা একেবারে খোলামেলা। সেই কারণে আওয়ামী জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে কলম ধরতে তার হাত কাঁপেনি এবং আওয়ামী জাহেলিয়াতের উপরে যতো কবিতা লেখা হয়েছে এবং অন্যান্য লেখালেখি আছে, আমার মনে হয় তার মধ্যে প্রখ্যাত ছড়াকার আবু সালেহর ছড়া, যে ছড়া সারা দেশে ছড়িয়ে গেছে-

ধরা যাবে না ছোঁয়া যাবে না
 বলা যাবে না কথা
 রক্ত দিয়ে পেলাম শালার
 এমন স্বাধীনতা।

আওয়ামী জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে স্পষ্টভাবে লেখালেখি হয়েছে কিন্তু সবচেয়ে বেশি প্রচার পেয়েছে প্রখ্যাত ছড়াকার আবু সালেহর ছড়া। পরবর্তী সময়ে

আওয়ামী জাহেলিয়াতের উপর যে কবিতা কবি আবদুল হাই শিকদার লিখেছে সেই কবিতাই সবচেয়ে বেশি খ্যাতি অর্জন করেছে। কখনো কখনো মনে হয় যে-অনেক আগে আবু সালেহর ছড়া লিখিত হয়েছিলো বলে নতুন প্রজন্মের কাছে ঐ ছড়া আমার মতে অতোটা পরিচিত নেই। বর্তমান প্রজন্মের কাছে আবদুল হাই শিকদারের ‘আওয়ামী জাহেলিয়াত’ কবিতাটি অত্যন্ত পরিচিতি লাভ করেছে এবং আমার মনে হয় আজকে যে বিভিন্ন বক্তৃতায় বক্তারা আওয়ামী জাহেলিয়াত শব্দটি উচ্চারণ করেন এর পেছনে কবি আবদুল হাই শিকদারের আওয়ামী জাহেলিয়াত কবিতার প্রভাব আছে। এখন একটি শব্দ আমরা উচ্চারিত হতে দেখছি যেটির কথা আমি পূর্বেই বলেছি সেই আওয়ামী জাহেলিয়াত। এখন আওয়ামী কথাটি আসলেই জাহেলিয়াত কথাটিও এসে যায়।

এ ধরনের প্রয়োগ আমাদের লেখক সমাজে সচারচর হতে দেখা যায় না। এইতো সেদিন, বাংলা একাডেমিতে এদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে অপতৎপতার নেতৃত্ব দানকারী এক ব্যক্তির পক্ষে যখন প্রস্তাব করার কথা হচ্ছিলো, তখন সোচ্চার হয়েছিলেন কবি আবদুল হাই শিকদার এবং প্রচণ্ড রোষে ফেটে পড়েছিলেন, সেখানে কবি আল মুজাহিদী, বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ একজন কবি তিনিও প্রতিবাদ করেছিলেন। কবি আসাদ বিন হাফিজ প্রতিবাদ করেছিলেন, এই যে আজকে প্রতিবাদ হচ্ছে লেখকদের পক্ষ থেকে, এই প্রতিবাদের জন্য যে সাহস, এ সাহসের ক্ষেত্রে কবি আবদুল হাই শিকদার সব সময় প্রেরণা যুগিয়েছে। আমার সব সময় ভাবতে অবাক লাগে, কবি-সাহিত্যিকের মধ্যে যারা স্বাধীনতাবিরোধী, আমাদের দেশের অস্তিত্বকে স্বীকার করতে চায় না, তারা তাদের নিজেদের অবস্থানে কতোটা সুদৃঢ় এবং কতোটা স্পষ্টবাদী? অন্যদিকে স্বাধীনতার পক্ষে কবি সাহিত্যিকদের মধ্যে সোচ্চার কণ্ঠ খুব কম। কয়েকটা মাত্র সোচ্চার কণ্ঠ আছে। ঐ সোচ্চার কণ্ঠগুলোর মধ্যে আমি বলতে চাই সর্বশ্রেষ্ঠ কণ্ঠস্বর কবি আবদুল হাই শিকদারের।

এটা হয়েছে ঐতিহ্যের প্রতি তার সুদৃঢ় অঙ্গীকার থাকার কারণে। আমি আগেই বলেছি যে কবি আবদুল হাই শিকদার সম্পর্কে আমি শুছিয়ে কিছু বলতে চাই না, সব সময় তাঁকে আমি যেভাবে অনুভব করি, আমি সেভাবেই তাঁকে উপস্থাপন করছি। বন্ধু হিসেবে আমার সৌভাগ্য হয় কবি আবদুল হাই শিকদারের সান্নিধ্যে যাওয়ার এবং কবি আবদুল হাই শিকদারের পরিবারেরই আমি একজন গৃহীত মানুষ। তার সন্তানদের সাথে আমার একটি মমতার সম্পর্ক তৈরি হয়েছে, পরিবারের অন্যান্যদের সাথেও আমার একটি সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। এটা সম্ভব হয়েছে কবি আবদুল হাই শিকদারের ঔদার্যের কারণে। অনেকে তাঁকে

কটুভাষী হিসেবে জানে, অনেকে তাঁকে একজন মেজাজী মানুষ হিসেবে জানে, অন্যভাবেও জানে, কিন্তু আমি তাঁকে তুলনা করি সেই পাহাড়ের সাথে, যে পাহাড়ের বুক চিরে অবিরল ঝর্ণাধারা নেমে আসে। পাহাড়কে বিচূর্ণ করা যায় না, বরঞ্চ পাহাড়ের বুক চিরে নেমে আসা ঝরনাধারায় স্বচ্ছ হওয়া যায়, পিপাসা নিবারণ করা যায়, তৃষ্ণা মিটানো যায়। যারা কবি আবদুল হাই শিকদারের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, তারা কবি আবদুল হাই শিকদারের কোমল সান্নিধ্য লাভ করে। তার সান্নিধ্যের ভেতর থেকে ভালোবাসার ছোঁয়া অনুভব করে। আমি তার মাঝে ঐতিহ্য প্রেম দেখেছি, এই ঐতিহ্য প্রেম তার মাঝে ছিলো বলেই বাংলাদেশের ইতিহাসের দিকে তাঁকে ঘুরে দাঁড়াতে দেখি।

বাংলাদেশের সমস্ত সম্পদের প্রতি তার আকর্ষণ আছে। যেমন বাংলাদেশের ভূগোলটার প্রতি তার অসম্ভব প্রেম। তেমনি বাংলাদেশের ভূগোলের ভেতরে যারাই জনগ্রহণ করেছে বা বেড়ে উঠেছে তাঁদের সবার জন্যেই তার ভেতরে এক অসম্ভব প্রেম কাজ করে। এজন্য তাকে অনুভব করতে দেখি, গভীরভাবে অনুভব করতে দেখি শাহজালাল (রহ.) কে, শাহ মখদুম (রহ.) কে, খানজাহান আলী (রহ.) কে এবং এই পর্যায়ের সমস্ত ব্যক্তিত্বকে, তেমনিভাবে সাহিত্য এবং সংস্কৃতির অঙ্গনেও আমাদের যারা বড়ো বড়ো মহীকুহ ছিলেন, তাঁদের সবার প্রতি তার একটি অসম্ভব ভালোবাসা কাজ করে। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর নাম উচ্চারণ করলেই তাঁকে আমরা আবেগে আপ্ত হতে দেখি। কৌশলে আমাদের নাম উচ্চারণ হতে শুনলেই তাঁকে আমরা আবেগে টাইটুম্ব হতে দেখি। আর নজরুলের কথা তো আলাদা, সাহিত্যে এবং সংস্কৃতির অঙ্গনে তার সাথে চলাফেরার মধ্য দিয়ে বুঝেছি, এই বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বের প্রতি তার একটি আপসহীন আনুগত্য ছিলো বলেই, নজরুলের নাম উচ্চারিত হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গেই মনে হয় যেনো তার কাছে সবার উপরে নজরুল সত্য তাহার উপরে নাই। কিছু কিছু বড়ো বড়ো প্রতিভা কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের জন্য ক্ষতিকর এমন কিছু ঘৃণিত প্রতিভাকে কখনেই বা চিহ্নিত করতে পেরেছি, কিন্তু কবি আবদুল হাই শিকদার ঠিকই চিহ্নিত করতে পেরেছেন। সে জন্যই কবি আবদুল হাই শিকদারের কাছে কাসাল হরিনাথের মর্যাদা অনেক বেশি। সে জন্যই কুষ্টিয়ার কোনো বয়সী মানুষের একটি বক্তব্যকে কবি আবদুল হাই শিকদারকে গভীরভাবে গ্রহণ করতে দেখি। এই মানুষটিকে যদি শুধু মাত্র অর্থনৈতিক চিন্তা থেকে মুক্ত করা যেতো তাহলে এই মানুষটির কাছ থেকে আমরা অসম্ভব ফসল পেতাম সাহিত্যের অঙ্গনে, সংস্কৃতির অঙ্গনে, সাংবাদিকতার অঙ্গনে। আমাদের দুর্ভাগ্য হচ্ছে যে, আমরা প্রতিভা শালীন করতে পারি না। কিন্তু প্রতিভাকে অভিযুক্ত করতে পারি। প্রতিভাকে আমরা সাহায্য করতে পারি না। কিন্তু তাদেরকে দায়ী করতে পারি। এই দুর্ভাগ্য সহসা যাবে বলে মনে হয় না। আমাদের দেশে

সাহিত্য এবং সংস্কৃতির সরকারী এবং বেসরকারী বহু প্রতিষ্ঠান আছে। কিন্তু এমন কোনো প্রতিষ্ঠান তো আমরা দেখি না যেসব প্রতিষ্ঠান প্রতিভাকে লালন করে, আমার সবচেয়ে বড় ব্যথা এখানে।

বহু বছর আগে, বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতি যে ধারা চালু করেছিলেন সে ধারা অগ্রসর হয়নি। আমরা সে ধারাকে অগ্রসর করে নিতে পারিনি। বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতির মেস ছিলো বলেই নজরুলের পক্ষে সেনাবাহিনী থেকে বেরিয়ে এসে সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছিলো, সেনাবাহিনী থেকে বেরিয়ে এসে বঙ্গীয় মুসলিম সমিতির মেসে যদি একটুখানি আশ্রয়ের জায়গা নজরুলের না হতো তাহলে নজরুল যে শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াতেন আজকে তা বুঝতে কষ্ট হয় না। আমরা তো পারলাম না এমন একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে, যেখানে একজন লেখক, একজন কবি-সাহিত্যিক পালিত হতে পারেন এবং কেবল একটি কাজই তিনি করতে পারেন। সে পরিবেশ আমরা তৈরি করে দিতে পারলাম না এবং সে ধরনের প্রতিষ্ঠানও আমরা পেলাম না। যেখান থেকে প্রতিভা লালিত হবে বা আমাদের সমর্থন পাবে। আমি যেটা দেখি সেটা হচ্ছে আমাদের দেশে বিভিন্ন টিম যেভাবে লালিত পালিত হয়, যেভাবে বিভিন্ন খেলাধুলার প্রতিষ্ঠান লালিত পালিত হয়, সেভাবে আমাদের দেশের শিল্পীরা কবিরা সাহিত্যিকরাও লালিত পালিত হওয়ার কথা। আমাদের দেশে একজন খেলোয়াড়ের যে মর্যাদা আছে সামাজিকভাবে একজন লেখকের সেই মর্যাদা নেই। তবু আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে হয় যে খেলোয়াড়রাও জাতীয় সম্পদ। তারা তো লালিত পালিত হবার সুযোগ পাচ্ছে, এজন্য আমরা আনন্দিত। কিন্তু এতোটুকুও যদি লেখকদের ব্যাপারে লালন পালনের সুযোগ আমাদের লেখকরা পেতো, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এগিয়ে আসতো, তাহলে সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এ দৈন্যদশা থাকতো না। যা থেকে আমি বলতে চেয়েছিলাম যে, কবি আবদুল হাই শিকদার এক অসম্ভব প্রতিভার নাম। এই প্রতিভাটি জীবনযাত্রার জন্যে অষ্টপ্রহর হন্যে হয়ে ঘুরছে। এই ঘুরাঘুরিটা যদি তার না করা লাগতো তাহলে তার কাছ থেকে আমরা অনেক কিছু পেতাম। পাশ্চাত্যের লেখকরা সৌভাগ্যবান। এমনকি পশ্চিমবঙ্গের লেখকরাও সৌভাগ্যবান। কোনো কোনো লেখকের জন্যে কোনো কোনো পত্রিকা এতোটা ছাড় দিয়েছে যে, একজন লেখক একটা লেখা দিলেই সারা মাস পরিবারসহ চলবার ব্যবস্থা হয়ে যাচ্ছে। প্রতিভা যেখানে মর্যাদা পায় না, সেখানে প্রতিভা সত্যিকার অর্থে বেড়ে ওঠে না। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ঐ কথাই সত্য। আমি হুবহু বলছি না। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর আলোকে আমার ভাষায় আমি বলছি যে, যেখানে গুণীর কদর হয় না সেখানে গুণীর জন্ম হয় না। আবদুল হাই শিকদার গুণী। এই গুণীর যথার্থ কদর আমরা দিতে পারিনি। তার কদর কে কখন দেবে তা জানি না। একজন লেখককে, আবিষ্কার করা যায়,

তার লেখা পড়ে। অনেক অনেক লেখক আছেন যাদের গ্রন্থ কম কিন্তু লেখার মান অনেক বেশি, কবি আবদুল হাই শিকদার যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার সংখ্যা কম নয়। কিন্তু সে সৃষ্টির মান, অত্যন্ত উঁচু মানের। তার কবিতার ভাষা নৈপুণ্য এবং সৌকার্যমণ্ডিত, তার গদ্যের ভাষা অত্যন্ত সাবলীল। বর্ণাধারার মতোই তার গদ্য প্রবাহমান। কবি আবদুল হাই শিকদারের অনেকগুলো কবিতার বই বেরিয়েছে। কবিতার বইগুলোর সুন্দর সুন্দর নাম, এ নামের মধ্যে আধুনিকতা খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন আশি লক্ষ ভোর, আগুন আমার ভাই, মানব বিজয় কাব্য, রেলিঙ ধরা নদী, যুগলবন্দী ভূগোলময়, এই বধ্যভূমি একদিন স্বদেশ ছিলো ও লোডশেডিং নামিয়াছে। এই কবিতার বইগুলোর মধ্যে আমার সবচেয়ে প্রিয় বই হচ্ছে রেলিঙ ধরা নদী। এই বধ্যভূমি একদিন স্বদেশ ছিলো এটিও আমার খুব প্রিয় একটি কবিতার বই। কিন্তু রেলিঙ ধরা নদী কেনো যেনো আমাকে প্রচণ্ডভাবে টানে। আমি যখন প্রথম এই নামটি দেখেছিলাম, তখন কবির কল্পনার, ব্যাপ্তিকে অনুভব করছিলাম এবং চমকে উঠেছিলাম।

একটি নদীতে যখন ভাটি নামে তখনই এই রেলিঙটা স্পষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু জোয়ারের সময় রেলিঙ অতো স্পষ্ট হয় না। হ্যাঁ, যেসব নদী, কোনো ক্ষেত খামারের ভেতর দিয়ে চলে গেছে, কোনোটা বনাঞ্চলের ভেতর দিয়ে চলে গেছে, সুপারি বাগান, বাঁশ বাগান, নারিকেল বাগানের ভেতর দিয়ে চলে গেছে তখন ভরা নদীর দুই তীরেও রেলিঙকে স্পষ্ট করা যায়, রেলিঙকে প্রত্যক্ষ করা যায়। তখন প্রকৃতি হয়ে যায় নদীর দুই তীরের রেলিঙ, ভাটির সময় নদীর দুই তীরের মাটি রেলিঙ হয়ে যায়, আমি এই ধরনের উপমা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কোথাও পাইনি। একজন পাঠক, তার সমস্ত কবিতারই আমি পাঠক। তার কবিতার মধ্যে বলিষ্ঠ কাব্য উচ্চারণ যেমন আছে তেমনি তার কাব্যপাঠ উপযোগী কবিতা- আবৃত্তিকার যারা তাদের কাছেও কবি আবদুল হাই শিকদারের কবিতা গ্রহণযোগ্য। পাঠযোগ্য কবিতা খুব কি বেশি চোখে পড়ে? ফররুখ আহমদের কবিতার মধ্যে যেমন পাঠগুণ আছে, আবৃত্তি করার সময় কবি ফররুখ আহমদ কতোটা গভীরভাবে উচ্চারিত হন, এ ধরনের পাঠযোগ্য কবিতা, পাঠ্য কবিতা কমই আছে। আবদুল হাই শিকদারের কবিতার পাঠ গ্রাহ্যতা অপূর্বভাবে বিরাজমান। অন্যদিকে ঐতিহ্য প্রেম থাকার কারণে জীবনী গ্রন্থ রচনার দিকে তার ঝোঁক ছিলো এবং আছে। এই কারণে তার কাছ থেকে আমরা মঞ্জুলা ভাসানীর জীবনী পেয়েছি, পেয়েছি মনিরউদ্দীন ইউসুফের জীবনী এবং আমার ধারণা সময় যতো গড়াবে আবদুল হাই শিকদার জীবনী গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে আরো অগ্রসর হবেন। কারণ যার মধ্যে ঐতিহ্য প্রেম একবার শিকড় গেড়েছে তার পক্ষে জীবনী গ্রন্থ রচনার ইতি টানা সম্ভব নয়। কবি আবদুল হাই শিকদারের অনেকগুলো গুণ আছে একথা আমি আগেই স্বীকার করেছি।

কবি আবদুল হাই শিকদারের সমস্ত কবিতার উপরে কথা বলা খুব সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। আমি শুধু এতোটুকুই বলতে চাই একজন বড় মাপের কবির যে সমস্ত শক্তি থাকা দরকার কবিতার জন্যে, আমি স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করছি তার সবটুকুই কবি আবদুল হাই শিকদারের মাঝে বিদ্যমান। আমি তার উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি। তার হাত থেকে সম্পাদিত হয়ে এসেছে আমাদের মিলিত সংগ্রাম মণ্ডলানা ভাসানীর নাম। চল্লিশ বছরের প্রেমের কবিতা তিনি সম্পাদনা করেছেন। আলমগীর কবির সম্পর্কিত একটি গ্রন্থও তিনি সম্পাদনা করেছেন। মনিরউদ্দীন ইউসুফের অগ্রস্থিত কবিতার একটি সংকলন তিনি সম্পাদনা করেছেন। তার কাব্যসুলভ আর একটি সম্পাদিত গ্রন্থের নাম ‘যে আগুন ছড়িয়ে দিলে’। ‘যে আগুন ছড়িয়ে দিলে’ ঐটি কাকে নিয়ে সংকলিত হয়েছে বা সম্পাদিত হয়েছে তা শিরোনামের দিকে তাকালে কিছু বোঝা যায়। কে আগুন ছড়িয়ে দিতে পারে, জনতার হৃদয়ের মধ্যে আসন নিতে পারেন কে? কে এই বাংলাদেশের মানুষকে উৎসাহিত করতে পারেন, উদ্বুদ্ধ করতে পারেন? মনে হয় তার নামটি স্পষ্ট করে বলার দরকার নেই। এ ভাবেই কবি আবদুল হাই শিকদার তার সমস্ত প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে এই দেশকে তুলে ধরতে চেয়েছেন, এই মাটিকে তুলে ধরতে চেয়েছেন, এই দেশ এবং মাটির যে ভৌগলিক সীমানা-সে সীমানাকে উজ্জ্বল করতে চেয়েছেন। সর্বোপরি স্বাধীনতার যে অঙ্গীকার দেশ প্রেমের যে অঙ্গীকার, নিজের বিশ্বাসের প্রতি যে অঙ্গীকার, নিজের দায়িত্ববোধের প্রতি যে তীক্ষ্ণ নজর, কবি আবদুল হাই শিকদার তার সমস্ত লেখালেখির মধ্য দিয়ে এই প্রয়োজনীয় কাজগুলো করেছেন।

কবি আবদুল হাই শিকদার একটি অদ্ভুত গুণের অধিকারী মানুষ, বড় লেখক হওয়ার জন্যে যে গুণ থাকা অতি প্রয়োজনীয় সে প্রয়োজনটি হলো পরিভ্রমণের নেশা, আমি বিভিন্ন সময়ে লক্ষ্য করেছি তার মধ্যে একটি নেশা আছে পৃথিবীকে দেখার নেশা, ঠিক তেমনিভাবে তার মধ্যে আরো একটি নেশা আছে যেটি হলো গবেষণার মধ্য দিয়ে নতুন নতুন দিগন্ত আবিষ্কার করা। আসলে দেশ ভ্রমণের নেশা যার আছে, ঠিক তারই সেই নেশাটিও আছে যে নেশার মধ্য দিয়ে নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কার করা যায়। গবেষণার ভেতর থেকে নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কার করার নেশা যাদের আছে স্বাভাবিকভাবে তাঁদের দেশ পরিভ্রমণের নেশা আছে। অনেকগুলো দেশ তিনি পরিভ্রমণ করেছেন এবং এই দেশ ভ্রমণ করার পর তিনি বসে থাকেননি। তিনি যা কিছু দেখেছেন, যা কিছু উপলব্ধি করেছেন অকপটে বর্ণনা করেছেন। জাপানে গিয়েছেন। একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এভাবে যেখানে যেখানে তিনি গিয়েছেন তা থেকে একেকটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। ঐ যে মহাকবি ইকবাল বলেছিলেন তার একটি কবিতায়

আমি যা দেখেছি তো সবাইকে দেখিয়ে দাও। আমার কাছে মনে হয়েছে যে কবি আবদুল হাই শিকদার যা কিছু দেখেন, যা কিছু দেখার তার সুযোগ হয় তার সবটুকুই তিনি অন্যদেরকেও দেখাতে চান। নিজের ভেতরে সেটা কুক্ষিগত করে রাখেন না। অথবা আমাদের মতো কোনো কোনো দেশ পরিভ্রমণের পর অলসতায় ভোগেন না। এই যে নিজে দেখা এবং অপরকে দেখানোর একটি প্রবণতা এই প্রবণতা সবার মধ্যে থাকে না।

কবি আবদুল হাই শিকদারের সমালোচনা সঙ্গতভাবেই চলতে হবে এই জন্য যে তার প্রতি আমার ভালোবাসা যেমন প্রচণ্ড তেমনি তার প্রতি আমার শ্রদ্ধাও প্রচণ্ড। তিনিও আমাকে সমালোচনা করেন এবং প্রচণ্ড রকমের সমালোচনা করেন আমি তাতে প্রীত হই এবং আমি তাতে উদ্বুদ্ধ হই এবং আমার যা করার দরকার সেই প্রয়োজনীয় কর্তব্যের দিকে নজর দেই, তার মানে তার সমালোচনা আমাকে আমার দিকে তাকাবার ক্ষেত্রে খুব বড় ধরনের সাহায্য করে আমার ব্যাপারে। তার সব চেয়ে বড় সমালোচনা হচ্ছে যে আমার লেখালেখির ক্ষেত্রে যতোটা সময় দেয়া দরকার ততোটা সময় আমি দেই না। আমি অন্যান্য ক্ষেত্রেগুলোতে বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছি, এটি কিন্তু একজন লেখকের জন্য ঠিক নয়। তিনি যে সমালোচনাটি আমাকে করেন আজকে আমিও সেই সমালোচনাটি তার দিকে ঘুরিয়ে দিচ্ছি। আমারও মনে হয় তিনিও এমন এমন অনেকগুলো বিষয়ের সাথে এমনভাবে জড়িয়ে পড়ছেন যে বিষয়গুলোর সাথে জড়িয়ে পড়লে একজন লেখকের সমূহ ক্ষতি হবার সম্ভাবনা রয়েছে। আমি চাই তিনি এইসব বিষয়গুলো এড়িয়ে চলবেন এবং সাহিত্যকর্মে আরো বেশি করে সময় দিবেন এই আশা রেখে আমি তার আরো সাফল্য কামনা করছি।

বেগম ফররুখ যিনি আমাদের খালান্মা ছিলেন

‘বাংলা কাব্য-গগণের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক’ ফররুখ আহমদ ইত্তিকাল করেন ১৯৭৪-এর ১৯ অক্টোবর আর তাঁরই স্ত্রী, তাঁরই ‘লিলি’, ‘লিলি আহমদ’-সৈয়দা তৈয়বা খাতুন ইত্তিকাল করলেন ৯ আগস্ট ১৯৯৮।

কবি তাঁকে নিয়ে, বিয়ে উপলক্ষ্যে ‘উপহার’ নামে চমৎকার একটি কবিতা লিখেছিলেন। কবিতাটি ১৯৪৯-এর অগ্রহায়ণে ‘সওগাত’ পত্রিকায় ছাপা হয়েছিলো। কবিতাটির কয়েকটি চরণ :

নিবিড় বাঁধনে চিরদিন মোরা বাঁধা রবো পাশাপাশি,
দুর্যোগ রাতে, আঘাতে, ব্যাথাতে, ফোটাবো প্রেমের হাসি,
ফোটাবো উর্ধ্বে কন্টকহীন
রাঙা শতদল নিত্য নবীন,
সামনে দাঁড়ালে প্রলয়-ভাঙন পাবো না আমরা ডর,
আমরা দু’জনে ধরার ধূলায় বাঁধব বাসর-ঘর॥

কবি তাঁকে নিয়ে ‘লিলি’ এবং ‘লিলি আহমদ’ নামেও কবিতা লিখেন। ‘লিলি আহমদ’ ছাপা হয় সওগাতে, ‘লিলি’ ছাপায় ‘মুক্তিকা’ পত্রিকা তার বসন্ত সংখ্যায় ১৩৪৯-এ। ‘লিলি’র কিছু অংশ :

তোমার সৌভাগ্য লিলি! চিরদিন নবসূর্য সাথে পার হয়ে কাল মৃত্যু উদিত যে
নবীন আশাতে তাকায় তোমার পানে, তুমি ফিরে চাও তার মুখে, সূর্যের কৌতুক
লিলি, চিরদিন তোমারি কৌতুকে।

কবি স্ত্রীকে কতোটা গভীরভাবে গ্রহণ করেছিলেন তা বোঝার জন্যে উপর্যুক্ত চরণগুলোই যথেষ্ট। অন্যদিকে কবির প্রতিও তাঁর স্ত্রীর ছিলো গভীর অনুরাগ। তার প্রমাণ মেলে কবির স্ত্রীর একটি লেখায়। লেখাটির কিছু অংশ :

আমাদের সংসারে প্রাচুর্য ছিলো না কখনই। কিন্তু সুখ ছিলো, অভাব-অনটনের মধ্যেও সংসারে প্রশান্তি ছিলো। ইচ্ছে করলে তিনি হয়তো আরও বেশী রোজগার করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা চাননি। আভিজাত্যের মোহ তাঁর ছিলো না। তাঁর সংসারের জন্য সম্ভবত আমাদের কারো মধ্যেই সেই মোহ দানা বেঁধে উঠতে পারেনি। তাঁর মতো আমরাও অল্পতেই সন্তুষ্ট হতে পারতাম। সেই কারণেই আমাদের ঘরে সুখ ছিলো অল্পেরে।

তিনি ছিলেন কবি ফররুখ আহমদের খালাতো বোন। তাঁদের বিয়ে হয় ১৯৪২ সালের নভেম্বর মাসে। ঘটকালী করেন তাঁদের দু'জনেরই নানা সৈয়দ মুহম্মদ হুরমতুল্লাহ। হুরমতুল্লাহ সাহেব দু'জনকেই শ্রেহ করতেন। বিশেষ করে নাতনীটিকে তিনি তুলে দিতে চেয়েছিলেন একটি শিক্ষিত ও আদর্শবান মানুষের মতো মানুষের হাতে। তাই তিনি ফররুখ আহমদের বড় ভাই সৈয়দ সিদ্দিক আহমদকে চিঠি লিখেছিলেন :

লিলিকে খুবই ভালোবাসি। তাকে একটি সুপাত্রের হাতে দিয়া যাইতে পারিলে মনের শান্তি হইতো। সে [লিলি] এমন লেখাপড়া শিখিয়াছে যে একটা মুর্খের সহিত বিবাহ হইলে সে জীবনে মড়া হইয়া থাকিবে।

ঐ চিঠিতে তাঁদের নানা আরো লিখেছিলেন :

ফররুখ বর্তমানে কি করিতেছে।

.....।

সে একবার এখানে আসিলে আমি খুব সন্তুষ্ট হইতাম। তাহার যাতায়াত খরচ আমি দিতে প্রস্তুত।

[আবদুল মান্নান সৈয়দ/ফররুখ আহমদ: জীবন ও সাহিত্য]

চিঠিটি পড়লেই বোঝা যায়- তাঁদের নানা একই চিঠিতে নাতনীর জন্যে একটি সুপাত্রের সন্ধান করছেন, আবার ফররুখ আহমদকে যাতায়াত খরচ দিতে চাচ্ছেন তাঁর সাথে দেখা করার জন্য। আসলে ঐ সুপাত্রটি ফররুখ আহমদ ছাড়া আর কেউ নন।

কবির স্ত্রী যে 'সুন্দর লেখাপড়া শিখেছিলেন তাঁর প্রমাণ মেলে ড. জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর সাম্প্রতিক একটি সাক্ষাৎকারে। এই সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন তরুণ সাংবাদিক রাশিদুল ইসলাম। ঐ সাক্ষাৎকারে কবির স্ত্রী সম্পর্কে ড. সিদ্দিকী বলেন :

প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ার সুবোগ না পেলেও তৈয়বার লেখাপড়া সম্পন্ন হয়েছিলো গ্রামের বাড়িতেই। তৈয়বা সুসাহিত্য পাঠ করতেন এবং বাড়িতেই ভালো বইয়ের

সংগ্রহ ছিলো। একজন কবির সহধর্মিণী হিসেবে তিনি যথাযথভাবেই নেপথ্য ভূমিকা পালন করে গেছেন।

ড. সিদ্দিকী আরো বলেন :

তৈয়বা আমার এক বছরের বড় হলেও সে ছিলো আমার খেলার সাথী। যখন তার কথা ভাবি তখন আমার ছেলেবেলার সাথী হিসেবে তাকে মনে পড়ে। আমার দাদা এবং তৈয়বার নানা হুমত উল্লার একান্ত ইচ্ছেয় কবি ফররুখ আহমদের সাথে তার বিয়ে হয়।

উল্লেখ্য ড. সিদ্দিকী (জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস- চ্যান্সেলর) কবি ফররুখ এবং বেগম ফররুখের মামাতো ভাই।

বেগম ফররুখ ছিলেন এক অসাধারণ স্মৃতিশক্তি-সম্পন্ন মানুষ। ফররুখ-পরিবারের সঙ্গে দীর্ঘদিন থেকে জড়িত শাহানা ইসলাম বেগম ফররুখের মেধাশক্তি সম্পর্কে চমৎকার একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন :

‘কিছুদিন আগে এক জানাযায় বেগম ফররুখের সাথে দেখা হয়ে গেল শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের স্ত্রী বেগম জয়নুলের। এরা একসময় পাশাপাশি বাসায় বসবাস করতেন। বেগম ফররুখ দীর্ঘকাল পরে হলেও বেগম জয়নুলকে চিনতে পারলেন এবং নিজের পরিচয় পেশ করলেন কবির পরিচয়ের সাথে যুক্ত করে অর্থাৎ বেগম ফররুখ হিসেবে। বেগম জয়নুল তবুও চিনতে না পারায় ফররুখের কোন্ গ্রন্থের কতো পৃষ্ঠায় জয়নুলের দুর্ভিক্ষের ছবি ছাপা হয়েছিলো তা গড়গড় করে বলে গেলেন বেগম ফররুখ। তখন আর যায় কোথায় বেগম জয়নুল বড় বড় চোখ তুলে তাকিয়ে রইলেন বেগম ফররুখের দিকে।

শাহানা ইসলাম বেগম ফররুখের সচেতনতা সম্পর্কেও অনেক আলোচনা করেছেন এবং বলেছেন :

ইতিহাসের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলার সময় সন-তারিখ-স্থান-পাত্র হুবহু এবং নির্ভুলভাবে বলতে পারতেন তিনি। হুবহু বলতে পারতেন জাতীয় পর্যায়ে ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে কোন্ ধরনের আদর্শের অনুসারী, চিন্তা ও চরিত্রের দিক থেকে কে কেমন।

প্রতিদিনের জাতীয় জীবনের ঘটনাবলী সম্পর্কেও তিনি ওয়াকিবহাল থাকতেন, মন্তব্যও করতেন যথার্থ।

কবির জীবদ্দশায় তো এমন অবস্থা ছিলো যে, ঐ সময়ে সাহিত্যজ্ঞানের কিংবা রাজনৈতিক অঙ্গনের এমন কোনো বিষয় ছিলো না যা কবি জানতেন অথচ খালিমা জানতেন না।

দুই.

কবি ফররুখ আহমদের বাসায় প্রথম যাওয়ার সুযোগ হয়েছিলো কবিপুত্র কবি আহমদ আখতারের সাথে পরিচয়ের সূত্র ধরে। গিয়েছিলাম সম্ভবত কবির মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে কবি-পরিবারকে দাওয়াত দেবার জন্যে।

সেই ১৯৭৭-৭৮ সালের দিকে কবি ফররুখ আহমদের মৃত্যুবার্ষিকী এক বিপরীত উচ্চারণ সাহিত্য সংসদই পালন করতো। কখনো কখনো পালন করতো ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সাথে যৌথ উদ্যোগে। এটা সম্ভব হতো তখন অধ্যাপক আবদুল গফুর স্যারের কারণেই। স্যার ঐ সময়ে ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ছিলেন।

মনে আছে- কবি ফররুখ আহমদের আবেগপ্রবণ ভক্ত হবার কারণে সত্যিই সেদিন আমি আমার ভেতরে ঝড় এবং জলোচ্ছ্বাসের অভিঘাত উপলব্ধি করেছিলাম। কবির বাসায় উপস্থিত হওয়ার আনন্দের উপটোকন আমাকে অভিভূত করে ফেলেছিলো একান্ত গর্ব এবং গৌরবের ঐশ্বর্যে সেদিন।

কবিপুত্র আহমদ আখতারই আমায় পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। সেই সাথে আমরা যে কবির মৃত্যুবার্ষিকী পালন করতে যাচ্ছি- সে খবরটাও পৌঁছে দিয়েছিলেন কবি আহমদ আখতার। সেই প্রথম আমি বেগম ফররুখকে সালাম বলেছিলাম খালান্মা সম্বোধনের মধ্য দিয়ে এবং ফররুখের মৃত্যুবার্ষিকী পালন করতে যাচ্ছি জেনে সেদিন কি যে খুশি হয়েছিলেন খালান্মা তা বোঝানো অসম্ভব। আমাদের জন্যে দোয়াও করেছিলেন তিনি এবং বলেছিলেন :

কবির জন্যে তোমরা কাজ করছো, ভালো লাগছে বাবা, কিছু একটা মুখে না দিয়ে যাবে না কিন্তু। বসো, কথা বলো তোমরা।

হাজারও তাড়া থাকা সত্ত্বেও সেদিন কিছু না খেয়ে উঠতে পারিনি। সেবারের মৃত্যুবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে ফররুখ-পরিবারের অনেককেই পেয়েছিলাম। পেয়েছিলাম কবিপুত্র আখতার-বাচ্চু-তিতু-টিপুকে, কবির দুই জামাতাকে এবং তারপর থেকে অনবরত তাদের পেয়েছি। পেয়েছি কবিপুত্র ডা. মাহমুদ ভাইকেও পরবর্তীতে আমরা বিপরীত উচ্চারণের মাধ্যমেই শুরু করেছিলাম কবি ফররুখের জন্মবার্ষিকী উদযাপন। [এর আগে কোনো সংগঠন কবির জন্মবার্ষিকী উদযাপন করেছে বলে আমার জানা নেই।] এই জন্মবার্ষিকী উদযাপনের উদযোগেও খালান্মা খুব খুশি হয়েছিলেন যে তা বুঝতেও আমাদের বেগ পেতে হয়নি। বিশেষ করে কবিপুত্র সৈয়দ ওয়াহিদুজ্জামান বাচ্চুর [ইসলামী ব্যাংক অফিসার] মাধ্যমে আমরা সেখবর পেয়েছিলাম।

এইভাবে অপরিচয়ের ব্যবধান খুঁচে গিয়েছিলো ফররুখ পরিবার এবং ফররুখ পরিবারের আত্মীয়-স্বজনের অনেকের সাথে। নানা কাজে, নানা প্রয়োজনে দেখা-সাক্ষাৎ করতে গিয়ে কবিপুত্ররা হয়ে গেছেন ভাই, কবি-জামাতারা হয়ে গেছেন দুলাভাই, কবির নাতিরা হয়ে গেছেন ভাগ্নে-মামা। আর খালান্মা হয়ে গেছেন আরো অনেক বেশী খালান্মা।

আমি তখন কলম-সম্পাদনার সাথে যুক্ত। কবি ফররুখের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে কলমে একটা কিছু করা যায় কিনা ভাবছি। কবিপুত্র আহমদ আখতারের চমৎকার সহযোগিতা পেলাম। পেলাম খালান্মার দোয়া। কবির অপ্রকাশিত কবিতা এবং হস্তাক্ষর নিয়ে প্রকাশিত হলো কলমের বিশেষ সংখ্যা।

কলমের এই ছোট্ট বিশেষ সংখ্যাটি প্রকাশিত হবার পর খালান্মার স্নেহ যেনো আমার প্রতি বেড়ে গিয়েছিলো। সম্ভবত কবির সব- ছোটো ছেলে টিপু সৈয়দ মুহম্মদ আবদুহ- সরকারী কলেজের প্রভাষক আমাকে জানিয়েছিলো :

দুটি কারণে আন্মা আপনার ওপর খুব খুশি হয়েছেন। একটা হচ্ছে, আপনি সাহিত্য পত্রিকায় কাজ করেন এই জন্য। অন্যটি হচ্ছে আবার হস্তাক্ষর ছেপেছেন এই জন্যে।

টিপুর কথা শুনে সেদিনই আমি প্রথম অনুভব করেছিলাম খালান্মার কতোটা আত্মহ ছিলো সাহিত্যের প্রতি এবং তাঁর কবির প্রতি।

মেহমান-খ্রিয় কবি ফররুখের সুনাম শুনেছিলাম বহু আগে। কিন্তু খালান্মাও যে অসম্ভব মেহমান-খ্রিয় তা কবি-পরিবারের সাথে যোগাযোগের প্রথম দিন থেকেই প্রত্যক্ষ করেছিলাম। একবার কি এক কাজে গিয়েছি কবি-পরিবারের আজিমপুরের বাসায়। রমজান মাস। দুপুর দুটো-আড়াইটা বাজে তখন। উঠবো উঠবো করছি। খালান্মাই বলে পাঠালেন :

মল্লিককে ইফতার করে যেতে বল। ইফতার না করে যেনো না যায়। খবরদার।

কবিপুত্র আহমদ আখতারও চাপ দিলো থাকার জন্য। কবিপুত্র মোখলেস [মদীনা পত্রিকায় কর্মরত] আরো খানিক জোর দিয়ে বললো :

আপনি ইফতার না করে গেলে আন্মা কিন্তু ভীষণ রাগ করবেন।

আমি হাসতে হাসতে বলেছিলাম :

দুপুর বেলায় ইফতার করবো নাকি? তোমরা দুপুরে ইফতার করো বুঝি! না ভাই কেটে পড়ি, আমার এক ইফতার মাহফিলে বক্তৃতা করতে হবে, দাওয়াত আছে।

খালান্মা আবারও ভেতর থেকে খবর পাঠালেন থেকে যাবার জন্যে । আমার আর সাহস হলো না চলে আসার । বক্তৃতা-টঙ্কুতা গেলো ভেঙে । আমি মেতে রইলাম টিপু-তিতুদের নিয়ে, মামাকে নিয়ে । সেই রাত অবধি ।

সেদিন কতোকিছু যে খেয়েছিলাম মনে নেই । তবে খেজুরের গুড়ের পায়সের [খালান্মার নিজের হাতের তৈরী] কথা আজো আমি ভুলতে পারিনি । হায়রে কী সুবাসিত আর সুস্বাদু ছিলো সেই পায়েশ ।

শুধু রমজান মাসে নয়, অন্যান্য মাসেও, বিশেষ করে বিকেলের দিকে তৈরী পাওয়া যেতো এই পায়েশ । পরে শুনেছিলাম এটা নাকি কবি-পরিবারের একটি বৈশিষ্ট্য । কবির জীবদ্দশায় বিকেলের মেহমানদের জন্যে খালান্মা আগে থেকেই তৈরী করে [আলাদা আলাদা পিরিচে] রেখে দিতেন খেজুর গুড়ের এই পায়েশ । মেহমানরা স্বতন্ত্র তৃপ্তি নিয়ে এই পায়েশ খেতো ।

মেহমানদারী করাটা ছিলো খালান্মার স্বভাব । একবার শাহানা আপা বলেছিলেন : কবি-পরিবারের চরম অনটনের দিনেও মেহমানদারী ছিলো পূর্ববৎ বহাল । মেহমানরা বুঝতেই পারতেন না যে, যে সময় বাইরে চলছে মেহমানদারীর ধুম, সে-সময় ভেতরে চলছে অনাহারের নীরব সাধনা ।

খালান্মা ছিলেন ধৈর্য এবং সংযমের মূর্ত প্রতীক । একবার আমার আর কবিপুত্র কবি আহমদ আখতারের খেয়াল চাপলো- আমরা টাঙ্গাইলের মধুপুরের গড় ভ্রমণ করবো । যাহা বাহান্ন তাহাই তিগ্লান্ন । গেলাম মধুপুরের গড়ে । প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে কেটে গেলো সারাদিন । টাঙ্গাইল ফিরতে ফিরতে রাত । ঢাকাগামী একটা বাসও নেই । এদিকে আমিও বলে যাইনি, কবিপুত্রও বলে যায়নি । ঢাকায় এলাম পরের দিন । ভয়ে আমি আর আজিমপুরের দিকে মাড়াই না । খালান্মা এইবার পেলো আদৌ আস্ত রাখবেন না । কিন্তু বান্দাভাবে এক আর আল্লা ভাবেন আর এক । কদিন যেতে না যেতে বাচ্চুর কাছে খবর পেলাম : আপনার কাণ্ড দেখে আন্মা হাসাহাসি করেছেন । বেড়াতে যেতে বলেছেন । হ্যাঁ, বেড়াতে গিয়েছিলাম অবশ্য কিন্তু খালান্মা একবারের জন্যও মধুপুরের প্রসঙ্গ তোলেননি ।

ঔদার্যে ভরা ছিলো খালান্মার চরিত্র । কবি বুলবুল সরওয়ার আর আমি একবার সিদ্ধান্ত করলাম, কবি ফররুখের গ্রামের বাড়ি দেখতে যাবো । যাবো মাগুরার মুহম্মদপুরের মাঝাইলে । যাবো কবির বড় ভাইকে দেখতে । ফরিদপুর শহরে ।

কবি-পরিবারের কাউকে সাথে নিলে সোনায় সোহাগা । ঠিক করলাম টিপুকেই সাথে নেবো । খালান্মা মোটেই না করলেন না । আমরা তিনজন কবির গ্রাম তই তই করে ঘুরেছিলাম সেবার । কবির বড় জামাইয়ের বাড়ি, কবির বড় ভাইয়ের বাসায়ও সেবার আমরা বেড়িয়েছিলাম । খালান্মা খুব খুশি হয়েছিলেন ।

আমরা কবি ফররুখের বড় ভাই সৈয়দ সিদ্দিক আহমদ সাহেবের একটি সাক্ষাৎকারও নিয়েছিলাম। জনাব শাহাবুদ্দীন আহমদ সম্পাদিত ‘ফররুখ আহমদ: ব্যক্তি ও কবি’ গ্রন্থে মুদ্রিত ‘আমার ভাই ফররুখ’ নিবন্ধটি সেই সাক্ষাৎকারেরই গদ্যরূপ।

কবি বুলবুল সরওয়ার ঐ ভ্রমণকে কেন্দ্র করে চমৎকার একটি প্রতিবেদনও তৈরি করেছিলেন। পরে ছাপাও হয়েছিলো সেটি।

খালান্মা কবি ফররুখের জন্যে কতোটা নিবেদিতা ছিলেন তা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে বুঝতে পারিনি তা নয়, তবু তা গভীরভাবে আরো একবার উপলব্ধি করেছিলাম। উপলব্ধি করেছিলাম কবির ‘দিলরুবা’ প্রকাশিত হবার পর।

দিলরুবা কাব্যগ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯৪ সালে। প্রকাশ করেন চট্টগ্রাম সংস্কৃতি কেন্দ্রের পক্ষে [কেন্দ্রের সভাপতি] আমীরুল ইসলাম।

গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার কিছুদিনের মধ্যেই ঢাকায় এলেন চট্টগ্রাম সংস্কৃতি কেন্দ্রের অন্যতম কর্মকর্তা জনাব মুস্তাক ভাই। মুস্তাক ভাই সরাসরি বলে বসলেন :

‘দিলরুবা’ বেগম ফররুখের হাতেই প্রথম তুলে দিতে চাই। সঙ্গে থাকতে হবে আপনাকে।

মুস্তাক ভাই নামকরা আবৃত্তিকার। চট্টগ্রামের মানুষ হলেনও ডা. স.ম. রফিক ভাইয়ের মতো চমৎকার উচ্চারণে কথা বলেন। আমি তার প্রস্তাবে সাথে সাথে রাজী হয়ে গেলাম এই বলে :

কবির দিলরুবার হাতে কবির দিলরুবা। মজাই হবে চলুন। তাছাড়া ঘটনাটি নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক। সুতরাং যেতেই হবে।

আমরা আজিমপুরের বাসায় পৌছেই খোশ খবরটা ছড়িয়ে দিলাম। ঈদের আনন্দ বয়ে গেল সারা বাসায়।

কিছুক্ষণ পরেই খালান্মা এলেন। দুধের মত সাদা শাড়ী পরনে, মাথায় কাপড় এমনভাবে টেনে দিয়েছেন যে চুল দেখা যায় না। শালীনতার, পবিত্রতার এক পরম উদাহরণ আমাদের সামনে এসে বসলেন। আমি গভীরতর শ্রদ্ধার কারণে মুখের দিকে তাকাতে পারছিলাম না।

মুস্তাক ভাই খালান্মার হাতে ‘দিলরুবা’ তুলে দিলেন। আমি খালান্মার মুখের ভাষা উদ্ধারের জন্যে দৃষ্টি উঁচু করে ধরলাম। দেখলাম- খালান্মার সারা মুখে এক জ্বালাতী হাসি ছড়িয়ে গেছে। দিলরুবা উল্টে পাশ্টে দেখছেন। হঠাৎ লক্ষ্য

করলাম খালান্ধার ফর্সা মুখে হালকা হালকা রক্তিম আভা। বুঝলাম কবির কোনো মধুরতর স্মৃতি এখন খালান্ধাকে উদ্বেলিত করে তুলেছে। এভাবে কয়েকটা মুহূর্ত মাত্র কেটে গেলো— খালান্ধা মুখ খুললেন :

দিলরুবা কবির জীবদ্দশায়ই প্রকাশিত হোক, খুবই আশা করতেন।
আল্লামার স্তকরিয়া শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হলো।

আরো অনেক কথা হলো। মোস্তাক ভাইয়ের খবর নিলেন, চট্টগ্রাম সংস্কৃতি কেন্দ্রের খবর নিলেন। তারপর ভেতরের দিকে গেলেন। যেতে যেতে বললেন :

বসো, নাস্তা পাঠাচ্ছি।

খালান্ধা এই প্রথম সরাসরি সামনে এলেন। মানুষটি ছিলেন সাচ্চা এবং পর্দানশীন; নামাজী এবং ধর্মপরায়ণ। যার-তার সামনে তাঁকে কখনোই আসতে দেখিনি। সম্ভবত দিলরুবা প্রকাশ এবং তা হস্তান্তরের ঘটনার মধ্য দিয়ে আমরা তাঁকে যথার্থ আন্থা হিসেবে পেয়েছিলাম।

শেষবার যখন খালান্ধার সাথে আমার সরাসরি কথা হয়েছিল তখন আমি ভীষণ অসুস্থ। কি এক কাজে বাসায় গিয়েছি। বাচ্চুর সাথে কথা হচ্ছে। কিন্তু কাশির ধমকে কথাই বলতে পারছি না। বসা আর হলো না, শুয়ে পড়লাম। খালান্ধা এলেন। আমার ভাঙ্গা শরীর দেখে আঁতকে উঠলেন। অনেকক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকলেন— সন্তানের কাছে যা যেমন দাঁড়িয়ে থাকে এবং তারপরে খুব করে বললেন ডাক্তারের কাছে যেতে।

খালান্ধার বাসা থেকে আসার পর আমার অফিসে যাওয়া হয়নি আর। ভর্তি হতে হয়েছিলো মহাখালী বন্ধব্যায়ী হাসপাতালে। ভর্তি হয়েছিলাম টি.বি-র যথার্থ রুগী হিসেবে। সৈয়দ ওয়াহিদুজ্জামান বাচ্চু-কবিপুত্র- আমাকে বলেছে : আমি অসুস্থ হয়ে যাবার পর খালান্ধা আমাকে নিয়ে দৃষ্টিভ্রম করতেন এবং দোয়াও করতেন।

দোয়া করতেন আমার জন্যে আমার মা- তিনি চলে গেছেন। দোয়া করতেন আমার জন্যে আমার এই খালান্ধা তিনিও চলে গেলেন। হায়! দোয়া করার মানুষগুলো কি সবাই একে একে এইভাবে চলে যাবেন?

তিন.

১০ আগস্ট সকাল ৭টায় সৈয়দ আলী আশরাফ স্যারের লাশ আসার কথা ছিলো জিয়া-বিমান-বন্দরে। ফজর পড়ে যাবো যাবো করছি। হঠাৎ কলিং বেল

বেজে উঠলে গेट খুলতে গিয়ে দেখি- অধ্যাপক খন্দকার আবদুল মোমেন ভাই দাঁড়ানো। প্রেক্ষণ সম্পাদক আবদুল মোমেন ভাইয়ের স্নান মুখ। বললেন :

আহমদ আখতারের আত্মা ইন্তেকাল করেছেন গতকাল মাগরিবে। আজ জানাজা। নাজমুল ভাই খবর দিয়েছেন। অধ্যাপক সাহেবের পি.এ. নাজমুল ভাই।

আমার আর আমার শ্রদ্ধেয় স্যারের লাশ আনতে যাওয়া হলো না। ছুটলাম আজিমপুর। খালান্ধার বাসায় পৌছলাম সকাল ৭টার কিছু পরে। বৈঠকখানায় ঢুকতেই বাচ্চুর সাথে চোখাচোখি হলো। কাঁদতে কাঁদতে চোখ লাল হয়ে গেছে। জড়িয়ে ধরলাম ওকে। ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো আর বলতে লাগলো :

আত্মা চলে গেলেন। বড় অল্পতে সন্তুষ্ট ছিলেন। সারা বছরে দুই/তিন খানা কাপড়ই তার জুটতো। এইভাবে সারা জীবন তার কেটে গেছে। তবু তার অভিযোগ ছিলো না।

আত্মা আব্বাকে একটি মুহূর্তের জন্যেও ভুলতে পারেননি। আব্বার বইগুলো ছিলো তার সাঙ্কনা, তার ব্যথা সহ্য করার হাতিয়ার। তাই অনেক সময় সেসব নাড়া-চাড়া করতেন তিনি।

আমার মুখে কোনো কথা নেই। হদ্দ বোকার মতো, বিবাক বোবার মতো শুধু বাচ্চুকে বুকে করে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। হঠাৎ কার কান্না যেনো বাতাসকে ভারী করে তুললো :

মামী আমার মামী কই? আমার মামী কই? কই আমার মামী? বাচ্চু আবার ডুকরে কেঁদে উঠলো এবং বললো :

ড. হাসান জামান সাহেবের বোন এসেছেন। আত্মাকে দারুণ ভালোবাসতো কিনা তাই ওভাবে কাঁদছে।

বাচ্চু ভেতরে গেলো। আমি আর পারলাম না। এই ফাঁকে একা একা কেঁদে নিলাম।

কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই ভেসে এলো অনেকগুলো নারী কণ্ঠের কান্না। বাচ্চু এলো। বললো :

কিছু ভিখারী এসেছে খবর পেয়ে। দুখ দিতো যে সে এসেছে। কাজ করতে বাসায় যে সেই সবচে' বেশী কাঁদছে। সবাই আত্মার ভক্ত। আত্মা ভিখারীদের এতো বেশী খাওয়াতেন যে পাশের বাসার লোকেরা অভিযোগ করতো।

হঠাৎ কার কান্না যেনো গগন-বিদারী হয়ে উঠলো। বাচ্চুও কাঁদছে। জিজ্ঞেস করতে ভয় হলো। ধরে নিলাম- হয়তো লাল্লা আপা অথবা ইয়াসমিন আপাই হবেন। খালান্ধার আদরের দুই মেয়ে।

বাচ্চুকে জিজ্ঞেস করলাম :

আখতার-টিপু ওরা কোথায়? ভেতরে নাকি? দেখছি না যে।

বাচ্চু বললো :

আখতারের বাসায় অসুখ। আসবে ঝামেলায় আছে। টিপু জুরাইন গেছে কবরের ব্যাপারে।

আমি আর দেরি না করে আলী আশরাফ স্যারের জানাযায় যাবো বলে পা বাড়লাম। বাচ্চুকে শুধু বললাম :

স্যারের জানাজা পড়ে আবার আমি আসছি।

চার.

বেগম ফররুখ : আমাদের খালান্মা ছিলেন। আমি, সোলায়মান আহসান, আসাদ বিন হাফিজ, মুকুশ চৌধুরী, হাসান আলীম, মোশাররফ হোসেন খান, আহমদ মতিউর রহমান, সাইফুল্লাহ মানচুর, শরীফ বায়জীদ মাহমুদ, গোলাম মোহাম্মদ, চৌধুরী গোলাম মাওলা, ডা. স ম রফিক আমরা সবাই তাঁকে খালান্মা বলতাম।

একটি অসাধারণ প্রতিভার জন্যে প্রয়োজন একটি অসাধারণ হৃদয়ের। অসাধারণ এক প্রতিভাবান ফররুখের জন্যে আমাদের খালান্মা ছিলেন সেই অসাধারণ এক হৃদয়। তাই কবি ফররুখ হচ্ছেন কবিদের আদর্শ আর কবিদের ঘরের আদর্শ হচ্ছেন বেগম ফররুখ : যিনি আমাদের খালান্মা ছিলেন।

.

আমাদের সিদ্দিক জামাল ভাই

ষাটের দশকের একেবারে প্রান্ত ছোঁয়া সময়ে আমি ইসলামী ছাত্রশিবির পূর্ব ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবার সৌভাগ্য অর্জন করি। বাগেরহাটের নেতা হিসেবে তখন আমি পেয়েছিলাম আবদুল মজিদ ভাইকে। পেয়েছিলাম মোহেববুর রহমান ভাইকে, বর্তমানে জেদ্দায় আছেন এবং বাগেরহাট কলেজের নেতা হিসেবে পেয়েছিলাম ফকির আবদুস সবুর ভাইকে, অবিসংবাদিত মোফাসসেরে কুরআন মরহুম আবদুল কাদের সাহেবের ভাগ্নে- তামীরুল মিল্লাত মাদরাসা শিক্ষক, ঢাকা মহানগরী জামায়াতে ইসলামীর ডেমরা ধানার আমীর যিনি।

খুলনা জেলার নেতা এবং খুলনা মহানগরীর নেতা হিসেবে পেয়েছিলাম যথাক্রমে মতিয়ার রহমান খান ভাইকে বর্তমানে জেদ্দায় আছেন। পেয়েছিলাম সিদ্দিক জামাল ভাইকে। পেয়েছিলাম আনসার উদ্দিন হেলাল ভাইকে, বর্তমানে খুলনা বারের খ্যাতিমান উকিল। পেয়েছিলাম বাশারাত হোসেন বকুল ভাইকে, বর্তমানে খুলনা শহরের একটি কলেজের অধ্যাপক। পেয়েছিলাম আবুল কাশেম ভাইকে, বর্তমানে মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাটের একটি হাইস্কুলের শিক্ষক।

আমি তখন আমাদের গ্রামের মাদরাসা-বারুইপাড়া মাদরাসা ছাত্র। এই মাদরাসা এবং মাদরাসার পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে ইসলামী আন্দোলনকে মজবুত করার জন্য মুজিব দাদা, আশরাফ ভাই, তালেব ভাই, হালিম ভাই, হাকিম ভাই, কামাল ভাই, আমি এবং আরও অনেকে রাত-দিন পরিশ্রম করে যাচ্ছি। ঠিক এই উত্তাল দিনগুলোতেই সিদ্দিক জামাল ভাইয়ের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে।

পরিচয় ঘটে জেলার নেতা হিসেবে।

দুই.

আমাদের এলাকার এই শাখাটিতে জামাল ভাই প্রায়ই সফরে আসতেন। অল্পদিনের মধ্যে তিনি আমাদের সবাইকে জয় করে নিলেন। আমি মুন্সি হলাম তার অপূর্ব দারসে। ঐ সময়ে দারসের জন্যে সাধারণত তিনি আমপারার কোনো না কোনো সূরা বেছে নিতেন। ‘ওয়াল আদিয়াতি দাবহান। ফালমুরিয়াতি কাদহান’ অথবা ‘ওয়াল আসরি ইন্না ইনসানা লাকী খুসর-এর তাফসির তিনি এমনভাবে করতেন যে, আমি তার দিকে অবাক বিন্ময়ে তাকিয়ে থাকতাম এবং ভাবতাম-হায়! আমিও যদি এরকম পারতাম!

জামাল ভাই সফরে এলেই আমাদের সাংগঠনিক তৎপরতার গতিধারায় জোয়ার আসতো এবং অনেকদিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকতো এ গতিধারা। এভাবে ক্রমাগত আসতেন তিনি, জোয়ারও আসতো ক্রমাগত।

একসময় তারই যত্নে আমরা ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের জন্য নিবেদিত প্রাণ হয়ে গেলাম।

জামাল ভাই ঐ কর্মচঞ্চল দিনগুলোতে আমাদেরকে এতোটা প্রাণিত করেছিলেন যে, তা ভাষায় বর্ণনা করা যাবে না। একটি ঘটনার উল্লেখ করছি।

কোনো একদিন দুপুরের দিকে তিনি আমাদের মাদরাসায় এলেন। তারপর প্রাকৃতিক প্রয়োজন সেরে এসে তিনি বললেন, ‘আপনাদের এখানে ইসলামী আন্দোলনের কোনো কর্মী থাকে বলে তো মনে হয় না।’ জামাল ভাই ছোট-বড় সবার সাথেই আপনি করে কথা বলতেন। তিনি আমাদেরকে কোনো ব্যাপারে তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত করলেন বুঝতে কষ্ট হলো না। জামাল ভাই বিশ্রাম নিতে থাকলেন।

আমাদের মুজিব দাদা বড় একটা বালতি নিয়ে এসে বললেন, ‘চলো, আমি নামবো, তোমরা সব নদীর দিকে লাইন দাও।’

মুজিব দাদা-আমাদের শাখা সভাপতি পায়খানার কূপের মধ্যে নেমে গেলেন। তারপর বালতি ভরে ভরে দিতে লাগলেন। পরিষ্কার হয়ে গেলো পায়খানাগুলো এবং পেশাবখানাগুলোও। আসরের জামায়াতের আগেভাগে আবারও এতেজায় গেলেন জামাল ভাই। ফিরে এসে উল্লসিত হয়ে বললেন, ‘নিশ্চয়ই মাদরাসায় জ্বিন আছে’। আমাদের এই তাৎক্ষণিক তৎপরতায় সেদিন খুব খুশি হয়েছিলেন জামাল ভাই এবং নিশ্চয়ই আমাদের সবার জন্যে দোয়া করেছিলেন।

তিন.

সাজ্জাদ ভাই, একটি মাদরাসার প্রিন্সিপাল এখন। একবার সাজ্জাদ ভাইদের এলাকায় আমাদের গ্রাম থেকে মাইল পাঁচেক দূরে- জামাল ভাই সফরে গেছেন। মরগার হাটে জামাল ভাই খুঁজছেন তাকে। পেয়ে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, ‘কি কেনার জন্য হুড়োহুড়ি করছো?’ ‘মুরগি।’ ‘কার জন্য?’ ‘আপনার আসার কথা না? আপনার জন্য’। ‘দেখি, কতো টাকা?’ সাজ্জাদ ভাই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে টাকাগুলো দিয়ে দিলেন জামাল ভাইয়ের হাতে এবং জামাল ভাই বললেন, ‘আমার জন্যে মুরগির দরকার নেই, এয়ানত নিয়ে নিলাম।’

চার.

সত্তর দশকের শুরুর দিকেই হবে। বাগেরহাট মহকুমা শাখার সাথে আমাদের সাংগঠনিক সম্পর্ক শিথিল হয়ে গেলো। আমরা অনিবার্যভাবেই ঝুঁকে পড়লাম খুলনার দিকে। প্রতি মাসের রিপোর্ট- সাংগঠনিক কাজের রিপোর্ট-জমা দিতে যাই খুলনায়, প্রতি মাসের এয়ানত জমা দিতে যাই খুলনায়, বড় বড় মিছিল-সমাবেশে যাই খুলনায়। খুলনা আমাদের প্রতিদিনের শহরে পরিণত হয়।

এখন বুঝি- এটা হয়েছিলো জামাল ভাইয়ের কারণে। আমাদের গ্রাম প্রত্যন্ত গ্রাম হলেও সাংগঠনিক কাজের দিক থেকে এতোটা সম্ভাবনাময় হয়ে উঠেছিলো যে, আমাদের শাখাটিকে মহকুমা বাগেরহাটের সাথে যুক্ত না রেখে, যুক্ত করে দিলেন খুলনা জেলার সঙ্গে।

এক দূরদর্শী সংগঠকের নাম সিদ্দিক জামাল ভাই। তার দূরদর্শিতাকে সেই সময়ে উপলব্ধি করার মতো বয়স এবং অভিজ্ঞতা কোনোটাই আমার ছিলো না।

জামাল ভাইয়ের দূরদর্শিতাকে বুঝতে আমার সময় লেগেছে ২০ বছর এবং বুঝলাম তখন, যখন দেখেছিলাম-তারই হাতে গড়া কর্মী মাওলানা মুজিবুর রহমান, আমাদের বারুইপাড়া শাখার সভাপতি, জেলা আমীর হয়েছেন, এমপি প্রার্থী হয়ে হাড্ডাহাড়ি লড়াই করেছেন কর্নেল মুজাফ্জুর রহমান সাহেবের সঙ্গে, তারই হাতে গড়া কর্মী মোল্লা মোস্তফা কামাল মক্কার দায়িত্ব পালন করেছেন, তারই হাতে গড়া কর্মী মাওলানা আশরাফ থানা আমীরের দায়িত্ব পালন করেছেন। এ ঘটনা তো শুধু আমাদের এলাকারই ঘটনা। সারাদেশের ঘটনার একটা অংশমাত্র।

পাঁচ.

একবার আমাদের এলাকার সফর শেষ করে জামাল ভাই খুলনায় যাবেন, আমি সঙ্গী হলাম, কেরায় নৌকায় ফকিরহাট যাচ্ছি- শুরু হলো পারিবারিক পরিচয়ের পালা।

জামাল ভাই যখন বললেন যে, তাদের মূল বাড়ি সায়বার, আব্বার নাম ইসহাক মৌলভী-আমি চমকে উঠলাম এবং গর্বে আমার বুকটা ফুলে উঠলো। মুহূর্তের মধ্যে জামাল ভাই আমাদের রক্তের আত্মীয় হয়ে গেলেন।

আমার মামা বাড়ি কুরশাইল। জামাল ভাইদের মূল গ্রাম সায়বারের পিঠাপিঠি এই গ্রাম। আমাদের ইউনিয়ন আমাদের গ্রামের নামেই-বারুইপাড়া ইউনিয়ন। কুরশাইল এবং সায়বার বারুইপাড়া ইউনিয়নেরই দুটি গ্রাম।

মামা বাড়ির দিক থেকে জামাল ভাইরা আমাদের আত্মীয়।

আমার যতোদূর মনে পড়ে, ছোটবেলায় জামাল ভাইদের গ্রামের বাড়িতে আমি দালান দেখেছি, এখনও আছে।

জামাল ভাইয়ের আক্কার নাম মৌলভী ইসহাক। ইসহাক মৌলভী সাহেবের নাম শুনে চমকে উঠেছিলাম কেনো? সে কথায় আসছি।

ইসহাক মৌলভী সাহেব ছিলেন আমার আক্কার প্রিয়তম ছাত্র। আমার যখন ৫ অথবা ৬ বছর বয়স, তখন ইস্তেকাল করেন আমার আক্কা। আমার আক্কার তাকওয়া-পরহেয়গারীর গল্প আমার আন্নার কাছেই শুনেছি। মৌলভী ইসহাক সাহেবের গল্পও আন্নার কাছে শুনেছি।

মৌলভী ইসহাক সাহেব প্রতিবছরই কোনো না কোনো একদিন আমার আক্কার কবর জেয়ারত করতে আসতেন।

মৌলভী ইসহাক খুব ছোট থাকতেই তার আক্কা কে হারান। মৌলভী ইসহাক সাহেবের আন্না ছিলেন পরমা সুন্দরী এবং বিদ্যুৎসাহী। তিনি চাইতেন তার ছেলে ইসহাক লেখাপড়া শিখুক, মানুষের মতো মানুষ হোক।

একদিন জামাল ভাইয়ের দাদী ইসহাককে নিয়ে এলেন আমাদের বাড়ি এবং আক্কার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, ‘আমার এতিম ছেলেটাকে মানুষ করার দায়িত্ব আপনাকে দিয়ে গেলাম।’

আমার আন্নার কাছে শুনেছি- ‘এতো ছোট থাকতেই ইসহাককে পেয়েছিলাম যে, গোসলের সময় আমি তাকে ল্যাংটা করে গোসল করাভাম এবং সে ছিল আমার আদরের আর একটি সন্তান। সেই আমাদের বাড়িতে আসার পর থেকে সে আমাকে আন্না বলে ডাকে।’

জামাল ভাইয়ের সঙ্গে আমার আত্মীয়তার সম্বন্ধসূত্র অবিকৃত হবার পর আমিই প্রস্তাব করেছিলাম ‘জামাল ভাই, ইসলামী আন্দোলনের সম্পর্কই আমার কাছে বড় সম্পর্ক, আপনার আক্কা কে আমার বড় ভাইয়েরা যাই বলুক আর যাই বলুক, আমি আপনাকে ভাই-ই বলবো’।

আমার প্রস্তাব শুনে জামাল ভাই মিষ্টি করে হেসেছিলেন শুধু। বলেননি কিছুই। আমাদের এই ভাই-ভাই সম্পর্ক তার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বহাল ছিলো।

আমাদের এলাকায় সফরে গেলে আমাদের বাড়িতেও যেতেন জামাল ভাই।
আম্মা খুব খুশি হতেন, বলতেন, 'ইসহাকের ছেলে এসেছে, বুঝি।' আমি
বলতাম, 'হ্যাঁ, জামাল ভাই এসেছেন।' ভাই বলাতে আম্মা রেগে গিয়ে বলতেন,
'তোরা ইসহাককেও ভাই বলবি, আবার ইসহাকের ছেলেকেও ভাই বলবি, মাথা
ঠিক আছে তো?'

জবাবে হাসতাম আর বলতাম- 'কুলু মুসলেমুনা ইখওয়াতুন'। আম্মা আর কথা
বাড়াতেন না। শব্দ করে হেসে উঠতেন শুধু।

ছয়.

খুলনা জেলার বাগেরহাট মহকুমার ফকিরহাট থানার- ঐ সময়ের ইসলামী ছাত্র
সংগঠনের- সভাপতি হবার পর থেকে খুলনার সাথে আমার যোগাযোগ আরো
বেড়ে যায়।

বিশেষ করে প্রশিক্ষণমূলক কর্মসূচিগুলোর প্রতি আকর্ষণ নেশার রূপ ধারণ করে।
নেশার রূপ ধারণ করার অনেকগুলো কারণের মধ্যে একটা হলো- অনির্বাচনীয়
ভ্রাতৃত্বের পরিবেশ।

টিসিতে গেলেই দেখা হতো মতিয়ার রহমান খান ভাইয়ের সঙ্গে; সুযোগ হতো
তার পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিভাষণ শোনার। দেখা হতো আনসার উদ্দীন হেলাল ভাইয়ের
সাথে; সুযোগ পেতাম তার গতিময় এবং তেজোদ্দীপ্ত বক্তৃতা শ্রবণের এবং দেখা
হতো জামাল ভাইয়ের সঙ্গে।

যদিও আমার ইসলামী গানের ব্যাপারে মতিয়ার রহমান খান ভাইয়ের উৎসাহের
অন্ত ছিলো না। তবুও জামাল ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হলেই বলতেন, 'নতুন কোনো
গান তৈরী আছে তো? হালকা প্রোথামে গাইতে হবে কিন্তু।'

সে সময়ে ঠিক এখনকার মতো একেবারে ঘটা করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হতো
না যদিও। তবুও আসরের নামাজের পর থেকে মাগরিবের নামাজের আগ পর্যন্ত
কখনো কখনো বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান হতো অবশ্যি। হোক না তার নাম
হালকা প্রোথাম।

ঐসব হালকা প্রোথামগুলো তখন মাতিয়ে তুলতেন যারা তাদের মধ্যে মুজাহিদুল
ইসলাম ভাই একজন; বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং
বিভাগের অধ্যাপক।

সেই সময়ে কৈরাতে আমাদের মধ্যে মুজাহিদ ভাই-ই ছিলেন শুদ্ধতম এবং
শ্রুতিমধুর কণ্ঠের অধিকারী। খুব ভালো ইসলামী গানও গাইতেন। অসম্ভব
মেধাবী হবার প্রেক্ষিতে তার গ্রহণযোগ্যতা ছিলো ঈর্ষনীয়।

সিদ্দিক জামাল ভাই জেলার নেতা হবার কারণে; জেলাওয়ারী প্রায় সব অনুষ্ঠানই পরিচালনা করতেন তিনি। অন্যদিকে মতিয়ার রহমান খান ভাই আমাকে অতিরিক্ত শ্রদ্ধা করতেন। ফলে এই দু'টি সম্মিলিত শ্রদ্ধার শ্রোতব্যায় আমিও গানে গানে গতিময় হয়ে উঠতে পারতাম এবং সুযোগ পেতাম নতুন নতুন সুরের পাখি উড়িয়ে দেবার।

সত্যি কথা বলতে কি, ইসলামী সাহিত্য ও ইসলামী সংস্কৃতির জগতে আজকে আমার যতোটুকু পদচারণা- তার প্রথম ক্ষেত্রভূমি তৈরী করে দিয়েছিলেন জামাল ভাই, খান ভাই, আনসার ভাইয়েরা।

সাত.

সিদ্দিক জামাল ভাইয়ের সাথে আমার যে একটি পারিবারিক সম্বন্ধসূত্র আছে তা টের পেতাম কোনো প্রোত্ৰাম এবং কোনো কর্মসূচি সমাপ্ত হয়ে গেলে। কোনো প্রোত্ৰাম এবং কোনো কর্মসূচি সমাপ্ত হয়ে গেলে তিনি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন তাদের খুলনার শহরতলীর বয়রার বাসায়। জামাল ভাইদের বয়রার বাসাটা আমার প্রথম দিনই পছন্দ হয়েছিলো। পছন্দ হয়েছিলো বাসাটার নামের কারণে- নিরালা নিলয়- কবিতার মতো নামের কারণে।

জামাল ভাইদের বাসায় গেলে জামাল ভাইয়ের সাথে আমার আর কোনো সম্পর্ক থাকতো না। আমি মিশে যেতাম জামাল ভাইয়ের অন্যান্য ভাইদের সঙ্গে। বিশেষ করে সিদ্দিক হেলালের সঙ্গে।

জামাল ভাইদের বাসার নামের মতো ভাইদের নামগুলোও খুব ভালো লাগতো, লাগে। কী চমৎকারভাবে সবার নামের সঙ্গে সিদ্দিক যুক্ত আছে। যেমন : সিদ্দিক কামাল, সিদ্দিক হেলাল, সিদ্দিক আহাদ, সিদ্দিক শহীদ। এক আনি অর্থ্যাৎ আনিসার নাম ছাড়া জামাল ভাইয়ের অন্য কোনো বোনের নাম আমার আর মনে নেই।

আট.

সিদ্দিক জামাল ভাইয়ের সাথে পরিচিত হবার পর থেকে আমি তাকে কখনো, কোনো দিন কর্মহীন মানুষ হিসেবে পাইনি। এক অসম্ভব পরিশ্রমী মহান মানুষের নাম সিদ্দিক জামাল। '৬৯, '৭০ এবং '৭১ সালে আমি তাকে এতো ত্যাগ এবং এতো পরিশ্রম করতে দেখেছি, যা অসম্ভবীয় এবং অকল্পনীয়। একই অবস্থা দেখেছি- খান ভাই, আনসার ভাই, বাশারাত ভাইদের।

মনে আছে, '৭১-এর কোনো এক দিন জামাল ভাই আমাকে এবং মুজিব দাদাকে ডাকলেন এবং বললেন, 'আপনাদের দু'জনেরই সদস্য হতে হবে, সদস্য-প্রার্থী-ফর্ম নিয়ে নেবেন আমার কাছ থেকে, পূরণ করে দিতে হবে তাড়াতাড়ি।' আমরা ভয় পেয়ে গেলাম এবং বলাবলি করলাম, 'সদস্য মানে খান ভাই, সদস্য মানে জামাল ভাই, সদস্য মানে আনসার ভাই, বাশারাত ভাই- কাশেম ভাই; ঐ রকম অসম্ভব ত্যাগী এবং যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়া অসম্ভব। সুতরাং সদস্য হওয়া যাবে না, হবোও না, আল্লাহর দ্বীনের পথে এমনিই সক্রিয় থাকবো।' যেমন ভাবনা, তেমনি বাস্তবায়ন। কিসের ফর্ম ফিলাপ, আমরা এর পর থেকে জামাল ভাইকে দেখলেই কেটে পড়তাম।

নয়.

জামাল ভাইয়ের পরিশ্রমের অজুগ্ধ ঘটনার সাক্ষী মতিয়ার রহমান খান ভাইয়েরা, আনসার ভাইয়েরা এবং তার বিভিন্ন সময়ের সহকর্মীরা। জানি না সেইসব ঘটনা তুলে ধরবার মতো সময় তাদের হবে কি না?

জামাল ভাইয়ের কঠোর পরিশ্রমের একটি মাত্র ঘটনা তুলে ধরার প্রয়াস পেলাম। একবার বাগেরহাট সফরে গিয়েছেন। যেতে হবে তাকে শরণখোলা থানায়। শরণখোলা থানা- জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় নায়েবে আমীর-আল্লামা আবুল কালাম মোহাম্মদ ইউসুফ সাহেবের থানা। শরণখোলায় জামাল ভাইকে যেতেই হবে। সাংগঠনিক সফর; কোনো উপায় নেই। হাঁটা শুরু করলেন। হাঁটতে হাঁটতে সাঁইত্রিশ মাইল হেঁটে সফরের হক আদায় করলেন তিনি।

বাগেরহাটের দায়িত্ব পালন করার সময় আমারও খুব হাঁটতে হতো। একদা হাঁটতে হাঁটতে জামাল ভাইয়ের রেকর্ড ভেঙেছিলাম। কিন্তু খুব কম লোকই জানে, সংগঠনের জন্যে এই কঠোর পরিশ্রমের শিক্ষা আমি কার কাছ থেকে পেয়েছিলাম।

সিদ্দিক জামাল ভাইয়ের বিরুদ্ধে তার কোনো শত্রুও অভিযোগ তুলতে পারবে না যে- তিনি অলসতায় পর্যবসিত কোনো সাধারণ মানুষ ছিলেন। সুতরাং অসাধারণ কর্মবীরের নাম সিদ্দিক জামাল। বহুগুণের অধিকারী ছিলেন তিনি। বহুগুণের অধিকারী লোকদের বসে থাকার সময় হয় না।

দশ.

একান্তরের শেষের দিকে ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের বৃহত্তর দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে খুলনা ছাড়তে হলো জামাল ভাইকে। একটা ছদ্ম-পেশা এবং একটা ছদ্মনাম নিয়ে তিনি উত্তরবঙ্গে ঢুকে পড়লেন। ছদ্ম-পেশা; সাইনবোর্ড লেখার পেশা। ছদ্ম-নাম হলো সাদী; সাদী ভাই। ছাতা মেরামত শিল্পী হিসেবেও কখনো কখনো তাকে প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত সফর করতে হয়েছে এই সময়গুলোতে। মাঝে মাঝে তার চিরকুট চিঠি পেতাম। হয়তো একটি মাত্র বাক্য লেখা তাতে : 'ব্যবসার কাজে লেগে না থাকলে ব্যবসায় সাফল্য আসে না'। পত্রবাহক জিজ্ঞেস করতো, 'এ-কার পত্র বলুন তো?' উত্তর করতাম, 'হাতের লেখা দেখেই বুঝতে পেরেছি, এ চিঠি জামাল ভাইয়ের চিঠি'। বাহক বলতো, 'না, এটা জামাল ভাইয়ের না, সাদী ভাইয়ের, জামাল ভাইয়ের নাম উচ্চারণই করা যাবে না এবং এখনই ছিঁড়ে ফেলতে হবে।'

চিঠি ছিঁড়তে ছিঁড়তে আমি আর বাহক হাসতাম শুধু।

জামাল ভাইয়ের চিরকুট চিঠি বুকের মধ্যে ঝড় তুলতো। ঝাঁপিয়ে পড়তাম, কোমর বেঁধে লেগে যেতাম ব্যবসায়ের কাজে। অর্থাৎ ইসলামী আন্দোলনের কাজে।

'৭২-'৭৩-এর দিকে প্রকাশ্যে ইসলামী আন্দোলনের কাজ করার ব্যাপারটা ছিলো- মৃত্যুকে দাওয়াত দিয়ে বাড়িতে ডেকে আনার শামিল। ঐ সময়ে ইসলামী ছাত্র আন্দোলন গোপনেই করতে হয়েছে। জামাল ভাইকে সাদী নাম গ্রহণ করতে হয়েছে, বাশারাত ভাইকে বকুল, আনসার ভাইকে হেলাল এবং ইসলামী আন্দোলনকে আখ্যায়িত করতে হয়েছে ব্যবসায় বলে। আর আল্লাহর কাছে ইসলামী আন্দোলন তো সার্বিক পরিত্রাণ প্রদানকারী তেজারত ব্যবসায়ই। সুতরাং ঐ আখ্যায়ন যথার্থ আখ্যায়ন।

এগার.

মীর কাশেম আলী ভাই আমাকে ঢাকায় নিয়ে এলেন '৭৬-এ। ঢাকায় নিয়ে আসার ব্যাপারে- অনেক পরে শুনেছি- জসিমউদ্দীন সরকার ভাই এবং হেমায়েত ভাইদের উৎসাহ অনেকখানি কাজ করেছে। ঢাকায় এসে উঠেছিলাম আলীয়া মাদরাসা হোস্টেলে। এ সময়ে নানাবিধ সমস্যা আমাকে প্রায়- পরাজিত করে ফেলেছিলো। আমার আকাশে তখন অজস্র-ঘন মেঘের আনাগোনা।

জামাল ভাই উদিত হলেন উজ্জ্বল সূর্যের মতো। পাশে দাঁড়ালেন, আশায়- আশ্বাসে সুস্থ করে তুললেন, দ্বিগুণ উৎসাহে মাথা তুললাম।

আসলে ঐ জমাটবাঁধা অঙ্ককারের দিনগুলোতে জামাল ভাই যদি মাঝে-মধ্যে আলীয়া মাদরাসা হোস্টেলে না আসতেন, তাহলে হয়তো আমার আর ঢাকায়ই থাকা হতো না। এসব কথা অনেকেই জানেন না, আমি শুধু জানি।

আমার একেবারেই ঢাকায় মন টিকতো না। প্রকৃতি পাগল মানুষ আমি। গ্রাম আজো আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে এবং কখনো কখনো নগর জীবন আমাকে একেবারে বিধিয়ে তোলে। জামাল ভাই নেই, এখন কে বলবেন, ‘শুধু ইসলামী আন্দোলনের জন্যেই এই নগর-জীবনকেও বরদাশত করতে হবে মল্লিক ভাই, যেমন অনেক কিছুকে বরদাশত করেছেন।

বারো.

সত্যি সত্যিই চাকরী বলতে যা বোঝায় তা আমার শুরু হয়েছিলো সাপ্তাহিক সোনার বাংলায়। সোনার বাংলার বর্তমান সম্পাদক কামারুজ্জামান ভাই-ই এক প্রকার জোর করে আমাকে সোনার বাংলার সাহিত্য পাতায় বসিয়ে দিয়েছিলেন। সাহিত্য-সাংবাদিকতার হাতে-খড়ি আমার কামারুজ্জামান ভাইয়ের হাতে। আমি তার কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

সোনার বাংলা থেকে অধ্যাপক নাজির আহমদ ভাই- কেন্দ্রীয় নায়েবে আমীর, আমাকে নিয়ে যান সাহিত্য ‘মাসিক কলম’ এ কাজ করার জন্যে, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারে।

কিন্তু আমার অনেক অনেক আগে থেকে সিদ্দিক জামাল ভাই বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের প্রকাশনা বিভাগের দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন।

যে প্রতিষ্ঠানে সিদ্দিক জামাল ভাই চাকরী করেছেন, আমিও সেই প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘ এক যুগ চাকরী করেছি- সেই কারণে ঐ সেন্টার এবং জামাল ভাই সম্পর্কে উজ্জ্বল কিছু কথা আমার বলতেই হবে। তবে তার আগে একটি ঐতিহাসিক বিষয়ের অবতারণা না করলেই নয়। সম্মানিত পাঠকবৃন্দ, আমি ইচ্ছে করেই একটু পেছনের দিকে ফিরে গেলাম।

সিদ্দিক জামাল ভাইয়ের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে ‘৭১-এর আগে আর একবার ফিরে না গিয়ে পারলাম না।

সিদ্দিক জামাল ভাই জীবনে একবারও আমার সঙ্গে বাজে কোনো কথা বলেছেন বলে মনে পড়ে না। যতোবার আমি তাকে কাছে পেয়েছি সাধারণত আদর্শ সংগঠন আন্দোলনের আলাপচারিতার মধ্যেই তাকে পেয়েছি। এ-সব

আলাপচারিতার উদ্দেশ্য ছিলো একটাই- যেনো আমি একেবারে ভেতর থেকে ইসলামী আন্দোলনকে ভালোবাসি, ইসলামী আন্দোলনের যাবতীয় বিষয়-আশয়কে যথার্থভাবে গ্রহণ করতে পারি।

কিন্তু আমি যে একটা হৃদ বোকা তা সিদ্ধিক জামাল ভাইয়েরও এক সময় বুঝতে বাকী থাকেনি। মতিউর রহমান নিজামী ভাই তখন নাজিমে আলা-কেন্দ্রীয় সভাপতি। গিয়েছেন খুলনায়। এক মসজিদের ভেতরে কর্মী সম্মেলন অথবা শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কতোইবা বয়স আমার তখন! অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছি বলে আনন্দের সীমা নেই। অনেক অনেক প্রতীক্ষার পর নিজামী ভাই বক্তৃতা করতে দাঁড়ালেন। পড়ন্ত বিকেশ। কাঁচের জানালা ভেদ করে কমলা আলো নিজামী ভাইয়ের ঘাড়ে পীঠে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে এবং নিজামী ভাই যখন ডানে-বামে মুখ ঘুরিয়ে ভাষণ দিচ্ছেন ঠিক তখন বিকেলের ঐ আলো ঝকঝক করে উঠছে তার কণ্ঠদেশে। কণ্ঠদেশের সেই জায়গায় যে জায়গায় সুন্দর করে ছাটা দাড়ির প্রান্তভাগ শেষ হয়ে গেছে। নিজামী ভাই কেন্দ্রীয় সভাপতি থাকাকালে কালো স্কেমের চশমা পরতেন। গাল ভরা দাড়ি রাখতেন ছাঁটা-ছাঁটা- ছোট-ছোট এবং সবমিলিয়ে তাকে এমন সুন্দর দেখাতো যে, চোখ ফিরাতে পারতাম না। সে সময় ছাত্র বন্ধুদের নিজামী ভাইয়ের চেহারার বর্ণনা দিয়েই ঘায়েল করে ফেলতাম; ঘায়েল করে ফেলতাম মতিয়ার রহমান খান ভাইয়ের চেহারার বর্ণনা দিয়েও।

সে যাই হোক সমাবেশ শেষ হলে, জামাল ভাই সঙ্গে করে নিয়ে চললেন। যেতে যেতে জিজ্ঞেস করলেন, 'নিজামী ভাইয়ের কোন দিকটি আপনার সবচে ভালো লাগলো? বললাম, 'কণ্ঠদেশের ঠিক সেই জায়গাটি যেখানে এসে দাড়ি ছাঁটা শেষ হয়েছে এবং যেখানে এসে বিকেলের রোদ্দুর ঠিকরে পড়েছে।' জামাল ভাই অশ্লক চোখে আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। একেবারে ভয় পেয়ে গেলাম। তারপরে হেসে দিয়ে বললেন, 'কবি শুধু কবিতাই লিখেছে, শোনেনি কিছুই।' বললাম 'বক্তৃতা যে একেবারে শুনিনি তা নয়, তবে চোখটা ওখানেই পড়েছিলো।' বললেন, 'মনটাও ওখানে পড়েছিলো তাই না? উত্তরে আমি আর কিছুই বলিনি সেদিন। বলিনি ভয়ে এবং লজ্জায়।

ভেবেছিলাম, কড়া সমালোচনা করবেন তিনি। কিন্তু না, তাঁর স্নেহের কবিকে তিনি সেদিন কিছুই বলেননি এবং এ নিয়ে তিনি আর কোনো দিন বিদ্রূপও করেননি। অথচ আমি আজো লজ্জা পাই। ঘটনাটি মনে পড়লে আমার এতো বড় বোকামীকে আমিও স্বাভাবিকভাবে নিতে পারিনি। তবুও কখনো কখনো মনে হয় আমরা আমাদের দায়িত্বশীলদেরকে যে রকম ভালোবাসতে পেরেছিলাম সেদিন, এখনকার কর্মীরা কি তাদের দায়িত্বশীলদেরকে সে রকম ভালোবাসতে পারে?

হয়তো পারে, হয়তো তারও চেয়ে বেশীও পারে।

জামাল ভাইকে আমি কখনো তেমন একটা রাগতে দেখিনি। অন্তত আমার ওপরে রাগতে দেখিনি। ছোটবেলা থেকেই সাহিত্য-সংস্কৃতি খেলাধুলা এবং ভ্রমণ আমার রক্তের সঙ্গে মিশে আছে। সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রবণতা পেয়েছিলাম পরিবারের কাছ থেকে, খেলাধুলার প্রকৃতি পেয়েছিলাম আমি আমার গাঁয়ের পরিবেশের কাছ থেকে এবং ভ্রমণের প্রবণতা পেয়েছিলাম আমি আমার আব্বার প্রবণতার উত্তরাধিকার থেকে। বলতে কি এ প্রবণতাগুলো আমাকে যে কখনো কখনো বিভ্রমনার মধ্যে ফেলে দেয় না, তা নয়। একবার জামাল ভাই একটি সফরের সিদ্ধান্ত আগেই দিয়ে রেখেছিলেন। বাদ আসর আমার সঙ্গে কথা সেরে খুব সস্তব বাদ মাগরিব মূল প্রোথাম শুরু করবেন।

মনে আছে, ঠিক প্রোথামেরই দিন আমি অন্য কাজে জড়িয়ে পড়লাম। ভুলে গেলাম জামাল ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলার কথা। মাগরিবের আগে আগে দেখি, প্রোথামস্থল থেকে প্রায় দেড় মাইল দূরে যেখানে আমি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম ক্রীড়া এবং সাংস্কৃতিক কোনো কর্মকাণ্ড নিয়ে, সেখানেই জামাল ভাই আমাকে ধরলেন। নিয়ে এলেন সাংগঠনিক প্রোথামস্থলের দিকে।

লক্ষ্য করেছিলাম, সেদিনও জামাল ভাই একটি অনুযোগও করেননি আমার বিরুদ্ধে। সেদিনের এই স্নেহ আমাকে চিরকালের জন্য সতর্ক করে দিয়েছিলো সাংগঠনিক কন্টাক্টের ব্যাপারে। অবশ্যি এ ধরনের ঘটনা এ পর্যন্ত আর একবার মাত্র ঘটেছে। ঘটেছে আমার এক সময়ের জেলা সভাপতি মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম ভাইয়ের সঙ্গে। বর্তমানে শ্রমিককল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক যিনি।

দ্বিতীয় পর্বের স্মৃতিচারণে আমি বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের কথা বলেছিলাম। বলেছিলাম যে, এখানে জামাল ভাইও চাকরি করেছেন আমিও চাকরি করেছি। এক সময় বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ শিশু সংগঠক মাসুদ আলী ভাই, প্রখ্যাত কবি প্রকাশক সংগঠক আসাদ বিন হাফিজ ভাইও চাকরি করেছেন; চাকরি করেছেন বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিশু সাহিত্যিক, কবি সাজ্জাদ হোসাইন খান ভাই, সর্বোপরি আল্লামা আবদুল মান্নান তালিব ভাইও এখান থেকে সম্পাদনা করেছেন যথাক্রমে কলম ও পৃথিবী।

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার থেকে প্রকাশিত হয়েছে আলোড়ন সৃষ্টিকারী হাদীস গ্রন্থ রিয়াদুস সালেহীন। রিয়াদুস সালেহীন হাদীস বর্ণনার ধারাবাহিকতায়ই শুধু অনন্য নয়, অনন্য তার সাইজের কারণেও, প্রচ্ছদের কারণেও; তার বাঁধাইয়ের কারণেও। এর আগে আমি আর কোনো হাদীসগ্রন্থ এতোটা সর্বাধুনিকভাবে

প্রকাশিত হতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। কম লোকই জানে এই চমৎকার হাদীস গ্রন্থটির মুদ্রণ-দায়িত্ব কে পালন করেছিলেন।

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের প্রকাশনা বিভাগের দায়িত্বে থাকাকালেই তিনি এই অপূর্ব মুদ্রণশিল্পের কাজটি করেছিলেন। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক নাজির আহমদ ভাই তাঁকে কাছে টেনে নিয়ে আরো অনেক অনেক ভালো কাজ করার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। সত্যিই সুযোগ করে দিয়েছিলেন।

বেশ কয়েক বছর আগের কথা। একটি পঞ্চদশ সম্প্রদায় বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরকে অনিবার্যভাবে খণ্ডিত করার জন্যে উঠে পড়ে লেগে যায়। যারা উঠে পড়ে লেগেছিলেন, তাদের অনেকেই ছিলেন আমার প্রিয়তম নেতা, প্রিয়তম তাত্ত্বিক নেতা, অনেকেই ছিলেন প্রিয়তম বন্ধু।

প্রিয়তম অষ্ট সহযাত্রী, অনেকেই ছিলেন সঙ্গীতের মতো প্রিয়তম সঙ্গী। কিন্তু তাঁরা কেউ আমার প্রিয়তম সংগঠনের চেয়ে প্রিয়তম ছিলেন না।

ঐ সংকটকালে আমি চেয়েছিলাম ক্যাসেট বের করবো, বের করবো সারাদেশের জনশক্তিকে সঠিক পথের দিকে উদাত্ত আহ্বান জানানোর তাগিদে। পড়লাম মুদ্রণ সম্পর্কিত সমস্যায়। ধরলাম জামাল ভাইকে। বললাম স্টুডিওর দরকার নেই। বি.আই.সি'র ডেকেই রেকর্ড করে দিন। জামাল ভাই বি.আই.সি'র ডেকেই রেকর্ড করে দিলেন ক্যাসেট। ক্যাসেট দুটির নামও দিলেন তিনি। সুন্দর দুটি নাম প্রতীতি-১, প্রতীতি-২।

অনেকেই অবাক হয়ে যাবেন, এ কথা শুনলে যে, স্টুডিওতে রেকর্ড করা কোনো একক গানের ক্যাসেট আমার আজো বের হয়নি এবং ঐ প্রতীতি ছাড়া অন্য কোনো একক গানের ক্যাসেটও আমার আর বের হয়নি।

সেই জন্যে জামাল ভাইয়ের স্মৃতির অসহনীয় ভার অন্তত আমার বয়ে যেতে হবে যতোদিন বাঁচবো, যতোদিন বেঁচে থাকি।

সত্যিকার অর্থেই সিদ্ধিক জামাল ভাই ছিলেন সৃষ্টিশীল মানুষ, দূরদর্শী মানুষ। এ ব্যাপারে ঘটনাবলীর কোনো অভাব নেই।

মনে পড়ে, একবার জামাল ভাই বলেছিলেন, ‘সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যথার্থ গতি আনবার জন্যে একেবারে প্রাথমিক স্তর থেকে উদ্যোগ নিতে হবে। প্রাথমিক স্তর থেকে উদ্যোগ নিতে হবে সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক ইউনিট গড়ে তোলার লক্ষ্যে।’ সে উদ্যোগ তিনি যথার্থ অর্থেই নিয়েছিলেন এবং সফলও হয়েছিলেন।

আজ প্রধান প্রধান শহরগুলোতে কবি-সাহিত্যিক-সংস্কৃতিসেবীরা যে আলাদা শাখা উপশাখার মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলনের কাজ করার সুযোগ পাচ্ছেন, এই সুযোগটা তৈরী করার প্রথম পরিশ্রম জামাল ভাই-ই করেছিলেন।

এ ব্যাপারে দিনের পর দিন ধরে জামাল ভাই পরামর্শের পাত্র পূর্ণ করেছিলেন আল্লামা আবদুল মান্নান তালিব ভাইয়ের সাথে কথা বলে, মাসুদ আলী ভাইয়ের সাথে কথা বলে, ডা. শাহেদী ভাইয়ের সাথে কথা বলে।

মাননীয় সমাজকল্যাণ মন্ত্রী আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ ভাই তখন ঢাকা মহানগরীর আমীর। জামাল ভাইয়ের প্রস্তাব- সাহিত্যিক-শিল্পীদের জন্যে আলাদা সাংগঠনিক ইউনিট সংক্রান্ত- তিনি গ্রহণ করেছিলেন।

ঐ ইউনিটের প্রথম দায়িত্বশীল হতে পারতেন জামাল ভাই নিজে। কিন্তু তিনি তা হননি। কৌশলগত কারণে সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ইউনিটের প্রথম দায়িত্বশীল করেছিলেন প্রখ্যাত চিকিৎসক ও জননেতা ডা. রেদওয়ানুল্লাহ শাহেদী ভাইকে।

ঐ ইউনিটটিই পরে সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ওয়ার্ডে পরিণত হয়। পর্যায়ক্রমে এ ওয়ার্ডের দায়িত্ব পালন করেছেন আল্লামা আবদুল মান্নান তালিব, প্রফেসর খন্দকার আবদুল মোমেন, জনাব হাসান আব্দুল কাইউম সেলিম প্রমুখ। আমিও এক সময় এ ওয়ার্ডের দায়িত্ব পালন করেছি।

জনাব এটিএম আজহারুল ইসলাম ভাই ঢাকা মহানগরীর আমীর থাকাকালে ঐ ওয়ার্ডটিই থানায় পরিণত হয়। পেশাজীবী থানা হিসেবে সাহিত্য-সাংস্কৃতিক থানা বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ইসলামী ক্যাসেট বিপ্লবের ক্ষেত্রে তার রয়েছে অসামান্য অবদান, সেই অসামান্য অবদানের বিষয়ে খোলাসা আলোচনার জন্যে আমি এই পূর্ব ভূমিকা করতে চাই : ১৯৭৫-এর শেষের দিকে অথবা ১৯৭৬-এর একেবারে প্রথম দিকে আমি ঢাকায় আসি। সেই সময় স্টুডিওতে ক্যাসেট রেকর্ডিং-এর ব্যাপারে আমার কোনো ধারণাই ছিল না। কিন্তু গান আমার ঠিকই রেকর্ড করে দিতে হতো। কখনো একটি মাত্র ক্যাসেট প্রেয়ারে, কখনো কয়েকটিকে সামনে রেখে। সে এক হাস্যকর, অধিকতর কষ্টকর এবং বিব্রতকর ব্যাপারও বটে।

আল্লাহর রহমত অবশ্যই। ঐ নাজেহাল অবস্থার মধ্যে হঠাৎ একদিন মাথায় এলো রেডিওতে তো বাজনা ছাড়াই হামদ-নাত পরিবেশিত হয়ে থাকে। তাহলে বাজনা ছাড়া আমাদের গান কেনো রেকর্ড করা যাবে না।

মাথায় আসা মাত্রই জামাল ভাইয়ের কাছে দৌড়। সব খুলে বললাম। বললেন, ‘গুড আইডিয়া, রেডিওতে কর্মরত কিছু কর্মকর্তার সঙ্গে আমার জানাশোনা আছে, তাদের সাথে আলাপ করে আপনাকে জানাবো।’

জামাল ভাই খুব একটা দেৱী করেননি, জানিয়েছিলেন এবং জানিয়েছিলেন এমনভাবে যে, আমি আশায়-আশায় উদ্দীপিত হয়ে উঠেছিলাম বৰ্ষণের আগের ফুলে ওঠা মেঘের মতো।

মাথার মধ্যে তখন গুঞ্জরিত হচ্ছে ক্যাসেট... ক্যাসেট... ক্যাসেট..। যন্ত্র সঙ্গত ক্যাসেটের পাশাপাশি যন্ত্রমুক্ত ক্যাসেট... যন্ত্রণামুক্ত ক্যাসেট...। শরবতের গ্লাসের পাশাপাশি স্বচ্ছ পানির শুদ্ধতম পানির সৃষ্টি সুখের উল্লাস। ক্যাসেট... ক্যাসেট... ক্যাসেট...ইসলামী গানের ক্যাসেট। হ্যাঁ ক্যাসেট বের করার জন্যে তখন পাগল হয়ে গিয়েছিলাম।

ইসলামী গানের ক্যাসেট বের করার জন্যে ছুটলাম টাকার সন্ধানে। কোথায় টাকা? এক ভাইয়ের কাছে ক্যাসেট প্রকাশনার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরলাম এবং মাত্র ছয়শ' টাকা চাইলাম, দিলেন না, দিলেনই না।

মনে মনে নিজেকেই দোষারোপ করলাম 'মল্লিক, দোষটাতো তোমারই, তুমি বিশ্বস্ততা অর্জন করতে পারোনি ছয়শ' টাকা পাবার মতো, এ ব্যর্থতা তোমারই, একান্তভাবে তোমারই।'

এবং মনে মনে হাসলামও এই ভেবে যে, ক্যাসেট বিক্রির টাকা যখন আসা শুরু হয়ে যাবে তখন ঠিকই অবস্থা হবে অন্য রকম। আসলে হয়েছিলোও অন্য রকম, সত্যিই অন্য রকম অবস্থা হয়েছিলো।

এমনিই আমার চেহারা ভালো না, তারপরে আবার কালো। গোমড়া মুখে জামাল ভাইয়ের সামনে গিয়ে দাঁড়লাম। বললাম, 'টাকাও জোগাড় করতে পারিনি, পয়সাও জোগাড় করতে পারিনি।' বললেন, 'ও তাই বুঝি কবির মুখমণ্ডলে মেঘের আনাগোনা। দৃষ্টিস্ত্য করবেন না, ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দিন, ক্যাসেট আপনার বেরবেই ইনশাআল্লাহ, আমি নাজির ভাইয়ের সাথে আলাপ করছি।'

জামাল ভাই ঠিকই কথা বলেছিলেন এবং প্রফেসর একে এম নাজির আহমদ ভাই- বর্তমান সময়ের জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর- রাজী হয়েছিলেন।

নাজির ভাই মূলত গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, এক কথার মানুষ। আমাকে ডাকলেন এবং বললেন, 'ক্যাসেট বের করার জন্যে যা লাগবে আমরা দেবো কিন্তু তোমরা সাইমুম শিল্পীগোষ্ঠী পাবে না কিছুই।'।

আমি খুব খুশি হয়ে গিয়েছিলাম সেদিন এবং একটি দুঃসময়ে নাজির ভাইয়ের ঔদার্যে মুগ্ধ হয়েছিলাম। মুগ্ধ হয়েছিলাম এই কারণে যে, যেখানে কেউ একটি টাকা, একটি পয়সাও দিতে রাজী হয়নি, সেখানে একটি ক্যাসেট বের করার যাবতীয় ঝুঁকি মাথায় পেতে নিলেন মোহতারাম নাজির ভাই।

পরবর্তী সময়ে আরো ইসলামী গানের ক্যাসেট ইসলামিক সেন্টার থেকে বের হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী সবগুলো ক্যাসেটের সম্মানী নাজির ভাই দিয়ে দিয়েছেন। কোনোটার তিন হাজার, কোনোটার পাঁচ হাজার। যা আজকের পনের-বিশ হাজার টাকার মূল্যমানের সমান।

ইসলামী গানের শত শত ক্যাসেট বের হচ্ছে এখন। কিন্তু ইসলামী গানের প্রথম ক্যাসেটটির সঙ্গে জামাল ভাই এমনভাবে মিশে আছেন যে, তাকে কখনো মুছে ফেলা যাবে না-ইসলামী গানের ক্যাসেটের ইতিহাস থেকে। ইসলামী কবিতা আবৃত্তির ক্যাসেটও এদেশে সিদ্দিক জামাল ভাই-ই প্রথম বের করেছিলেন।

এ ক্যাসেটের অধিকাংশ কবিতাই নজরুলের এবং ফররুখের।

বাংলাদেশের প্রখ্যাত আবৃত্তিকাররা ঐ ক্যাসেটে কণ্ঠ দিয়েছেন। কণ্ঠ দিয়েছেন শফি কামাল ভাই, কাজী আরিফ প্রমুখ। প্রখ্যাত চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব এবং অসাধারণ আবৃত্তি শিল্পী গোলাম মোস্তফা সাহেবের কাছেও তিনি নির্দিধায় গিয়েছিলেন। গিয়েছিলেন তার কণ্ঠের জন্যে।

আমার এখনো মনে আছে, জামাল ভাই বলেছিলেন, ‘আমি গোলাম মোস্তফা সাহেবকে বহু অনুরোধ করলাম, নজরুলের ইসলামী কবিতায় কণ্ঠ দিতে রাজী হলেন না শুধু ইসলামী কবিতার ক্যাসেট হওয়ার কারণে।

জামাল ভাই প্রথমত দায়ী ইলাল্লাহ আল্লার দিকে আহ্বানকারী ছিলেন এবং আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী ছিলেন বলেই আবৃত্তি শিল্পকে তিনি যথার্থভাবেই কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তিনি খুব বেশী দূর এগুতে পারেননি। এগুতে পারেননি মূলত যথার্থ পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে।

জামাল ভাইয়ের তত্ত্বাবধানে অনেকগুলো ইসলামী গানের ক্যাসেট বের হলো। এই ক্যাসেটগুলো বের করতে গিয়ে স্টুডিও সম্পর্কিত ধারণা তার অধিকতর পরিপক্ব হলো; প্রচুর অভিজ্ঞতাও হলো। এবং খুব গভীরভাবে উপলব্ধি করলেন- ইসলামী আন্দোলনের জন্যে কেনো একটি স্টুডিও প্রতিষ্ঠার একান্ত প্রয়োজন।

শেষ পর্যন্ত একটি স্টুডিও প্রতিষ্ঠা করে ছাড়লেন তিনি। ঐ স্টুডিওটিই এখন আল মানার অডিও-ভিজুয়াল সেন্টার নামে বিখ্যাত।

ইসলামী আন্দোলন, ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ইতিহাসে অন্তত বাংলাদেশে আল মানার অডিও ভিজুয়াল সেন্টার প্রথম বিন্দু। বিন্দুয়কর এই ইতিহাসের স্রষ্টাও জামাল ভাই এবং জামাল ভাই-ই ঐ সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক। অনেকেই অভিযোগ করেন, ‘ইসলামী আন্দোলনের নেতারা কিছুই বুঝতে চান না।’ আমি এই নীতিমালাকে অগ্রাহ্য করি এবং বলি, বরং তাদেরকে

যা খুশি তাই বোঝানো যায় না এবং যা কিছু কল্যাণকর বোঝাবার মতো যোগ্যতা থাকলে ঠিকই বোঝানো যায়।

আমি যতোদূর জানি, জামাল ভাই ছিলেন ঐ প্রথম শ্রেণির মানুষ, বোঝাবার দলের যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষ। আল মানার অডিও ভিডিয়াল সেন্টার তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

আমি একটি বিষয়কে খুব গভীরভাবে বিশ্বাস করি যে, জীবন-মৃত্যুর মালিক যেমন আল্লাহ রাক্বুল আলামীন, তেমনি সম্মান-অসম্মানের মালিকও তিনি। তিনি যদি কাউকে সম্মানিত করতেই চান, তাহলে তাকে অসম্মানিত করবার শক্তি কারোরই নেই।

এ দেশের অবিসংবাদিত ছাত্র সংগঠনের নাম ইসলামী ছাত্রশিবির। কিন্তু ক'জনই বা জানে যে, ইসলামী ছাত্রশিবির এই ইতিহাস সৃষ্টিকারী নামটির প্রথম প্রস্তাবক কে? আল্লাহ রাক্বুল আলামীন জামাল ভাইকে চিরকালের জন্যে সম্মানিত করবেন বলেই ইসলামী ছাত্রশিবিরের মতো তাৎপর্যপূর্ণ নামের প্রস্তাবক হিসেবে তাকেই কবুল করেছেন।

ইসলামী ছাত্রশিবিরের সঙ্গে আমার সম্পর্ক হচ্ছে অফুরন্ত আবেগের সম্পর্ক। সেই জন্যে ঐ সংগঠনের নামটির সঙ্গেও আমার একটি আত্মিক সম্পর্ক বিদ্যমান। বস্তুত ঐ আত্মিক সম্পর্কের কারণেই জামাল ভাইকে আমি আমার হৃদয়ের গহীন গভীরে নামকের মতোই অবলোকন করেছি এবং করেছি বলেই বাংলাদেশের ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বিষয়ে লেখালেখি করতে গেলেই যথার্থ সময়ে, জামাল ভাইয়ের ঐ নামকরণের প্রসঙ্গটি তুলে ধরেছি এবং চেয়েছি যে, সিদ্দিক জামাল ভাইয়ের ঐতিহাসিক অবদানের কথা মানুষ জানুক, জানুক তার প্রজ্ঞা সম্পর্কে, জানুক তার দূরদর্শিতার সম্পর্কে।

আমি ভুলে যাইনি যে, সিদ্দিক বাজার কমিউনিটি সেন্টারে কেন্দ্রীয় সদস্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মধ্যে সে সময়ের তুখোড় ছাত্রনেতা আবু নাসের মোহাম্মদ আব্দুজ্জাহের ভাই, মীর কাশেম আলী মিন্টু ভাই প্রমুখ। প্রকৃতিগতভাবে লাজুক হবার কারণে আমি কোনো দিন মিছিলের সামনেও থাকতে পারি না, কোনো সমাবেশের সামনে থাকতে পারি না। সিদ্দিক বাজার কমিউনিটি সেন্টারের ঐ কেন্দ্রীয় সম্মেলনেও আমি তাই বসে আছি পেছনের সারিতে। সহসা সিদ্দিক জামাল ভাইকে দেখলাম কাকে যেনো খুঁজছেন। আমাকে দেখতে পেয়ে, দ্রুত পায়ে আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন, তারপর একটুখানি ঝুঁকে গিয়ে কানে কানে বললে, “বাংলাদেশে ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের অগ্রযাত্রা শুরু হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির নামে। আপনি এই ছাত্রশিবির নামেই একটি গান

লিখে ফেলুন। আমার যতদূর ধারণা, শেষ পর্যন্ত এই নামটাই গৃহীত হবে।” হয়েছিলোও তাই।

সত্যি সত্যিই ছাত্রশিবিরের নামে আমি সেদিন তাত্ক্ষণিকভাবে একটি গান লিখেছিলাম এবং গেয়েও ছিলাম নাসের ভাই, মিন্টু ভাইসহ সবাই সেদিন খুশি হয়েছিলেন খুব। কিন্তু জামাল ভাই যে কী পরিমাণ আনন্দিত হয়েছিলেন, তা পরিমাপ করার ভাষা, তা পরিবেশন করার ক্ষমতা আমার নেই। অনেক মূল্যবান গানের মতো বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের নামে লেখা ঐ গানটিও আমার হারিয়ে গেছে। অবশ্য পতাকাকে নিয়ে লেখা গানটি এখনো কোনো একটি ক্যাসেটের মধ্যে লুকিয়ে আছে। দুটি লাইন তার এ রকম :

আমাদের পতাকা রক্ত রাঙা

সবুজ সবুজ আহা! নিবিড় মধুর

তাকবীর আঁকা পথে চাঁদ যেনো

ডাকে বহুদূর, বহুদূর, বহুদূর।

ঐ যে বলেছিলাম না- আল্লাহ যাকে সম্মান দেন কেউ তাকে অসম্মানিত করতে পারে না। তাইতো আল্লাহ রাক্বুল আলামীন সিদ্দিক জামাল ভাইকে এ দেশের তৌহিদী জনতার প্রাণের স্পন্দন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির নামের প্রস্তাবক হিসেবে কবুল করেছেন আর ডা. মোহাম্মদ মোরশেদ আলী ভাইকে কবুল করেছেন শিবির সঙ্গীতের রচয়িতা হিসেবে, সুরকার হিসেবে। আসলে আল্লাহ কাকে যে কিভাবে গ্রহণ করবেন, তা তিনিই জানেন। সুতরাং মানুষের উচিত নিরন্তর কাজ করে যাওয়া এবং একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করা।

জামাল ভাইয়ের কথা বলতে বলতে মোরশেদ আলী ভাইয়ের কথা যখন এসেই গেলো, তখন তাকে নিয়ে অর্থাৎ তার শিবির সঙ্গীত নিয়ে সংক্ষেপে দু'টো কথা বলেই ফেলি। খুব সম্ভব ১৯৭৭-৭৮-এর দিকে হবে। বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সাথী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, ইডেন হোটেল ময়দানে। আমরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নিচ্ছি, রাত-দিন খাটছি। এই সময়ে হঠাৎ একদিন একটি ক্যাসেট দিয়ে ডা. মোহাম্মদ মোরশেদ আলী ভাই বললেন, “এই ক্যাসেটে শিবিরের জন্যে লেখা একটি গান আছে, আমিই লিখেছি, আমিই সুর করেছি, গেয়েও দিয়েছি।”

মোরশেদ ভাইয়ের কথায় আমি খুব কৌতূহল অনুভব করলাম এবং ঐ দিন গতো রাতে ক্যাসেটটি বাজিয়ে শুনলাম। হেড়ে গলার তুমুল কাণ্ডকারখানা দেখে আমি তো হেসেই খুন। ওরে বাপরে বাপ, মোরশেদ ভাইয়ের নির্মম গলার সে কি হাহাকার।

তবু বুঝতে পারলাম এ গান কালজয়ী হবে এবং নিঃসন্দেহে এ গান ছুঁয়ে যাবে লক্ষ লক্ষ নওজোয়ানের ঈমানের নূর নির্মিত নয়্যা দিগন্ত।

ডা. মোরশেদ আলী ভাইয়ের গাওয়া গানের ক্যাসেট বাজিয়ে বাজিয়ে যখন শিবির সঙ্গীতটি শিখতে শুরু করেছিলাম অস্তুত শিল্পী আবুল কাশেম ভাইয়ের হাসি আমি কোনোক্রমেই ঠেকাতে পারছিলাম না। শিল্পী তাফাজ্জল হোসাইন খান ভাই, শিল্পী হাসান আখতার চাচা বরাবরই মুরকি ধরনের কিন্তু তারাও হাসির গমকে গমকে হারিয়ে যাচ্ছিলেন। আমিও কারো থেকে কম যাইনি সেদিন।

বস্তুত সবাই সেদিন মোরশেদ ভাইয়ের বিকট গলা শুনে হেসেছিলাম ঠিকই কিন্তু বুঝতেও পেরেছিলাম যে, ঐ গানের তুলনা হয় না।

সব শিল্পীকে সেদিন বলে দিয়েছিলাম, সম্মেলনের আগে কোনোক্রমেই এ গান গাওয়া যাবে না কোথাও। একমাত্র সম্মেলনেই গাইতে হবে এবং এবারের সম্মেলনে এ গানই হবে আমাদের শ্রেষ্ঠ গান। হয়েছিলোও তাই।

তাই বলছিলাম, কবুলের বিষয়টি সম্পূর্ণ আল্লাহরই বিষয়। তা না হলে শিবিরের জন্যে লেখা প্রথম গানটি আমার কোথায় কালের ধুলোয় মিশে যাবে কেন? অন্য দিকে ডা. মোরশেদ আলী ভাইয়ের লেখা শিবির সঙ্গীতটি আজ প্রতিদিনই সারা বাংলাদেশের আকাশ বাতাস মুখরিত করে চলেছে- আলহামদুলিল্লাহ।

সম্প্রতি ডা. মোরশেদ আলী ভাইয়ের কাব্য সমগ্র বেরিয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের কোনো এক দেশে এখনো তিনি কর্মরত। এককালে শিবিরের কার্যকরী পরিষদের সদস্য ছিলেন।

মূল স্মৃতিচারণ আমার সিদ্দিক জামাল ভাইকে নিয়ে, তাই সচেতনতার সঙ্গে সেদিকেই ফিরে আসছি।

সিদ্দিক জামাল ভাইকে আমি আমার এক অসম্ভব দরদী মানুষ হিসেবে পেয়েছিলাম। অন্যরা কে কিভাবে তাকে পেয়েছেন, তা তারাই ভালো বলতে পারবেন।

আমি তখন বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারে কর্মরত। আল্লামা আবদুল মান্নান তালিব ভাই ‘মাসিক কলম’র সম্পাদক আমি তার সহকারী। একদিনের কথা। কাজ করতে করতে বিকেল গড়িয়ে গেছে। আমার বড় ভাইয়ের ছেলে হাফেজ আবু সাঈদ মল্লিক আমার মেজো ভাইঝিকে নিয়ে হাজির।

আবু সাঈদকে বললাম, “কি ব্যাপার? মমতাজ এসেছে কেনো?” সাঈদ যা বললো তাতে আমার মাথায় বাজ পড়ার মতো অবস্থা। বাড়ি থেকে বড় ভাইয়ের সাথে রাগারাগি করে এসেছে। কোনোক্রমেই সে আর বাড়ি ফিরে যাবে না।

এক মহাসমস্যায় হাবুডুবু খেতে লাগলাম। তখনো আমি সংসার বাঁধিনি। মেসেই থাকি। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। এখন আমি ঐ ডিগ্রী পড়ুয়া মেয়েকে নিয়ে যাই কোথায়? বাথরুমে গিয়ে কাঁদলাম কিছুক্ষণ, তারপর ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করা শুরু করতেই জামাল ভাইয়ের কথা মনে পড়লো। জামাল ভাইও তখন ইসলামিক সেন্টারে কর্মরত। ভাগ্য আমার ভালো। পেয়ে গেলাম জামাল ভাইকে। খুলে বললাম সব। আমার অসহায় অবস্থার কথা বিবেচনা করলেন তিনি এবং বললেন, “আপাতত আমার বাসায়, আপনার ভাবীর কাছে রেখে আসেন, তারপর ভেবে-চিন্তে একটা কিছু করলে হবে।”

সেদিনের কথা ভাবলে আমার গা এখনো শিউরে ওঠে। আল্লাহ না করুন, এ এক মহৎ সহযোগিতা যদি জামাল ভাই না করতেন তাহলে আমার মতো একটা হৃদ হতভাগার অবস্থাটা কী দাঁড়াতো।

ঐ মেয়ে এখন সিলেটে আছে। আমার এক পরম প্রিয় কর্মী কাওসারের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলাম। মহিলা মাদরাসায় শিক্ষকতা করছে। জামায়াতের রোকন।

সিদ্দিক জামাল ভাই বাংলাদেশের সমস্ত শহীদদের স্মৃতি রক্ষার জন্য চমৎকার একটা উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। অনেক বার তিনি আমাকে অনুরোধ করেছিলেন ঐ উদ্যোগের সঙ্গে জড়িত হতে। কিন্তু আমি খুব কৌশলে এড়িয়ে গেছি ঐ প্রস্তাব। কেনো এড়িয়ে গেছি?

আগেই বলেছি, শহীদদের স্মৃতি সংরক্ষণে সিদ্দিক জামাল ভাই একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছিলেন এবং এ প্রকল্পের কাজ দ্রুত সম্পাদনার জন্য আমাকেও জড়িত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমি কোনক্রমেই জড়িত হইনি। একান্ত আমারই দুর্বলতার কারণে জড়িত হয়নি।

আমার সেই একান্ত দুর্বলতার খবর অনেকেই জানে না, কেউ কেউ জানে। সেই দুর্বলতা হচ্ছে- আমি মনে করি, সত্যিই আমি অযোগ্য, একজন বড় ধরনের অযোগ্য লোক, আমাকে দিয়ে এক সঙ্গে একাধিক কাজ সম্ভব হয়ে ওঠে না।

এক সঙ্গে অনেক কাজ করতে পারার মতো বহু লোক আমি অবশ্য দেখেছি। মরহুম এহিয়া সাহেব তখন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক। কোনো একদিন কোনো এক কাজে ভয়ে ভয়ে ঢুকলাম তার অফিস কক্ষে। ঢুকে আরো ভয় পেয়ে গেলাম, দেখি দুটো টেলিফোন দুই কাঁধে, একটা হাতে এবং অন্য হাতে কলম। সবগুলো টেলিফোনে ধারাবাহিকভাবে তিনি কথা বলছেন, আবার সইও করছেন। প্রায় একই দৃশ্য কখনো কখনো আমি শাহ আবদুল হান্নান ভাই, মীর কাশেম আলী ভাই এবং নাসের ভাইয়ের অফিসে দেখেছি, দেখার সুযোগ হয়েছে। আসলে যারা পারেন, তারা একসঙ্গে অনেক পারেন। কিন্তু যারা পারেন না, তারা ভালোমতো একটাও পারেন না। আমি হচ্ছি এই দ্বিতীয় দলের লোক।

শহীদ স্মৃতি প্রকল্পের সঙ্গে নীতিগতভাবে জড়ানোর জন্যে সিদ্দিক জামাল ভাই একবার মিটিং-এ হাজির হতে বলেছিলেন এবং বলেছিলেন বিশেষভাবে। প্রকল্পের প্রধান তখন মরহুম অধ্যাপক ইউসুফ আলী সাহেব। তিনি আমাকে বেশ স্নেহ করতেন। আমি আমার অপারগতার কথা খানিকটা স্পষ্ট করে কিভাবে যেনো মিটিংয়ের মধ্যেই বলে ফেলেছিলাম এবং অব্যাহতিও আদায় করে নিয়েছিলাম। জামাল ভাই খুবই অশুশি হয়েছিলেন সেদিন কিন্তু আমি হয়েছিলাম বেজায় খুশি। এ জন্যে যে, ‘মাসিক কলম’র দায়িত্ব পালন করে আমি আসলেই প্রকল্পের কাজ করতে পারবো না এবং পারবো না যখন, তখন জামাল ভাই আরো অশুশি হবেন। মূলত আমি চাইনি জামাল ভাই অনেক অনেক অসন্তুষ্ট হন।

জামাল ভাই ঐ বিষয় নিয়ে আর কোনো দিন কোনো কথা বলেছেন বলে মনে পড়ে না। বরং ঐ ঘটনার পরে যেখানে সম্পর্কের মধ্যে চিড় ধরার কথা ছিলো, সেখানে একেবারে কিছুই হয়নি শেষ অবধি। এক মহত্বপ্রাণ মানুষের নাম সিদ্দিক জামাল। আমাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে তিনি। কিন্তু তার মহানুভবতার টুকরো টুকরো স্মৃতিগুলো এখন অনিরুদ্ধ কান্নার মতো গুমরে গুমরে ফিরছে।

সিদ্দিক জামাল ভাইয়ের ছিলো গঠনমূলক বিচিত্র ভাবনা। সেই ভাবনা থেকে তিনি একশ্রেণির এনজিও’র অপকর্মের বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন এবং ছোট্ট অথচ প্রয়োজনীয় একটি পুস্তিকাও রচনা করেছিলেন ও সূচনা করেছিলেন যৌথভাবে প্রখ্যাত সাংবাদিক সাইফুল ইসলাম ভাইয়ের সঙ্গে। পুস্তিকাটি যথেষ্ট তথ্যবহুল এবং অল্প সময়ের মধ্যে চোখ খুলে দেয়ার মতো।

একদিন। খুব সম্ভব দুপুর বেলা। হ্যাঁ, দুপুরবেলাই। প্রত্যাশা প্রাক্কণে আমার অফিসে বসে কাজ করছি। হঠাৎ দেখি জামাল ভাই। হাতে এক বাস্তিল বই। চেয়ার ছেড়ে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে জামাল ভাইয়ের আগেই সালাম করলাম। হাত থেকে বইগুলো নিলাম। ততোক্ষণে জামাল ভাই বারান্দা থেকে অফিসের ভেতরে আসতে আসতে বললেন, ‘নিয়ে এলাম আপনার জন্য, পড়বেন। বড় কাজ তো আর করা হলো না। করলাম একটা ছোট্ট কাজ। আপনার এখানে তো বড় বড় লেখক আসে, বুদ্ধিজীবী আসে, দু’একজনকে দেবেন।’

প্রায় এক নিঃশ্বাসে জামাল ভাই যখন ঐ কথাগুলো বলতে লাগলেন, আমি লক্ষ্য করলাম, তার চোখ, তার কণ্ঠ এবং তার হাসির ভেতর থেকে স্নেহ-মমতার একটা বহতা নদী বয়ে চলেছে। আমি খানিকটা অনুযোগের সুরে বললাম, ‘একটা ফোন করলেই তো হতো, আমি নিজেই গিয়ে নিয়ে আসতাম, এত কষ্ট করতে গেলেন কেন?’ জামাল ভাই একটু শব্দ করে হেসে উঠলেন এবং বললেন, ‘মীর কাশেম আলী ভাইয়ের সঙ্গে একটু কাজও ছিলো, তাছাড়া কবেই বা যাবেন আপনি আর

কবেই বা আনবেন।' জামাল ভাই সেদিন আমার দাওয়াত গ্রহণ করেছিলেন, দুপুরে খেয়েছিলেন, বিশ্রামও নিয়েছিলেন, একটানা বিকেল পর্যন্ত ঘুমিয়ে বড় মগবাজার ফিরেছিলেন বিকেলে।

এ দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গবেষক কবি এবং আমার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলায় অনার্স পড়াকালীন সময়ের শিক্ষক পরম শ্রদ্ধেয় আবদুল মান্নান সৈয়দ স্যার প্রায়ই বলেন, 'একজন লেখকের একটি সাহিত্য পত্রিকা থাকা উচিত এবং একই সঙ্গে থাকা উচিত একটি সাহিত্য সংগঠন।' এর ব্যাখ্যায় তিনি বলে থাকেন- নিজের পত্রিকা না থাকলে, নিজের মতো করে নিজের মানস সম্পত্তির চাষাবাদ করা যায় না এবং নিজের একটি সাহিত্য সংগঠন না থাকলে নিজের পছন্দসই লেখা পাওয়াটাও দুরূহ হয়ে পড়ে।

মান্নান সৈয়দ স্যারের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আমি অন্তত দশ বছর আগে পরিচিত হয়েছিলাম। কিন্তু পরশ্রীকাতরতার এই দেশে কখনো আমি আমার ঐ স্যারের দর্শনকে বাস্তব রূপ দেবার জন্যে অগ্রসর হতে পারিনি। পারতপক্ষে এ বছরের শুরুর দিকেই কেবল অগ্রসর হয়েছিলাম। অগ্রসর হয়েছিলাম একটি সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে তোলার জন্যে। সঙ্গে নিয়েছিলাম যশোরের আবুল কালাম আজাদ ভাইকে। উদ্দেশ্য ছিলো খানজাহান আলী (রহ.)-এর স্মৃতিবিজড়িত অঞ্চলের মানুষের মধ্যে একটি সম্বন্ধ গড়ে তোলা। মাধ্যমটির নাম দিয়েছিলাম, 'খানজাহান আলী সমাজ শিক্ষা ও সংস্কৃতিকেন্দ্র।' কেন্দ্রের উদ্যোগে এ পর্যন্ত একটি অনুষ্ঠানই করতে পেরেছি আমরা। আমাদের ঐ প্রথম অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে দাওয়াত দিয়েছিলাম সিদ্দিক জামাল ভাইকে। দৈনিক সংগ্রামে বিজ্ঞাপনও ছাপিয়েছিলাম। বিজ্ঞাপন ছাপিয়েছিলাম সিদ্দিক জামাল ভাইয়ের নামসহ। আমাদের ঐ অনুষ্ঠানের খানিক আগেই জামাল ভাই এসে পৌঁছে গিয়েছিলেন এবং আমার সঙ্গে দেখা হতেই বলেছিলেন, 'আজকাল কেউতো আমাকে ডাকে না, আপনারা আবার ডাকতে গেলেন কেনো?'

কারোরই বুঝতে কষ্ট হবার কথা নয় যে, জামাল ভাইয়ের ঐ উচ্চারণের মধ্যে আছে প্রচ্ছন্ন বেদনার আতঁস্বর।

অনুষ্ঠানে শোকাহত এক গান গেয়েছিলো সন্দীপন শিল্পীগোষ্ঠীর কোনো শিল্পী। আখেরাতের বর্ণনাও ছিলো সে গানে। কেনো যেনো জামাল ভাই খুব কেঁদেছিলেন সেদিন। আরো একদিন কেঁদেছিলেন জামাল ভাই। কাঁদতে কাঁদতে তিনি তার দাড়ি ভিজিয়ে ফেলেছিলেন। ঐ কান্না ছিলো তার একটি সন্তানের বিয়েকে কেন্দ্র করে। এমন অসহায়ের মতো আমি আর জামাল ভাইকে কখনো কাঁদতে দেখিনি। তিনি কাঁদতে কাঁদতে দাড়ি ভিজিয়ে ফেলেছিলেন এটা আমি শুধু শুধুই বলিনি। আসলেই তিনি ঐ সময়ে দাড়ি ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং ছেড়ে

দিয়েছিলেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় নেতা মাওলা মুফতী আবদুস সাত্তার এমপি সাহেবের মতো। সিদ্দিক জামাল ভাইয়ের ঐ দাড়ি দেখলে তার আকা মরহুম মওলভী ইসহাক সাহেবের কথা মনে পড়তো। সত্যিই তার দাড়ি ছিলো দেখার মতো দাড়ি এবং মওলভী সাহেবের ক্রয়গলও ছিলো আরো দেখার মতো।

জামাল ভাইয়ের কান্না সেদিন আমাকেও কাঁদিয়ে ছেড়েছিলো এবং কাঁদতে কাঁদতে বারবার শুধু বলছিলেন, 'মল্লিক, আমাকে শেষ করে দিয়েছে, আমি শেষ হয়ে গেছি।' মনে পড়ে না যে, আমি জামাল ভাইকে কোনো দিন উপদেশ দিয়েছি। কিন্তু সেদিন উপদেশ দিয়েছিলাম একেবারে মুরব্বির মতো। উপদেশ দিয়েছিলাম, 'জামাল ভাই, আপনার অবিরাম প্রচেষ্টার ফলে কত তরুণ আল্লাহর দ্বীনের আলো পেয়ে ভালো হয়ে গেছে, ওদেরকে ঐ উদ্দেশ্যেই কাছে টেনে নিন, স্নেহ দিন, আদর দিন, ক্ষমা করে দিন এবং নিরন্তর দোয়া করুন- দেখবেন ওরা আপনার মনের মতো হয়ে গেছে।

আর একবার জামাল ভাইকে খুব কষ্ট পেতে দেখেছিলাম। সেই কষ্টটা অবশ্য অন্য রকম এবং দীর্ঘস্থায়ের সুখ মেশানো কষ্ট। আর্ন্তর্যের সঙ্গে মেশানো কষ্ট।

প্রেস ব্যবসায়ে সিদ্দিক জামাল ভাই তখন চরমভাবে মার খেয়ে একেবারে পথে বসে গেছেন। ঋণে ঋণে দিশেহারা, শেষ সম্বলটুকু পর্যন্ত হারিয়ে তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা দেউলিয়া ছাড়া আর কিছুই নন।

মনে পড়ে, একবার দৈনিক সংগ্রামের সামনে থেকে জামাল ভাই আমাকে তার সদ্য প্রতিষ্ঠিত প্রেসটিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়েছিলেন। খুবই ভালো লেগেছিলো শুধু এই ভেবে যে, মুদ্রণকর্মকাণ্ডের সঙ্গে জামাল ভাইয়ের দীর্ঘ দিনের সম্ভাব সুতরাং ভালো করবেন ইনশাআল্লাহ। আবার ভয়ও পেয়েছিলাম এই ভেবে যে, বলতে গেলে জীবনের পড়ন্ত বেলায় এসে ব্যবসায় নেমে পড়লেন জামাল ভাই- পারবেন তো?

ভয় পেয়েছিলাম এ জন্যেও যে, জামাল ভাইতো আগে কখনো ব্যবসা করেননি, সে অভিজ্ঞতা তার নেই, সেই সঙ্গে ব্যবসা দাঁড়াতে গেলে লোকসানের ঝুঁকি নিতে হয়, তাছাড়া সম্পূর্ণ অন্যের টাকার উপর নির্ভরশীল ব্যবসায় লাভ করে ঋণ পরিশোধ করা, সঙ্গে সঙ্গে সংসারের ঘানি ঠেলা কিভাবে সম্ভব? আমি সত্যিই ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম বলে প্রেস থেকে বেরুতে বেরুতে এই দোয়াই করেছিলাম- আল্লাহ জামাল ভাইকে রক্ষা করো।

পরে শুনেছি, প্রেস ব্যবসায় জামাল ভাই শেষ পর্যন্ত দাঁড়াতে পারলেন না যতোগুলো কারণ, তার মধ্যে অন্যতম কারণ হলো বাড়িওয়ালাদের হঠাৎ নোটিশ, বাড়ি ছেড়ে দেয়ার নোটিশ, আমিও একবার ব্যবসায়ের ঝুঁকি নিতে

চেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম ছোট একটা বইয়ের দোকান দেবো, বইয়ের দোকানের সঙ্গে মানানসই অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রীও থাকবে- সংসারটা চলে যাবার মতো কিছু পয়সা-কড়ি হলেই হলো, মাথাটা উঁচু করে ইসলামী আন্দোলন করবো।

সত্যি কথা বলতে কি? চাকরি-বাকরি করে আর যাই হোক, মাথা উঁচু করা যায় না। আর মাথা উঁচু করতে না পারলে মনের মতো করে ইসলামী আন্দোলনও করা যায় না।

তবুও আমার ব্যবসা করা হলো না এই ভেবে যে, আমি যখন মাত্র একটা মানুষ ছিলাম, ঠিক তখনই ব্যবসায় নেমে পড়লে ভালো হতো, যেমন নেমে পড়েছিলেন আল্লামা আবুল কালাম মোহাম্মদ ইউসুফ সাহেব। কিন্তু এখন তো আমি অনেকগুলো মানুষ। সন্তানদের মুখের দিকে তাকিয়ে চাকরি আমার করতেই হবে। ওদেরকে ভালো মতো লেখা-পড়া শিখিয়ে ইসলামী আন্দোলনের যথার্থ সৈনিক বানিয়ে দিতে পারলেই হলো। না হয়, আমার গোলামীর বিনিময়ে ওরা হবে আল্লাহর দ্বীনের স্বাধীন সৈনিক।

যদিও আমার চাকরিটা সত্যিকার অর্থে গোলামী বলতে যা বোঝায় তা নয়- তবুও চাকরিকে চাকরি মনে করার মধ্যে কল্যাণ আছে। এ ধরনের চাকরিকে স্বাধীন চাকরিও বলা যায়।

জামাল ভাইও শেষ পর্যন্ত একটি স্বাধীন চাকরি গ্রহণ করেছিলেন।

বেশ কয়েক বছর আগের কথা। ‘মেডিটেশন’ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন সিদ্দিক জামাল ভাই এবং ঐ সময়ে আমাদের কিছু পরিচিত জনকেও দেখলাম, মেডিটেশন নিয়ে ব্যস্ত হতে। জামাল ভাই আমাকেও খুব অনুপ্রাণিত করলেন। অনুপ্রাণিত করলেন মেডিটেশন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ নেয়ার জন্য এবং এ ব্যাপারে শহীদ আল বোখারী সাহেবের সাথে যোগাযোগ করতে বললেন।

জামাল ভাইয়ের ঐ পরামর্শ শেষ পর্যন্ত আমাকে খুব একটা তাড়িত করতে পারেনি। কেননা শৈশব থেকে আমার মধ্যে আত্মিক শক্তি অর্জনের ক্ষেত্রে কুরআনের আমলই সবচেয়ে বড় মাধ্যম বলে কাজ করেছে এবং কুরআনের সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের মধ্য দিয়েই ক্রমাগতভাবে ঐ আমলের পরিপূর্ণতা আসতে পারে বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে এসেছি। একমাত্র সেই কারণে পরামর্শ আমার পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। তেমনি আজো অন্য কারো পরামর্শ গ্রহণ করা সম্ভব হলো না।

সিদ্দিক জামাল ভাই আমার কোনো বাদ প্রতিবাদ না করা সত্ত্বেও মেডিটেশনের ব্যাপারে কোনো দিন আর কোনো কথা বলেছেন বলে মনে পড়ে না। সম্ভবত আমার মনোভাব সম্পর্কে তার একটি ইতিবাচক ধারণার উদ্ভব ঘটেছিলো।

আসলে জামাল ভাইকে বরাবরই দেখেছি- যা নিয়ে বাড়াবাড়ি করার আদৌ কোনো দরকার নেই, তা নিয়ে তিনি বাড়াবাড়ি করতেন না, সত্যিই করতেন না।

বিগত পর্বে আমি একেবারে শেষের দিকে বলেছিলাম মুদ্রণ ব্যবসায় মার খেয়ে যাবার পর জামাল ভাই একটি স্বাধীন চাকরি গ্রহণ করেছিলেন। গ্রহণ করেছিলেন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় প্রকাশনা বিভাগে এবং এই চাকরিটা পাবার পর থেকে জামাল ভাইয়ের মধ্যে একটি ইতিবাচক আলোড়ন লক্ষ্য করছিলাম। মনে হয়েছিলো কর্মঠ-কর্তব্যপরায়ণ এবং সৃষ্টিশীল এক জামাল ভাই পূর্বাচলের দিগন্ত রাঙিয়ে আবার উদিত হবেন।

কেন্দ্রীয় জামায়াত সিদ্দিক জামাল ভাইকে প্রকাশনা বিভাগের কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ প্রদানের খবর পেয়ে আমি যারপর নাই আনন্দিত হয়েছিলাম এবং এক অনির্বচনীয় আবেগে বলে ফেলেছিলাম এ দেশের ইসলামী আন্দোলন যে সন্দেহাতীতভাবে খাঁটি তার আরো একটি নীরব নজির তৈরী হয়ে থাকলো এবং এও বলেছিলাম যে, জামাল ভাইয়ের মতো একজন সর্বহারা মানুষের বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করে দেয় যে সংগঠন, সে সংগঠন যথার্থ অর্থে সুসংগঠন হিসেবে অবশ্যই একদিন জনগণের মণিকোঠায় স্থান করে নেবে ইনশাআল্লাহ।

জামায়াতের কেন্দ্রীয় প্রকাশনা বিভাগের দায়িত্ব পাবার পর থেকে জামাল ভাই মাঝে মধ্যেই ফোন করতেন আমাকে এবং নানা কারণে আমাকে প্রায়ই যেতে বলতেন এবং বলতেন, ‘আল ফালাহতে তো প্রায়ই আসেন, ঘুরে যেতে পারেন না?’ আমি জামাল ভাইকে সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারতাম না। এটা বলে, ওটা বলে প্রসঙ্গ পাল্টাতে চাইতাম বরং মূল কথাটা বলতে পারতাম না যে, ‘ভুলে গিয়েছিলাম’।

আসলেই মাঝে-মধ্যে আমি খুব বড় ধরনের ভুল করে ফেলি। যেমন একবার মোংলা পোর্টের দিকে যাবো বলে লঞ্চের উঠে চলে গিয়েছিলাম শরীনা মাদরাসায়। এবং আর একবার বোরখাওয়ালী এক মহিলাকে আমি আমার বউ ভেবে ব্রিফকেসের চাবি দিয়ে দিয়েছিলাম।

সিদ্দিক জামাল ভাই যেমন এক সময় বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের কর্মকর্তা ছিলেন। তেমনি কর্মকর্তা ছিলেন জনাব শরীফুর রহমান ভাই, বদরুল আলম ভাই। শরীফ ভাই মরহুম আতাউর ভাইয়ের বড় ভাই। আতাউর ভাই কয়েক বছর আগে পর্যন্ত বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের ব্যক্তিগত সহকারী ছিলেন। আর বদরুল আলম ভাই হচ্ছেন খ্যাতিমান আইনজীবী এডভোকেট মশিউল আলম ভাইয়ের ছোট ভাই।

ঐ দু'জনের সাথেই সিদ্দিক জামাল ভাইয়ের এক ঈর্ষণীয় সম্পর্ক ছিলো এবং সম্পর্ক ছিলো জীবনের শেষ যবনিকা পর্যন্ত। জামাল ভাইয়ের জীবনের বহু গোপন কথার নির্ভরযোগ্য সাক্ষী তারা।

ঐ দু'জনের একজন শরীফ ভাই বেশ কয়েক মাস আগে হঠাৎ আমাকে জানালেন, 'জামাল ভাই ইবনে সিনায়, খুবই অসুস্থ এবং লক্ষণ খুব ভালো না, দেখে আসেন'।

দু'একদিন পরে দুরূহ দুরূহ বক্ষে ইবনে সিনায় গেলাম। সিদ্দিক জামাল ভাইয়ের কক্ষে গেলাম। আমাকে দেখেই বলে উঠলেন, 'আপনার যখন যক্ষ্মা হয়েছিলো, আমি তো দেখতে যাইনি, অথচ আমাকে দেখতে এলেন।' এই বলে খুব করে কাঁদতে লাগলেন তিনি।

জামাল ভাইকে সেদিন আমি হৃদয়ের ভেতর থেকে সেবা করতে চেয়েছিলাম। তবু তাড়া ছিলো বলে অল্প কিছুক্ষণ মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছিলাম এবং পাও বানিয়ে দিয়েছিলাম। জামাল ভাই চোখ বুঁজে পড়েছিলেন। তারপর চলে আসার সময় আমি জামাল ভাইয়ের হাতের মুঠোয় কিছু একটা দিতে না দিতেই আবারও কান্না শুরু করলেন। চোখ মেললেন না। গড়িয়ে পড়তে লাগলো অশ্রু। বর্ষা ভেজা কোনো বৃক্ষের পাতার মতো অনবরত কাঁপতে লাগলো তার রোগাক্রান্ত ফ্যাকাশে ঠোঁট।

জামাল ভাইকে দেখে আসার পর বেশ কয়েক দিন মনটা ভারী হয়েছিলো। আরো ভারী হয়ে গেলো যখন শুনলাম জামাল ভাই কোনোদিন আর স্বাভাবিকভাবে পায়খানা করতে পারবেন না। পেট ফুটো করে বিকল্প পথ তৈরী করা হয়েছে। পাইপ দিয়ে ঐ পথেই পায়খানার কাজ সারতে হবে।

বিকল্প পথে পায়খানার কাজ সারতে খুব ঝামেলা হয় কিনা? জিজ্ঞেস করেছিলাম একদিন। ভয়ডরহীন এক হাসি দিয়ে সেদিন তিনি বলেছিলেন, 'সারাজীবন এভাবেই যা নিয়ে চলতে হবে, আগেভাগে তাকে স্বাগত জানানইতো ভালো। আল্লাহর মজুরীর ওপর সম্ভ্রষ্ট থাকায় আরো বেশী কল্যাণ পাবার সম্ভাবনা রয়েছে।' জামাল ভাইয়ের কথা শুনে সত্যিই আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম এবং মনে মনে বলেছিলাম, আমি হলে, কখনোই পারতাম না।

যাই হোক জামাল ভাইয়ের অবস্থা জেনে শুনে আমার হঠাৎ মনে পড়লো বাগেরহাটের কচুয়ার আমিন দুদুর কথা, বর্তমানে বাগেরহাট জেলা জামায়াতের সাংস্কৃতিক বিভাগের দায়িত্বশীল। হ্যাঁ, হঠাৎ মনে পড়লো আমিন দুদুর বন্ধু, আমাদের দ্বীনি ভাই হাকিম ভাইয়ের ছোট ভাইয়ের কথা। আমাদের হাকিম ভাইকে তখন

নায়কের মতো দেখাতো। তার ছোট ভাইটাকেও খুব সুন্দর দেখাতো। জামাল ভাইয়ের মতো তারও অপারেশন করা হয়েছিলো। পায়খানার জন্য বিকল্প পথ তৈরী করা হয়েছিলো। কিন্তু অপারেশনের পর সে খুব বেশী দিন বাঁচেনি।

হাকিম ভাইয়ের ছোট ভাইয়ের কথা মনে পড়ার পর থেকে আমার কেবলই মনে হতো, কেবলই মনে হতো আমাদের জামাল ভাই আমাদের মাঝে আর হয়তো খুব বেশী দিন নেই। আশঙ্কা যেন ধূলিধূসরিত হয়, সেই দোয়াই করতে লাগলাম। কিন্তু আবার শরীফুর রহমান ভাইয়ের ফোন ‘জামাল ভাই আহছানিয়া ক্যান্সার হাসপাতালে। অবস্থা ভালো না।’ খবর শুনে মন আর কোনো বাধা মানলো না। এক অজানা দুর্ভাবনায় গা শিউরে উঠলো।

ইতিমধ্যেই জামাল ভাইকে বাসায় ফেরত পাঠানো হলো। ডাক্তাররা না করে দিয়েছে। কোনো চিকিৎসায় আর কাজ হবে না। এই ধরনের একটি বজ্রপাতের মধ্যে জামাল ভাই নিজেই ফোন করলেন, যার সার কথা- ‘আমি বারুইপাড়া মাদরাসার কোনো এক জায়গায় থাকতে চাই, আপনি মুজিব দাদার সাথে কথা বলেন, কবরের জায়গার তো দাম দিতে হয়, সে দেয়া যাবে। আপনি বাসায় আসেন, কথা আছে।’

মুজিব দাদা মানে অধ্যক্ষ মাওলানা মুজিবুর রহমান, বারুইপাড়া সিদ্দিকীয়া সিনিয়র মাদরাসার প্রিন্সিপাল, মাওলানা দেলওয়ার হোসাইন সাঈদী সাহেবের ছাত্র, বাগেরহাটের সাবেক জেলা আমীর, আমাদের সবার মুরব্বি।

জামাল ভাইয়ের অন্তিম ইচ্ছের কথা মুজিব দাদাকে মোবাইল ফোনে বললাম, ‘জামাল ভাই ক্যান্সারে আক্রান্ত, বাসায় আছেন, ডাক্তাররা না করে দিয়েছে, একেবারে এখন তখন অবস্থা, আমাদের মাদরাসার একটু মাটি চেয়েছেন।’ মুজিব দাদা ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললেন, ‘তুমি কোনো চিন্তা করো না, একটা ব্যবস্থা করে আমি আসছি।’

মুজিব দাদার সঙ্গে জামাল ভাইয়ের সম্পর্ক বহুদিনের। এক সঙ্গে প্রাইমারি স্কুলে পড়েছেন। পড়েছেন আমাদের গ্রামের কাছাকাছি একটি গ্রাম, ব্রাহ্মণ রাংদিয়া গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে। ব্রাহ্মণ রাংদিয়া গ্রামের মূল নাম ব্রাহ্মণ রাখ-দিয়া। যে সমস্ত ব্রাহ্মণ খানজাহান আলী (রহ.) কে যুদ্ধজয়ে সাহায্য করেছিলেন, সেই সমস্ত ব্রাহ্মণকে খানজাহান আলী (রহ.) একটা বিরাট এলাকা লাখেরাজ নিষ্কর দিয়ে দিয়েছিলেন বলেই এই গ্রামের নাম ব্রাহ্মণ রাখ-দিয়া। মুজিব দাদা আর জামাল ভাই এই ব্রাহ্মণ রাখ-দিয়া গ্রামেরই প্রাইমারি স্কুলের ছাত্র। জামাল ভাই তখন তার নানাবাড়ি শোতাল গ্রামে থেকে পড়ালেখা করতেন।

মুজিব দাদা জামাল ভাইয়ের অস্তিম ইচ্ছের কথা শুনেই ঢাকায় চলে এলেন। আমরা দু'জনে জামাল ভাইয়ের বাসায় গেলাম। কোনো রকম দেরী না করে।

ঢাকা শহরের কোথাও কোথাও তখন বন্যা। বড় মগবাজারেও বন্যা। আমার বৃকের মধ্যখানেও বন্যা-এই জন্যে যে, সিদ্দিক জামাল ভাইকে শেষবারের মতো মারাত্মক অসুস্থ হয়ে যাবার পর এই প্রথম দেখতে যাচ্ছি।

মগবাজারের বাসায়ই যাচ্ছি। জামাল ভাইয়ের মগবাজারের বাসায় এর আগে কখনও যাইনি। ফোনে জামাল ভাইয়ের বড় ছেলে সাবিতের সাথে কথা বলে বাসার অবস্থান সম্পর্কে একটা ধারণা নিয়েছিলাম। রিকশাওয়ালা ঠিকমতোই আমাদেরকে পৌছে দিলো।

সম্ভবত দোতলায়ই হবে, জোরে জোরে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের মচ্ছব চলছে। মনটা বিধিয়ে উঠলো-হায়রে সমাজ! কারো পৌষ মাস, কারো সর্বনাশ! একই দালানের বাসিন্দা যখন, তখন নিশ্চয়ই জানে যে, এদেরই এক প্রতিবেশী ক্যান্সারে আক্রান্ত, মৃত্যুর পথযাত্রী, তাছাড়া চতুর্দিকে বন্যা তবুও কুৎসিৎ আনন্দ পরিত্যাগ করতে পারিনি।

দুরুদুরু বুক নিয়ে দরজায় নক করলাম। নক করলাম সম্ভবত তিন তলায়ই। দরজা খুলেই সালাম দিল সদ্য কৈশোরোত্তর এক নওজোয়ান। বেশ ভরাট কণ্ঠ-চেষ্ঠা করলে ভালো আবৃত্তি করতে পারবে এই রকম। মুখের কাঠামো দেখেই বুঝলাম-জামাল ভাইয়েরই কোনো ছেলে হবে।

জামাল ভাইয়ের ছেলের পিছনে পিছনে ডানদিকের একটা কক্ষ পেরিয়ে বামদিকের কক্ষে প্রবেশ করলাম এবং প্রবেশ করলাম যখন তখন দম বন্ধ হয়ে যাবার মতো অবস্থা আমার। আমার এই অবস্থা সাধারণত দু'টি কারণে হয়ে থাকে। এক : মাত্রারিক্তি আনন্দে, দুই : মাত্রারিক্তি বেদনায়।

মাওলানা মুজিব দাদা এবং আমি জামাল ভাইকে সালাম দিলাম। এক জিজ্ঞাসু চোখে তিনি আমাদের দিকে তাকালেন। সালামের উত্তর দিলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মুজিব দাদা বললেন, আমাদের এলাকায় আপনি থাকতে চেয়েছেন, এটা আমাদের জন্যে পরম সৌভাগ্যের, আমি একটা ব্যবস্থা করে এসেছি, এ নিয়ে আপনি মোটেই ভাববেন না। জামাল ভাই বললেন, 'কবরের জায়গার দাম আমি দিয়ে দিতে চাই, মাসলা তো তাই? মুজিব দাদা বললেন, 'ওটাও আমরা দেখবো, আপনি ভাববেন না'।

লক্ষ্য করলাম, জামাল ভাই কথা বলছেন, সুস্পষ্ট কিন্তু চোখ তার পানিতে ভরে যাচ্ছে। এ দৃশ্য আমি সইতে পারছিলাম না। আমার চোখও ভিজ়ে উঠলো। তবু

বুকের ব্যথা বুকে চেপে নিয়ে বারবার জামাল ভাইয়ের চোখ মুছে দিতে লাগলাম। আমরা শুরুতেই কবরের ব্যাপারে কথা বলেছিলাম এই জন্যে যে, আমাদের গ্রামে বারুইপাড়ায় তাকে কবরস্থ করার ব্যাপারে তিনি যে আশা করেছিলেন, সে আশা তার পূরণ হবেই-এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ না থাকে।

জামাল ভাই আম পছন্দ করেন। আমরা আম নিয়ে গিয়েছিলাম, খেতে অনুরোধ করলাম। বললেন, পরে খাবেন।

ফ্রেস্টও নিয়ে গিয়েছিলাম। জামাল ভাইয়ের ফ্রেস্ট। ফ্রেস্টটা শ্রেষ্ঠ সমাজ সংগঠক হিসেবে ২০০৩-এ তাকে দেয়ার কথা ছিলো। দেয়ার কথা ছিলো খানজাহান আলী শিল্পীগোষ্ঠীর ৫ম বার্ষিক সাংস্কৃতিক উৎসবে বারুইপাড়ায়। কিন্তু ঐ উৎসবে স্থানীয় এমপি সাহেবকে দাওয়াত না দেয়ায় এমপি সাহেবের লোকেরা পুরো উৎসবটাকেই পণ্ড করে দেয়।

২০০২ সালের শেষের দিকে জামাল ভাইকে যখন জানিয়েছিলাম, বাগেরহাটের বারুইপাড়ায়, খানজাহান আলী শিল্পীগোষ্ঠী তাকে তাদের বার্ষিক উৎসবে শ্রেষ্ঠ সমাজ সংগঠকের পুরস্কার প্রদান করবে, তখন তিনি এতোটা বিস্মিত হয়েছিলেন যে, খানিকটা সময় চুপচাপ থেকে বলেছিলেন, ‘বারুইপাড়ায় অনেকদিন যাই না, যাবো ইনশাআল্লাহ।’ ২০০৩-এর জানুয়ারিতে তিনি, হাসান আবদুল ভাই, মাহবুবুল হক ভাই এবং তার কবি ছেলে শাহেদ হাসনাইন রাবিতকে নিয়ে যাবেন বলে একটা প্রাথমিক প্রস্তুতিও নিয়েছিলেন। কিন্তু উৎসব পণ্ড হয়ে যাবার কারণে শেষ পর্যন্ত যাওয়া হলো না তার।

উৎসবে শহীদ গাজী আবু বকর ভাইকেও শ্রেষ্ঠ মুফাসসির হিসেবে পুরস্কৃত করার কথা ছিল। ঐ পুরস্কারও তার হাতে আর তুলে দেয়া গেল না।

জামাল ভাইয়ের সামনে তার ফ্রেস্টটা তুলে ধরলাম। বেশ খানিকক্ষণ নির্বাক-নিম্পলক ফ্রেস্টটা দেখলেন। পাশের আলমারীর উপর রেখে দিলাম ফ্রেস্টটা তারপর। এক পর্যায়ে বারুইপাড়া মাদরাসার প্রিন্সিপাল সাবেক জেলা আমীর মাওলানা মুজিব দাদা প্রাণম্পর্শী ভাষায় মোনাজাত করলেন, বললেন, ‘গোটা যৌবন যার ধীন কায়েমের কাজে ব্যয় হয়ে গেছে, যার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে দক্ষিণাঞ্চলের ইসলামী ছাত্র আন্দোলন সুহৃৎহত হয়েছে এবং আমরা সবাই যার কাছে ধীনের প্রশিক্ষণ পেয়েছি-তাকে ভূমি মাফ করে দাও, তার খেদমতকে ভূমি কবুল করো আল্লাহ।’

জামাল ভাইকে খুব তাড়াতাড়ি হারিয়ে ফেলবো বলে, কক্ষে ঢোকান শুরু থেকেই বারবার আমি তার শরীরের উপর চোখ বুলিয়ে নিছিলাম। না, মুখমণ্ডল দেখে বোঝা যায় না যে, তিনি কঠিন রোগে আক্রান্ত, দাড়িগুলো আরও সুন্দর হয়েছে,

মাথাভরা চুল, মোটা ক্র-যুগলে আগের মতোই যত্নের ছাপ। সটান পড়ে থাকা দেহটা শুধু নিশ্চল- কোনো কাঠ খণ্ড যেনো সুন্দর একটা চাদর দিয়ে ঢাকা। একদিক যার উত্তরে, অন্য দিকটা দক্ষিণ দিকে।

জামাল ভাইয়ের বিছানার দিকে তাকাতে তাকাতে একটা বিষয় আমাকে খানিকটা বিস্ময়াভিভূত করলো। বিস্ময়াভিভূত করলো এই ভেবে যে, জীবনের শেষ দিনগুলোতে, পরিকার-পরিচ্ছন্ন থাকার ব্যাপারে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সত্যিই তার উপর রহমত করেছেন। এই রহমত না করলে তাকে বিছানাতেই পায়খানা করতে হতো।

প্রথম অপারেশনের পর থেকে তিনি নলের মাধ্যমে পায়খানার কাজ সারতেন। এই অবস্থাটা একেবারে প্রথম যখন জেনেছিলাম, কান্না পেয়েছিলো। কিন্তু আজ জামাল ভাইকে শেষবারের মতো দেখতে এসে মনে হলো আল্লাহ যা করেন মানুষের ভালোর জন্যই করেন।

পোশাক-পরিচ্ছেদের ব্যাপারে এবং বসবাসের ব্যাপারে জামাল ভাই সবসময়ই চোখে পড়ার মতো পরিচ্ছন্ন। আমি তাকে কখনও ময়লা কাপড় পরতে দেখিনি। অপরিষ্কার বিছানায় বিশ্রাম নিতে দেখিনি। তবে তার ফেরারী জীবনের দুঃসহ দিনগুলোর কথা আলাদা।

জামাল ভাইয়ের মৃত্যুটা সম্মান এবং মর্যাদার মৃত্যু হবে বলে, বিছানাপত্র নষ্ট করার মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্তও তিনি করেননি। পেটের সাথে লাগানো নলের মাধ্যমেই তিনি পায়খানার কাজটা সেরেছেন। ফলে নিজেও বিরক্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়েননি এবং অন্যকেও ফেলেননি।

জামাল ভাইকে দেখে ফেরার পথে ভাবলাম, ভাবীর সাথে কথা বলে যাই। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত তার যে অবর্ণনীয় কষ্ট হচ্ছে, সেই কষ্টের প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে যাই।

আমি বরাবরই লাজুক প্রকৃতির। তারপর আবার জামাল ভাইয়ের স্মৃতির বেদনায় কাতর। এ অবস্থায় একটি হাদীসের সারকথাই বলার চেষ্টা করলাম, বললাম, রাসূলে খোদা (সা.) বলেছেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সবাইকেই তার ভালো কাজের বিনিময় দিয়ে থাকেন। ঈমানদার হলেও দেন, বেঈমান হলেও দেন।

বেঈমানদারের ভালো কাজের বিনিময় শুধু দুনিয়াতেই দেন। আখেরাতের জন্যে তার কোনো বিনিময়ই বাকী রাখেন না। দেখা গেলো, বেঈমানদারের মৃত্যুটা এমন সময় এসে গেছে যে, তখনও তার ভালো কাজের বদলা দেয়াটা কিছুমাত্র বাকী আছে- আল্লাহ মৃত্যুর ফেরেশতাকে ডেকে বলেন, তার প্রাপ্য বাকী বিনিময় হিসেবে মৃত্যু যন্ত্রণা কমিয়ে দাও।

আর একজন ঈমানদারের ভালো কাজের চূড়ান্ত বিনিময় দেন আশ্বরাতে, তার নানাবিধ অপরাধের শাস্তি অনেক সময় আল্লাহ রাসুলুলামিন দুনিয়াতেই দিয়ে দেন। দেখা গেলো- ঈমানদারের মৃত্যুটা এমন একটা সময়ে এসে গেছে যে, তখনও তার শাস্তি দেয়াটা বাকী রয়ে গেছে। আল্লাহ মৃত্যুর ফেরেশতাকে ডেকে বলেন, তার অপরাধের শাস্তি এখনও বাকী আছে সুতরাং তার মৃত্যুর আযাব বাড়িয়ে দাও।

এ হাদীস বলার পর আমি ভাবীকে বললাম, আমরা যে জামাল ভাইকে চিনি, সে জামাল ভাইকে ঢাকার লোকেরা চেনে না। ইনশাআল্লাহ জামাল ভাই ক্ষমা পেয়ে যাবেন, মর্যাদা পাবেন- তার এই দুরারোগ্য ব্যাধি তারই লক্ষণ, আপনার সীমাহীন কষ্ট হচ্ছে, আল্লাহ আপনাকে সবর দান করুন। জামাল ভাইয়ের ছোট ছেলের ব্যবহারে সত্যি আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। মগবাজারের পচা পানি ভেঙ্গে সে আমাদেরকে দৈনিক সংগ্রামের কাছাকাছি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেল। মনে মনে বললাম-বাপকা বেটা। জামাল ভাইয়ের এই ছোট ছেলেটার নাম নূর সাকলাইন নাবিদ।

নাবিদের নাম জানতে গিয়ে দেখি-এদের সব ক'ভাই- বোনের নামই ভারি সুন্দর। ভারি চমৎকার। যথাক্রমে-

১. কাওকাব-আস-সাদিয়া [বড় মেয়ে]
২. জহুর-আস-সাদাইন সাবিত [বড় ছেলে]
৩. শাহেদ হাসনাইন রাবিত
৪. নূর সাকলাইন নাবিদ [সবার ছোট ছেলে]

নাবিদকে বিদায় দিয়ে আমি বলাবলি করতে থাকলাম- শেষ পর্যন্ত জামাল ভাইয়ের পরিবারের লোকজন আমাদের গ্রামে কবরস্থ করার ব্যাপারে রাজি নাও হতে পারে। কারণ এটা তাদের আত্মমর্যাদার প্রশ্ন। তাছাড়া জামাল ভাইয়ের ইন্তেকালের পরে ক'জনই বা তার অস্তিম ইচ্ছের কথা মনে রাখবে?

মুজিব দাদা সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আমাদের জন্যে পরম সৌভাগ্যের একটা বিষয় হবে- যদি আমরা আমাদের জামাল ভাইকে আমাদেরই এলাকায় নিয়ে যেতে পারি, তবে তার ব্যাপারে তার পরিবারের হকই বেশী।

জামাল ভাইয়ের বাসা থেকে ঘুরে আসার পর খুব বেশীদিন আর দুনিয়ায় থাকেননি তিনি।

২৬ আগস্ট ২০০৪ জামাল ভাই ইন্তেকাল করলেন। দিনগত রাতে এবং সেদিন ছিলো বৃহস্পতিবার। কিন্তু আমি খবর পেলাম শুক্রবার সকাল ৮টায়। কয়েক ধরনের বেদনায় বুকেটা ফেটে যেতে চাইলো।

১. হায়রে ভাগ্য! জামাল ভাইয়ের প্রথম জানাযা পড়ার সৌভাগ্যও আমার হবে না, এখনই রওনা দিয়েও মোহাম্মদপুর থেকে মগবাজার পৌছতে পৌছতে সব শেষ হয়ে যাবে।

২. আমি কতো নিঃস্ব! জামাল ভাইয়ের মৃত্যুর খবরটা পৌছানোর মতো একটা লোকও আমার ঢাকা শহরে নেই!

৩. আমাকে দেখলে, এই ঢাকা শহরে, যিনি সবচেয়ে বেশী খুশি হতেন, সেই তাকে আর কোনোদিন পাবো না, হায়! এক অফুরন্ত দরদমাখা কণ্ঠে মল্লিক বলে কেউ আর আমাকে ডাকবে না।

পরে জেনেছিলাম, শিল্পী গোলাম মাওলা চেষ্টা না করলে শেষ পর্যন্ত আমি খবরই পেতাম না।

আমার স্ত্রী সাবিনা মল্লিককে শুধু বললাম, ‘জামাল ভাই নেই, তার লাশ নিয়ে গ্রামে যেতে হবে, দোয়া করো, চললাম।’

সাবিনা কিছু টাকা বের করে দিল এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকলো। বাগেরহাট জেলার ফকিরহাটের থানা আমীরের ছেলে আসাদুল্লাহ গালিবকে নিয়ে যখন মগবাজার পৌছলাম, তখন জানাযা হয়ে গেছে। তাসনীম ভাইয়ের সাথে দেখা। জামাল ভাইয়ের অন্তিম ইচ্ছার কথা জানালাম। বললেন, আবদুল কাদের ভাইকে বলেন। কাদের ভাইকে বললাম। বললেন, ভাবীকে বলেন। ভাবীকে বললাম। বললেন, খুলনার বয়রায় আব্বা-আম্মার কাছে রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

মনের দুঃখে খুলনায় না গিয়ে রওনা দিলাম বাংলা সাহিত্য পরিষদের দিকে। ঢাকা সাহিত্য-সংস্কৃতি কেন্দ্রের কুরআন স্টাডি ক্লাসে। চোখের পানি তখন বাধা মানছে না। বিড়বিড় করে বলতে লাগলাম, ‘জামাল ভাই, আমি আপনার কর্মী, সবসময় কুরআনের কাজে অগ্রগামী হতে বলতেন, আমি সেই কুরআনের দিকেই অগ্রসর হলাম, আপনি আমার নেতা এবং জীবিত জামাল ভাইয়ের চেয়ে অনেক অনেক শক্তিশালী আমার জামাল ভাই, আমাদের জামাল ভাই।’

প্রিয় কবি গোলাম মোহাম্মদ স্মরণে

কবি গোলাম মোহাম্মদ ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হবার অনেক আগেই তার নাম শুনি। ১৯৭৩ সালের দিকে হবে, বৃহত্তর খুলনা-যশোরের ইসলামী আন্দোলনের ছাত্রদের একটি শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত হয় খুলনা। এই শিক্ষাশিবিরে প্রায় প্রতিদিনই, বিকেলের দিকে, হালকা অনুষ্ঠান হত। সে-সময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রচলন হয়নি। সাংগঠনিক প্রোগ্রামের ফাঁকে-ফাঁকে কখনো-কখনো বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান হতো। অনুষ্ঠানে থাকতো ইসলামী গান, হামদ, নাট, কবিতা, কৌতুক ইত্যাদির পরিবেশনা। এই হালকা প্রোগ্রামই পরবর্তী সময়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

এই হালকা অনুষ্ঠানে একদিন একটা হামদ গাইলো এক গায়ক, কেতাদুরস্ত পাজামা-পাজাবী-পরা, চোখে কালো স্ফেমের চশমা, দেখতে-শুনতে সান্ধাৎ শিল্পী, চেহারায়ে মমতা মেশানো এবং মুখের কোনো এক অংশে চমৎকার একটি তিলও ছিলো। বস্ত্র হামদটি যেমন সুন্দর, শিল্পীটিও তেমন সুন্দর। হামদটির প্রথম চারটি লাইন-

“শিল্পী তুমি হে রহমান,
নাই তুলনা যার,
তোমার তুলির রঙের ছটায়
জাহান একাকার।”

সুন্দর ভাষা, সুন্দর সুর। আমি একেবারে তাত্ক্ষণিকভাবেই শিল্পীর ভক্ত হয়ে গেলাম। যদিও শিল্পীর বয়স আমার চেয়ে কম।

ফাঁক খুঁজতে লাগলাম, শিল্পীর সাথে কখন কথা বলা যায়। সুযোগ হয়ে গেলো। জিজ্ঞেস করলাম,

: এই হামদটি কে লিখেছে ভাই? এতো সুন্দর হামদ! সুর আপনার করা? না কি অন্য কেউ করেছে? শিল্পী বলল,

মতিউর রহমান মল্লিক রচনাবলী ৫ম খণ্ড ৩১৮

: আমাদের এক ভাই আছে, দায়িত্বশীল, নাম গোলাম মোহাম্মদ। অনেক গান লিখেছেন, অনেক সুর করেছেন, খুব ভালো লেখেন।

গোলাম মোহাম্মদ নামটা ভেতরে ভেতরে আওড়িয়ে নিলাম এবং মুখস্থ করে ফেললাম। শিল্পী আরো বললো,

: কবির বাড়ি মাগুরা। সাইপের ছাত্র।

পরিচয় পেয়ে খুব আশাব্যস্ত হলাম। একদিকে ভালো ছাত্র, অন্যদিকে ভালো দায়িত্বশীল, আবার কবি হিসেবেও খুব ভালো। মজার ব্যাপার তো!

গোলাম মোহাম্মদ ভাই সম্পর্কে এই প্রথম আমি জানলাম এবং আমার কাছে মনে হলো, আমি মুহূর্তের মধ্যে তাঁরও ভক্ত হয়ে পড়েছি।

যশোর সম্পর্কে, মাগুরা সম্পর্কে আমার একটা আলাদা শ্রদ্ধাবোধ আগে থেকেই ছিলো, বিশ্ববিখ্যাত কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত যশোরেরই, কবি গোলাম মোস্তফা যশোরেরই, কবি ফররুখ আহমদ মাগুরার, জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান মাগুরার, ড. সৈয়দ আলী আশরাফও মাগুরার এবং আমার মনে হলো, ঐ যশোর-মাগুরা থেকে আরো একজন বড় কবির আবির্ভাব ঘটতে যাচ্ছে এবং আলহামদুলিল্লাহ, তিনি আর কেউ নন- ইসলামী আন্দোলনেরই সম্ভাবনাময় প্রতিভা- কবি গোলাম মোহাম্মদ।

ঐ-ভাবেই কবি গোলাম মোহাম্মদ ভাইয়ের নাম আমার বুকের মধ্যে স্থায়ী হয়ে গেলো।

পরবর্তী সময়ে যশোরের কোনো ভাইয়ের সাথে আমার দেখা হয়ে গেলো, আমি গোলাম মোহাম্মদ ভাই এর, খোঁজখবর নিতাম। দায়িত্বশীলদের অনেকেই একটুখানি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করতেন,

: আপনি গোলাম মোহাম্মদকে চেনেন?

: শুনেছি যশোরের মাগুরাতে গোলাম মোহাম্মদ নামে খুব ভালো একজন কবি আছেন, চমৎকার গানও লিখতে পারেন, সুরও করতে পারেন, কবিতাও লেখেন। আপনারা তার ব্যাপারে অবশ্যই খোঁজখবর নেবেন।

: লেখালেখি করে জানি কিন্তু গোলাম মোহাম্মদ কি এতোটাই সম্ভাবনাময়, একেবারে আপনার পর্যন্ত খবরটা চলে এসেছে।

আমি হাসতাম, হাসতাম এ-জন্য যে, তাদের ঘরের ছেলে তো সেই জন্য হয়তো আশ্রয় নেই।

যশোরের আবুল কাশেম ভাইয়ের সাথেও গোলাম মোহাম্মদ ভাই সম্পর্কে কথা হতো। কাশেম ভাইকে দেখতাম, গোলাম মোহাম্মদ ভাইয়ের ব্যাপারে খুবই

উচ্ছ্বসিত এবং তিনি বলতেন,

: যশোরে থাকলে তো এই প্রতিভা কোন কাজে লাগবে না মল্লিক ভাই, চিন্তা-ভাবনা করেন, ঢাকায় আনা যায় কিনা?

শুধু খোঁজ-খবরের মধ্যে দিয়ে সময়গুলো আন্তে আন্তে পার হয়ে যেতে লাগলো।

'৭৮-'৭৯ এইরকম একটা সময় আমি যশোরে যাই একটা শিক্ষাশিবিরে। এর বছর দুয়েক আগে অবশ্য আমি ঢাকায় স্থায়ী হয়ে গেছি। যশোরের এই শিক্ষাশিবিরটা গাজীর দরগায় হয়। কাশেম ভাইয়ের সাথে দেখা। জিজ্ঞেস করলাম,

: টি.সি.তে কি গোলাম মোহাম্মদ ভাই এসেছেন?

কাশেম ভাই খুব করে হেসে উঠলেন

: যথাসময়ে দেখা হবে।

গোলাম মোহাম্মদের জন্য অস্থির হয়ে উঠেছি, তর সইছে না, ফাঁকে-ফাঁকে জিজ্ঞেস করছি, কিন্তু হৃদিসই পাচ্ছি কখনো শুনছি কাজে ব্যস্ত, বাইরে গেছে।

এক সময় কাশেম ভাইকে আবার জিজ্ঞেস করলাম।

বললেন,

: একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে, ঐ অনুষ্ঠানেই আপনার স্বপ্নের গোলাম মোহাম্মদ ভাইয়ের সাক্ষাৎ ইনশাআল্লাহ পেয়ে যাবেন।

ঠিকই, গোলাম মোহাম্মদ ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো- ভীষণ লাজুক।

এবং এতো সুন্দর সুন্দর গান লেখেন, বলায়, একেবারে মাথা নিচু করে থাকলেন, বললেন না কিছুই, মিষ্টি করে হাসলেন শুধু।

মনে আছে, তাকে আমি উৎসাহিত করেছিলাম সেদিন। গান লেখার জন্য, কবিতা লেখার জন্য, সাংস্কৃতিক চর্চার জন্য এবং বলেছিলাম,

: এই প্রচেষ্টা আপনি অবশ্যই অব্যাহত রাখবেন, খবরদার, বন্ধ করে দেন না যেনো।

আমার যতোদূর মনে পড়ে, গোলাম মোহাম্মদ ভাইয়ের কাছ থেকে সেদিন লাজুক-লাজুক হাসি ছাড়া আর কিছুই বের করতে পারিনি। আমি গানের কথা বলেছি, হেসে এড়িয়ে গেছেন, আমি কবিতার কথা বলেছি, হেসে এড়িয়ে গেছেন, আমি সাংগঠনিকভাবে অগ্রসর হবার কথা বলেছি, লজ্জায় একেবারে নুইয়ে গেছেন।

টি.সিতে গোলাম মোহাম্মদ ভাই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনা করলেন। দারুণ সাজানো-গোছানো অনুষ্ঠান এবং তাঁর উচ্চারিত কথামালায় পেলাম স্পষ্টতা, মাধুর্য এবং নান্দনিকতা।

পারত পক্ষে গোলাম মোহাম্মদ ভাইয়ের সাথে খুব গভীরভাবে মেশার চেষ্টা করলাম। ঐ সময়ে হ্যাংলা-পাতলা, এক ছাত্রভাইও আমার সাথে দেখা করলেন, অনেক কথা বললেন। দু'জনকে নিয়েই আমি রাত্রিবেলায়, গাজীর দরগার সামনে দিয়ে, যে রোড ঝিকরগাছার দিকে চলে গেছে, এ রোড ধরে আমরা বহুদূর পর্যন্ত ঘুরলাম এবং ভোরবেলার দিকে আবারও ধানের মাঠ এবং খেজুর বাগানের পথ ধরে ঘুরে বেড়ালাম।

হ্যাংলা-পাতলা ছাত্রভাইটি সম্পর্কে আমাকে কাশেম ভাই আগেই বলে দিয়েছিলেন,

: হ্যাংলা-পাতলা এক ছাত্রভাই আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। সিরিয়াস বিপ্লবী, সশস্ত্র ক্যাডার, আন্তে-আন্তে অবশ্য তার মধ্যে পরিবর্তন আসছে। মল্লিক ভাই, সে আবার কাব্য-চর্চাও করে। আপনি তার সাথে কথা বললে খুবই ভালো হয়।

তো এই হ্যাংলা-পাতলা ছাত্রভাইটিই বর্তমানে যশোরের খ্যাতিমান আইনজীবী-গাজী এনামুল হক, কবি গাজী এনামুল হক।

মাওলানা মওদুদী (রহ.)-এর একটি বাক্য আমাকে খুবই আলোড়িত করেছিলো। ঐ বাক্যটিকে নিয়ে, ঐ সময়, ঐ গাজীর দরগাতে থাকতেই গান বানিয়ে ফেলেছিলাম :

হঠাৎ করে জীবন দেয়া,
খুবই সহজ তুমি জানো কি?
কিন্তু তিলে তিলে,
অসহ জ্বালা সয়ে,
খোদার পথে, জীবন দেয়া,
নয়কো সহজ তুমি মানো কি?

ঐ গানটি আমি প্রথম শোনাই গোলাম মোহাম্মদ ভাইকে। গোলাম মোহাম্মদ ভাই ভীষণ খুশি হয়েছিলেন। ফাঁকে একটি কথা বলে নিই, ঐ যে গোলাম মোহাম্মদ ভাইয়ের হামদ খুলনাতে প্রথম শুনেছিলাম “শিল্পী তুমি হে রহমান নাই তুলনা যার, তোমার তুলির রঙের ছটায় জাহান একাকার।” এটি শিল্পী আব্দুল মান্নান গেয়েছিলো। পরবর্তী সময়ে সে শিশু সংগঠনে কাজ করেছে এবং কেন্দ্রে একটা বড় ধরনের দায়িত্বও পালন করেছে। মান্নান আগাগোড়াই শিল্পী। তার চরিত্রের মধ্যে শিল্পসত্তা জড়িয়ে আছে। সেই কারণে সাংসারিক জীবনে খুব ভালো করতে পারেনি। শুনেছি বিনাইদহের কোনো এক গভীর গ্রামে ছোট একটি দোকান নিয়ে পড়ে রয়েছে। সংগঠনের জন্য এখনো নিবেদিত প্রাণ। বছর দুয়েক আগে

তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিলো। সেই ঝকঝকে চেহারাটা তার নেই, ভেঙ্গে গেছে। আগের মতো কথা-বার্তার মধ্যে বলিষ্ঠতা নেই। কিন্তু প্রচুর প্রাণশক্তি যে তার। এ-ভাবে কতো শিল্পী, কতো সম্ভাবনাময় শিল্পী আমাদের হারিয়ে গেলো!

যা হোক, গাজীর দরগায় আমি গোলাম মোহাম্মদ ভাইকে দেখলাম এবং দেখে আমি তার আরও ভক্ত হলাম। এতো ভদ্র, এতো নরম, এতো অহংকারহীন, এত বিনয়ী, এতো মিশুক এবং সবচেয়ে যে-জিনিসটা আমার ভালো লাগলো, সেটি হচ্ছে, ইসলামী আন্দোলনের ব্যাপারে খুবই পরিপক্ব। আমি সাধারণত সেই সব শিল্পীদেরকে বেশ পছন্দ করি, সেই সব গায়কদেরকে বেশ পছন্দ করি, কবিদের, গীতিকারদের বেশি পছন্দ করি- যারা আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে বেশি অগ্রসর। সম্ভবত স্বভাব দাঁড়িয়ে গেছে, একজন শিল্পী দেখে অবাক না হয়ে, আমি অবাক, একজন শিল্পী, বড় শিল্পী, সেই সঙ্গে যখন যদি দেখি, সে আল্লাহর দ্বীনের দিক থেকে অগ্রসর, তখন আনন্দের সীমা থাকে না। আজ পর্যন্ত এই একই অবস্থা আমার মধ্যে। এরপরে কাশেম ভাইয়ের দায়িত্ব পালনের প্রায় শেষের দিকে আবারও যশোরে গেলাম।

আবুল কাশেম ভাই সম্পর্কে বলে নিই। আবুল কাশেম ভাই এখন একটি মর্যাদাসম্পন্ন কলেজ ক্যান্টনমেন্ট কলেজে অধ্যাপনা করছেন। ছাত্র হিসেবে খুব ভালো ছাত্র ছিলেন। অধ্যাপক হিসেবেও খুব ভালো ভূমিকা রাখছেন বলে আমি জানি। প্রোগ্রামের শেষের দিকে আমাকে কাশেম ভাই বললেন গোলাম মোহাম্মদ ভাই সম্পর্কে তো আপনি জানেন। সেতো অনেক দিক থেকে অগ্রসর, যেমন কবিতা লেখে, গান লেখে, অন্যান্য লেখালেখি তো করেই, এর সঙ্গে তার আরেকটি গুণ আছে, সে কিন্তু আর্টিস্ট। অবাক হয়ে গেলাম যে একটা মানুষের মধ্যে এতো যোগ্যতা একসঙ্গে? ভালো আর্টিস্ট, কাশেম ভাই আমাকে এও বললেন এই দেখেন সুন্দর-সুন্দর পোস্টারগুলো আমাদের অফিসের মধ্যে লেখা আছে, বিভিন্ন কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে সুন্দর-সুন্দর পোস্টারগুলো সব গোলাম মোহাম্মদ ভাইয়ের লেখা। খুব ভালো করে পোস্টারগুলো দেখলাম এবং তখনি চিন্তা করছিলাম যে কাশেম ভাইকে বলি যে গোলাম মোহাম্মদ ভাইকে দিয়ে দেন, আমি ঢাকায় নিয়ে যাই। কিন্তু বললাম না। কাশেম ভাই নিজেই প্রায় দশ-পনের মিনিট পরেই বললেন, গোলাম মোহাম্মদ তো আসলে প্রতিভাবান। আপনি যদি তাকে ঢাকায় নিয়ে যেতেন, তাহলে প্রতিভাটা কাজে লাগতো। যশোরে থাকলে কোনো কাজে লাগবে না। সত্যিকার অর্থে সে সাহিত্য সংস্কৃতি অঙ্গনের লোক। যদি তাকে নিয়ে যান, তাহলে আমি তাকে ছেড়ে দিতে রাজি আছি। বললাম, কাশেম ভাই। আমি নিজেই অগ্রহী গোলাম মোহাম্মদ ভাইকে ঢাকায় নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে। আমি কাশেম ভাইকে গল্পও বলেছিলাম, আমাকেও তো মীর কাশেম আলী ভাই বাগেরহাট থেকে ঢাকায় নিয়ে গিয়েছিলেন। মীর

কাশেম আলী ভাই আমার গান শুনেছিলেন, কেঁদেছিলেন এবং ঢাকায় নেওয়ার প্ল্যান করেছিলেন। আল্লাহ রাক্বুল আলামীন আমার ওপরে রহমত করেছিলেন বলেই আমার পক্ষে ঢাকায় যাওয়া সম্ভব হয়েছিলো। আল্লাহ রাক্বুল আলামীন মীর কাশেম আলী ভাইয়ের মাধ্যমেই এই কাজটাকে সম্পন্ন করেছিলেন। মীর কাশেম আলী ভাই আমাকে ঢাকায় নিয়ে গিয়েছিলেন, আমি যতোদূর পারি সাহিত্য এবং সংস্কৃতি অঙ্গনে কাজ করার চেষ্টা করছি। কিন্তু ঢাকাকে সমৃদ্ধ না করলে, সারা বাংলাদেশে সাহিত্য এবং সাংস্কৃতিক কার্যক্রমকে ছড়ানো যাবে না। আমি অনেক বলে কয়ে কাউকে কাউকে এনেছি ঢাকাতে, আমার ইচ্ছা আছে গোলাম মোহাম্মদ ভাইয়ের ব্যাপারে কিন্তু আপনার একটু অপেক্ষা করতে হবে। আমি ঢাকায় যাই। ঢাকায় গিয়ে গোলাম মোহাম্মদ ভাই কোথায় থাকবেন, কিভাবে থাকবেন ব্যবস্থা করতে হবে। একটু শুছিয়ে আপনাকে খবর দেবো, আপনি গোলাম মোহাম্মদকে পাঠিয়ে দেবেন। এভাবে কথাবার্তা হয়ে থাকলো।

ঢাকায় আসলাম। আমি তখন অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের বাড়িতে মেস ছিলো সেই মেসে থাকতাম। সাবেক আমীরে জামায়াত, ভাষাসৈনিক, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের কথাই বলছি। একদিন হঠাৎ গোলাম মোহাম্মদ সেই মেসে হাজির। কাঁধে বড় একটা ব্যাগ, লাজুক লাজুক সমস্ত মুখমণ্ডল, খুব বিনয়ের সঙ্গে সে সালাম করল। তার লজ্জা একেবারে পরিপূর্ণভাবে কাজ করেছে, লজ্জা তাকে কড়া করে ফেলেছে। সালাম বিনিময়ের পর আন্তে করে গোলাম মোহাম্মদ ভাই আমাকে বলল, কাশেম ভাই চিঠি দিয়েছেন, এই চিঠি। কাশেম ভাইয়ের সেই চিঠিতে লেখা- মল্লিক ভাই আপনার অপেক্ষা না করে গোলাম মোহাম্মদ ভাইকে পাঠিয়ে দিলাম, যা হয় করবেন। চিঠিটা পেয়ে একদিকে খুশি হলাম, অন্যদিকে একটু চিন্তিত হয়ে পড়লাম। সেটা আমার কোনো দুঃশ্চিন্তার ব্যাপারে ছিল না। একটু চিন্তিত হয়ে পড়লাম, পরিবেশ তৈরি করতে হবে। ব্যবস্থা করতে হবে। তবু আমার সবচেয়ে বড় আনন্দ, গোলাম মোহাম্মদ ভাইয়ের আসার কথা ছিলো, সে এসে গেছে, এখন যা হয় একটা হবে। আমার কাছেই রেখে দিলাম। সংগঠনের সাথে যুক্ত করে দেওয়া হলো। সে যশোর শহর শাখার দায়িত্ব পালন করে এসেছে। কিন্তু সে সদস্য নয়। সদস্য এপ্লিকেট। যশোর শহর শাখার দায়িত্ব পালন চাটখানি কথা নয় কিন্তু সদস্য সে হতে চায় না, মেসে থাকছে, সংগঠনের কাজ করেছে তবু। লেখালেখির ব্যাপারে আমি তাগিদ করছি। সাইমুমের অনুষ্ঠানেও যাচ্ছে। গোলাম মোহাম্মদ ভাইকে উদ্বুদ্ধ করতে লাগলাম, সে যেন সদস্য হয়। কিন্তু আমি যতই তাকে সদস্য হওয়ার জন্য উৎসাহিত করি কেনো যেনো সদস্য হওয়ার ব্যাপারে সে পিছুটান দেয়, অথচ সবকিছুই তার ঠিকঠাক আছে। মেজাজ আছে, লেখাপড়া আছে, আনুগত্য আছে, নিয়মিত কুরআন-হাদীস মনোযোগের

সঙ্গে পড়ে। আমার খুব ভালো লাগলো। একজন গীতিকার পাওয়া গেলো, একজন কবি পাওয়া গেল, একজন সংগঠক পাওয়া গেলো, একজন শিল্পী পাওয়া গেলো। সর্বোপরি আমি একজন আমার মনের মানুষ পেলাম। ক্রাইসিস শুরু হয়ে গেলে, আমি খেয়াল করলাম, গোলাম মোহাম্মদ ভাইয়ের সঙ্গে যশোরের একজন প্রাক্তন দায়িত্বশীল খুব যোগাযোগ করতেন। তিনি সংগঠন থেকে বের হয়ে গিয়েছিলেন। তার এই আনাগোনাটা দেখে আমি তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, গোলাম মোহাম্মদ ভাই বললেন আমার পুরনো দায়িত্বশীল। আমি একটু ঘাবড়ে গেলাম, এই দায়িত্বশীলের প্রতি গোলাম মোহাম্মদ ভাইয়ের যথেষ্ট শ্রদ্ধাবোধ। তো এই শ্রদ্ধার কারণেই হয়তো গোলাম মোহাম্মদ ভাইকে সংগঠন থেকে সরিয়ে নিতে সক্ষম হবে। সেজন্য একটু কৌশল অবলম্বন করলাম। গোলাম মোহাম্মদ ভাইয়ের সঙ্গে সাইমুমের শিল্পী শহীদুল্লাহ মাসুদের সম্পর্ক ছিলো। শহীদুল্লাহ মাসুদ একসময় বিনাইদহ থেকে লেখাপড়া করেছে। আমি শহীদকে বললাম, শহীদ তুমি একটু গোলাম মোহাম্মদ ভাইয়ের খোঁজ-খবর নাও। গোলাম মোহাম্মদ ভাইয়ের মনমানসিকতা কেমন, গোলাম মোহাম্মদ ভাই সংগঠন সম্পর্কে খুব দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে আছেন কি না। আসলে শহীদকে এই দায়িত্ব দেওয়ার মধ্যে দিয়ে আমি অন্য আরেকটি বিষয়ে জানার কৌশল অবলম্বন করলাম। কিছু দিন পরে গোলাম মোহাম্মদ ভাইকে জিজ্ঞেস করলাম, শহীদের অবস্থা কি। গোলাম মোহাম্মদ ভাই বলল। শহীদকে নিয়ে আপনাকে খুব চিন্তা করা লাগবে না। আর শহীদকে জিজ্ঞেস করলাম, গোলাম মোহাম্মদের অবস্থা কি? শহীদ একেবারে খুব জোরে জোরে বলল, বলেন কি মল্লিক ভাই, গোলাম মোহাম্মদ ভাইয়ের সাথে আলাপ করে দেখবেন, তার চিন্তা কতো স্বচ্ছ এবং সুন্দর। একদিন গোলাম মোহাম্মদ ভাইয়ের সাথে সংগঠনের অভ্যন্তরীণ ক্রাইসিস নিয়ে কথা বললাম। হতবাক হয়ে গেলাম গোলাম মোহাম্মদ ভাইয়ের ঈমানী দৃঢ়তা দেখে এবং সংগঠনের বিভিন্ন বিষয়াদি বিশ্লেষণ করার গভীরতা দেখে। মনে হলো গোলাম মোহাম্মদ ভাই একজন চিন্তাশীল মানুষ। চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্ত নেন এবং হালকা মেজাজের কোনো লোক নয়। আমার খুব ভালো লাগলো, কবি-সাহিত্যিকরা সাধারণত একটু ফুরফুরে মেজাজের হয়, খুব সহজেই তাদেরকে কোনো একটি দিকে আবেগে আপ্ত করা যায়। কিন্তু গোলাম মোহাম্মদ ভাই সে ধরনের লোক নন। সংগঠনের ক্রাইসিস নিয়ে গোলাম মোহাম্মদ ভাইয়ের সঙ্গে আমার বহু আলাপ হয়েছে। যতোবার তার সাথে আলাপ করেছি, উপকৃত হয়েছি। সদস্য হওয়া প্রয়োজন, এই কারণে, আমি লেগে থাকলাম তার পেছনে। ওদিকে তার একটি কর্মসংস্থানেরও প্রয়োজন। তখন কেন্দ্রীয় সভাপতি সাইফুল আলম খান মিলন ভাই। আমি সাইফুল আলম খান ভাইকে গিয়ে বললাম অথবা

সাইফুল আলম খান মিলন ভাই বলেছিলেন, ছাত্রসংবাদে কাজ করার জন্য লোক দরকার। তখন মাসুমুর রহমান খলিলী ভাই সম্ভবত ছাত্রসংবাদে কাজ করতেন। অথবা অন্য কেউ কাজ করতেন যাই হোক, আমি মিলন ভাইকে বললাম, ছাত্রসংবাদে গোলাম মোহাম্মদ ভাইকে যদি আপনি নেন তাহলে তার কাছ থেকে খুব ভালো সার্ভিস পাবেন। সাইফুল আলম খান মিলন ভাই আমাকে বললেন- ঠিক আছে, তাহলে গোলাম মোহাম্মদ ভাই এর সঙ্গে কথা বলতে হয়। মিলন ভাই, গোলাম মোহাম্মদ ভাই এর সঙ্গে কথা বললেন। আমরা অনেকেই জানি, সাইফুল আলম খান মিলন ভাইয়ের মেজাজটা ওমরী মেজাজ। অনেকেই তাকে ভয় পান। অনেকেই তার কাছে ঘেঁষতে চান না কিন্তু আমি আশ্চর্যভাবে লক্ষ্য করলাম, গোলাম মোহাম্মদ ভাই ছাত্রসংবাদের কাজে যোগদান করার পর, মিলন ভাইয়ের সঙ্গে একটি মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। আমি খুবই আনন্দিত হলাম। মিলন ভাইকে আমি বললাম, মিলন ভাই, গোলাম মোহাম্মদ ভাই সদস্য হতে চান না, আমি একেবারেই তাকে সদস্য করতে পারছি না। মিলন ভাই বিষয়টা গভীরভাবে গ্রহণ করলেন। একসময় দেখলাম, গোলাম মোহাম্মদ ভাই সদস্য এপ্লিকেন্ট হয়ে গেছে। আলহামদুলিল্লাহ কিছুদিন পরে গোলাম মোহাম্মদ ভাই সদস্য হয়ে গেছেন। ছাত্রসংবাদে তিনি কাজ করতে লাগলেন।

একটি কথা মাঝখানে বলে নেয়া দরকার, গোলাম মোহাম্মদ ভাই সম্পর্কে আমার এত কথা জমা আছে যে খুব সহজেই একটি গ্রন্থ তৈরি করা যায়। কিন্তু আমি সেই সুযোগটা এখানে নিচ্ছি না। আমি একেবারে জরুরি জরুরি বিষয়গুলো এখানে নিয়ে আসার চেষ্টা করছি। গোলাম মোহাম্মদ ভাই ছাত্রসংবাদে খুব ভালো করে কাজ করছেন এবং ভালো করে কাজ করছেন বলেই তার কাছ থেকে সাইমুমের জন্য অনেক কিছু নেওয়াটা সহজ হচ্ছে না। সাইমুমের ক্লাস হচ্ছে বিকেল বেলাতে আর বিকেল বেলাতেই ছাত্রসংবাদের কাজ বেশি হয়। আমি গোলাম মোহাম্মদ ভাইয়ের কাছ থেকে কিছু গান সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছিলাম। কিছু কিছু গান তিনি দিয়েছিলেন এবং সেই গানগুলো আমরা কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছিলাম। তিনি যখন ছাত্রসংবাদে কাজ করছেন আমি তখন ছাত্রজীবন শেষ করে, কাজ করছি সোনার বাংলায়, অবশ্য সোনার বাংলায় কাজ করছিলাম ছাত্রজীবন থেকেই। আমি সোনার বাংলায় সাহিত্য বিভাগে কাজ পেয়েছিলাম, আমাকে কামারুজ্জামান ভাই ডেকে নিয়েছিলেন। আমার দরখাস্ত করতে হয়নি এবং আশ্চর্যের ব্যাপার হলো আমি আমার জীবনের যতোগুলো চাকরি করেছি সবগুলো চাকরি আমাকে শ্রেহ ভরে ডেকে নিয়ে তারপরে দেওয়া হয়েছে। আমি তখন সোনার বাংলায় কাজ করছি, বিপরীত উচ্চারণ দেখছি, সাইমুম দেখছি, কার্যকরী পরিষদের দায়িত্ব পালন করছি, অষ্টপ্রহর কাজ আর কাজ, একসময়

নিজেই ছাত্রজীবন শেষ করলাম। তখন কেন্দ্রীয় সভাপতি তাসনীম আলম ভাই আমাকে ছেড়ে দিতে চাইলেন না, বললেন, আপনি অনার্স পরীক্ষা দেননি কেনো। ছাত্রজীবন শেষ করার ব্যাপারে আমার একটা লজ্জা কাজ করছিলো। সদস্যদের যে তালিকা ছিলো, সবার আগে আমার নাম। কেন্দ্রীয় সভাপতির আগে আমার নাম লজ্জা করত, বুড়ো হয়ে গেছি, এক নম্বরে আমার নাম, বিদায় নেওয়া দরকার। সেক্রেটারি জেনারেল সৈয়দ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের ভাই, এখন যিনি এমপি, তাঁকে বললাম তিনিও গরজ করলেন না। তাহের ভাইয়ের সাথে আমার একটি মধুর সম্পর্ক ছিলো। তাহের ভাইকে একদিন ঘনিষ্ঠভাবে বললাম, তাহের ভাই আমাকে ছেড়ে দেওয়াই ভালো, এমন কোনো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে আমাকে এক্সপেন্ড করতে হবে। তো এক্সপেন্ড হয়ে ছাত্রজীবন শেষ করার চেয়ে স্বাভাবিকভাবে ছাত্রজীবন শেষ করা ভালো। আমি কৌশল অবলম্বন করেছিলাম। তিনি কেন্দ্রীয় সভাপতির সঙ্গে আলাপ করলেন। কেন্দ্রীয় সভাপতির সাথে আলাপ করে তিনি আমাকে বললেন, আপনি দেখা করেন। কেন্দ্রীয় সভাপতির সাথে দেখা করলাম, তাসনীম ভাই আমাকে ছুটি দিয়ে দিলেন।

কলমে কাজ করছি, ছাত্রজীবন তখনও শেষ হয়নি। অধ্যাপক এ কে এম নাজির আহমদ ভাই আমাকে কলমের সহকারী সম্পাদক হিসেবে নিয়ে গেলেন। কলমে কাজ করছি। কলম মাসিকভাবে বের হচ্ছে। নাজির আহমদ ভাই আমাকে ডাকলেন। রুমে ঢুকে দেখি, খ্রিস্টিয়ান আব্দুর রব সাহেব বসে। নাজির ভাই বললেন, এডুকেশন সোসাইটিতে মুদ্রণ বিভাগে একজন টোকস কর্মকর্তা দরকার। তো খুব তাড়াতাড়ি দরকার, তোমার হাতে কোনো লোক আছে। নাজির আহমদ ভাই আমাকে খুব স্নেহ করতেন, ভালোবাসতেন, এখনও যে ভালোবাসেন না তা নয়, স্নেহ করেন না তা নয়, কিন্তু তখন আমি বুঝতে পারতাম, তিনি অত্যন্ত স্নেহ করেন। আমি বললাম, আছে, বিএসসি পাস, গোলাম মোহাম্মদ, ঢাকায় এসেছে শিল্পী, সাহিত্যিক, আর্টিস্ট, অনেক অনেক গুণের অধিকারী। এডুকেশন সোসাইটির মুদ্রণ বিভাগে যদি তাকে নেন, এডুকেশন সোসাইটি খুব লাভবান হবে। তুমি তাকে এখনই ডাকতে পারো? সঙ্গে সঙ্গে ছুটলাম কোথায় গোলাম মোহাম্মদকে পাওয়া যায়।

আল্লাহর কি মরজি, ঘণ্টা দুই তিনেকের মধ্যে গোলাম মোহাম্মদ ভাইকে পাওয়া গেলো। নাজির আহমদ ভাইয়ের সামনে হাজির করলাম। নাজির আহমদ ভাই সোজা এডুকেশন সোসাইটিতে পাঠিয়ে দিলেন। একেবারে বিদ্যুতের গতিতে গোলাম মোহাম্মদ ভাইয়ের চাকরি হয়ে গেলো। গোলাম মোহাম্মদ ভাই এখন এডুকেশন সোসাইটির মুদ্রণ বিভাগের কর্মকর্তা। এভাবে চাকরি করতে লাগলো। খুব খুশি আমি। গোলাম মোহাম্মদ ভাই দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। কলমে লেখা দিচ্ছে

আমি ছাপার চেষ্টা করছি। বেশ কিছুকাল কেটে গেলো, হঠাৎ গোলাম মোহাম্মদ ভাই আমাকে বললেন, মল্লিক ভাই আমি চাকরি করবো না।

গোলাম মোহাম্মদ ভাই অত্যন্ত আত্মমর্যাদাসম্পন্ন লোক। আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি, আমাদের বর্তমান সময়ের কবি-সাহিত্যিকদের অনেকের মধ্যেই এই আত্মমর্যাদাবোধ নেই। গোলাম মোহাম্মদকে আমি ততোক্ষণে আবিষ্কার করেছি যে সে আসলেই একজন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন লোক। আমি তার এই চাকরি ছাড়ার বিষয়ে পরে আলাপ করছি। তার আগে, তার বিয়ে সম্পর্কে আলাপ করে নিতে চাই। গোলাম মোহাম্মদ ভাই একদিন আমাকে বললেন, মল্লিক ভাই, আমাদের ইসলামী আন্দোলনের বৃহত্তর পর্যায়ের একজন দায়িত্বশীল, একজন ধনী লোকের বোনের সঙ্গে আমার বিয়ের ব্যাপারে প্রস্তাব করেছেন। আপনার সম্মতি দরকার। আমি বললাম, গোলাম মোহাম্মদ ভাই, একজন কবি আপনি, একজন কবিদের আত্মমর্যাদাবোধ সম্পর্কে আমার জ্ঞান আছে। আমি মনে করি, কুফুর দিকে তাকানো উচিত। খুব ধনী লোকের বোন আপনি বিয়ে করবেন, আপনার নেই টাকা-পয়সা, ধনী আত্মীয়-স্বজনকে তো আপনি যত্নও করতে পারবেন না। আপনি যে এলাকার, যে অবস্থানে অবস্থান করছেন, সেই অবস্থানে থেকেই আপনাকে চিন্তা করা উচিত। কেনো যেনো আমার এই কথাটুকু গোলাম মোহাম্মদ চুপচাপ শুনলেন, কয়েকদিন পর এসে বললেন, মল্লিক ভাই, বিয়ে নাকচ করে দিয়েছি। বুঝতে পারলাম, গোলাম মোহাম্মদ কতটা শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে। তাকে পরামর্শ দিয়েছিলাম। এই ঘটনা ঘটার পরে, আমি খুব চিন্তিত হয়ে পড়লাম। একটি সুন্দর বিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোনো রাস্তা নেই। দিন চলছে বি.আই.সিতে আমি চাকরি করছি শরীফ ভাইয়ের সঙ্গে।

শরীফ ভাইয়ের অসুস্থতার খবর শুনে শরীফ ভাইকে দেখতে গেলাম। দেখতে গেলে সেখানে এক নাটকীয় ঘটনা ঘটল। নাস্তা খেতে গেলে বি.আই.সি'র অফিস পাবো না। সে জন্য আমি তাড়া শুরু করলাম।

দুই.

পরিস্কার করে বললাম, অফিসে যেতে দেরি হলে, নাজির ভাই রাগ করবেন। নাস্তা ওদিকে গিয়ে খাবো। আমার কথা শরীফ ভাই মেনে নিলেন। কিন্তু আমরা যখনই রওনা দিয়েছি, একটা মহিলা কণ্ঠ শুনতে পেলাম, ভাইয়া আর বেশি দেরি হবে না, নাস্তা খেয়ে যান, ভাইয়া বেশি দেরি হবে না, নাস্তা হয়ে গেছে প্রায়। শরীফ ভাই বললেন, দশ মিনিট দেরি করলে, অফিস যেতেও দেরি হবে। অনেকটা পথ চলে যাওয়ার পর, গল্প জুড়ে দিয়েছে শরীফ ভাই, আমার এই বোনটাকে নিয়ে

ভীষণ সমস্যায় পড়েছি, আই এ পরীক্ষা দিয়ে ঢাকায় এসেছে, ছোটবেলা থেকেই বোনটা আমার সাংঘাতিক ভক্ত। এই যে মল্লিক ভাই দেখলেন না, আমি না খেয়ে গেলাম অফিসে। ও কিন্তু খাবে না। আমি অফিসে পৌছনোর পরে দেখবেন ওর টেলিফোন। ও জিজ্ঞেস করবে, ভাইয়া আপনি খেয়েছেন? যদি ও জানতে পারে, আমি খেয়েছি, তারপরে ও খাবে, আর যতোক্ষণ জানবে না, আমি খাইনি ও খাবেই না। অবাক হয়ে গেলাম, চিন্তা করলাম, একটি বোন যদি এ রকম হয়। যে ঘরের স্ত্রী হবে, সে ঘরটিও উজ্জ্বল হবে। চট করে আমার মাথায় ঢুকলো, আই এ পাস করেছে, গোলাম মোহাম্মদ ভাই বি.এস.সি। এডজাস্ট হবে বলে আমার মনে হলো। যারা শরীফ ভাইকে চেনে, যারা আতাউরকে চেনে আমি বলছি ঐ আতাউরের কথা যে আতাউর অধ্যাপক সাহেবের অফিসে কাজ করতো। এদের দু'টো ভাইয়ের অসম্ভব সুন্দর চেহারা। ইরানীদের মতো চেহারা। চিন্তা করলাম দু'ভাইয়ের চেহারা তো দেখেছি। দু'ভাইয়ের মতো চেহারা না হলেও, কাছাকাছি চেহারা যদি হয়, তাহলে নিশ্চয়ই শরীফ ভাইয়ের বোনটা খুবই সুন্দরী হবে। আর কবিদের বৌ সুন্দরী হলে সমস্যা কমে যায়। কবির আশলে সৌন্দর্য প্রিয়। সবকিছুকেই সুন্দর চোখে দেখতে চায়। খবর নিলাম শরীফ ভাইদের গোটা পরিবার ইসলামী আন্দোলনের পরিবার। আমার খুব ভালো লাগলো, গোলাম মোহাম্মদ ভাইকে ধনী পরিবারে বিয়ে করতে দেইনি, আলহামদুলিল্লাহ। একটা ভালো মেয়ে পেয়েছি, বিষয়টা আমার মাথায় থাকলো। পরে আমি কায়দা করে বদরুল ভাইয়ের মাধ্যমে শরীফ ভাইকে প্রস্তাবটা দিলাম। গোলাম মোহাম্মদ ভাইয়ের কথা শুনে শরীফ ভাইয়েরা খুব উৎফুল্ল হলেন। বদরুল ভাইও খুব উৎফুল্ল হলেন। আমাদের বদরুল ভাই একটু ভীষণ চালাক প্রকৃতির লোক। রসিক বলাই ভালো। বদরুল ভাই বললেন, মল্লিক ভাই জানেন, এই মেয়ের মা কিন্তু বি.এ পাস। একেবারে পাগল হয়ে গেলাম। পরে জেনেছি, বদরুল ভাই চালাকি করেছেন, বি.এ পাস না। খুব উঁচুদের একজন মানুষ, বি.এ পাস লোকও এতো ভালো হয় না। বিয়েটা যাতে সুষ্ঠুভাবে হয়ে যায়, তার জন্য সব আয়োজন সম্পন্ন করার পরে মশিউল আলম ভাইকে বললাম, মশিউল ভাই এ দায়িত্বটা না নিলে হবে না। আপনিও মাগুরার লোক, গোলাম মোহাম্মদ ভাইও মাগুরার লোক, আর মাগুরার কাছাকাছি হচ্ছে গুড়াপাড়া, আমাদের নাসের ভাইয়ের স্বস্তর বাড়ি। আবু নাসের মোহাম্মদ আবদুজ্জ জাহের ভাইয়ের স্বস্তর বাড়ি কোঁটচাদপুর, ঝিনাইদহ জেলার কোঁটচাদপুরে, আমাদের শরীফ ভাইদের বাড়িও। চিন্তা করলাম আঞ্চলিকতার দিক থেকে কুফু হলো এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে যতোদূর জানলাম তাতে কুফু হলো এবং সত্যিকার অর্থে সাহিত্য-সংস্কৃতির সমঝদার মানুষ শরীফ ভাইও। শরীফ ভাইয়ের ভগ্নিপতি যদি গোলাম মোহাম্মদ ভাই হন তাহলে খুব মজার হবে। বিয়ে হয়ে গেলো এবং গোলাম

মোহাম্মদ ভাইয়ের চাকরিতেও সমৃদ্ধি এলো। মাঝে-মাঝে দাওয়াত খেতাম। দাওয়াতের যে এরেক্‌জমেন্ট দেখতাম, তা দেখে বুঝতাম, ভালো ইনকাম হচ্ছে। এইভাবে তার জীবন যাচ্ছে, হঠাৎ করে একদিন বললেন, মল্লিক ভাই, চাকরি করবো না। ঐ যে আগে বলেছিলাম, অত্যন্ত আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন মানুষ। ভাবলাম অফিসে কিছু একটা হয়েছে। বললাম, গোলাম মোহাম্মদ ভাই চাকরিটা ছাড়া ঠিক হবে না। কি করতে চান বলেন। বললেন, আমি এই লাইনের ছোট একটা ব্যবসা করতে চাই। ছোট একটা কাজ করতে চাই। যেখানে আমি মুদ্রণের কাজ করবো, ছাপার যাবতীয় কাজ করবো এবং আমি সেটা পারবো এবং আমার দৃঢ় ধারণা আমি ভালো করবো। কতোকাল আর আমি বললাম, চাকরিটা ছাড়া ঠিক হবে না। রব সাহেব তাতে রাজিও হবে না। আমি সাধারণত এইসব সময় কঠিন কোনো সিদ্ধান্ত দেই না, আমার স্বভাব হলো তাকে সিদ্ধান্ত নিতে বলা। একটু ঘুরিয়ে বললাম, ব্যাপারটা যদি আমার হত আমি কি করতাম, চাকরিটা ছাড়তাম না। চাকরিটা না ছেড়ে আস্তে আস্তে কাজ এগিয়ে নিতাম যখন বুঝতে পারতাম, চাকরি ছেড়ে দিলে অসুবিধা হবে না, তখন ছেড়ে দিতাম। চাকরিটা হলো হাতের পাঁচ। তো এই চাকরি ছাড়াটা ঠিক হবে না। গোলাম মোহাম্মদ ভাই বারবার বলতে লাগলেন, মল্লিক ভাই আমার জন্য দোয়া করেন। আমি ব্যবসায় ভালো করবো। আমার ফার্মের নাম রেখে দিতে হবে। ডিকশনারী ঘেটে-ঘুটে দু-তিনদিন পর তাকে বললাম, আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম “শিল্লকোণ”। দৈনিক সংগ্রামের সামনে এখনো শিল্লকোণ সাইনবোর্ড আছে। ঠিক সেভাবেই প্রফেসর’স বুক কর্ণার নাম রেখে দিয়েছিলাম। প্রফেসর বুক কর্ণারের প্রতিষ্ঠাতা মালিক ছিলেন অধ্যাপক ফজলুর রহমান ভাই। এখন তিনি মডেল কলেজের প্রিন্সিপাল। তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন আমি তো একটি বইয়ের দোকান দেবো, কি নাম রাখা যায়। আমি বলেছিলাম আপনি একজন প্রফেসর মানুষ। প্রফেসরদের প্রতি মানুষের আকর্ষণ আছে। আর এটা বইয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিষয় সেজন্য আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম প্রফেসর’স বুক কর্ণার রাখেন ঐ আদলেই “শিল্লকোণ” রেখে দিলাম। গোলাম মোহাম্মদ খুব খুশি হলেন। এক সময় দেখলাম যে ঠিক লোকটির হাতে গোলাম মোহাম্মদ ভাই পড়ে গেছেন। ঠিক লোকটি মানে। আমাদের কবি সোলায়মান আহসানের ভাইয়ের কথাই বলছি। সোলায়মান আহসান ভাইয়ের বিরুদ্ধে আমাদের অনেকেরই অনেকরকম অভিযোগ আছে। আমার বিরুদ্ধে তো আছেই। কিন্তু সোলায়মান ভাইয়ের একটা সবচেয়ে বড় গুণ হলো প্রতিভাবান লোক দেখলেই তিনি জাপটে ধরেন। গোলাম মোহাম্মদ ভাইকে সোলায়মান ভাই ঠিকই চিনেছিলেন। দেখা গেলো সোনার বাংলায় ক্রমাগত লেখা ছাপা হচ্ছে গোলাম মোহাম্মদ ভাইয়ের। স্বাভাবিকভাবেই আমি খুব আনন্দিত হলাম। আর আমি জানি গোলাম মোহাম্মদ ভাইয়ের লেখা যখন সোনার বাংলায়

ছাপা হচ্ছে তখন সাজ্জাদ ভাইয়ের চোখেও পড়বে। সাজ্জাদ ভাইয়ের চোখে যখন কোনো লেখক পড়ে যায়। তখন সেই লেখকের যত্ন সংগ্রামের সাহিত্য পাতায় হয়ে থাকে। হঠাৎ করে একদিন দেখলাম যে সাজ্জাদ ভাইয়ের যত্নও গোলাম মোহাম্মদ ভাই পাওয়া শুরু করেছেন। গোলাম মোহাম্মদ ভাইয়ের প্রতি আমার শ্রদ্ধাবোধ এ কারণেও যে, সবাইকে নিয়ে বেঁচে থাকতে পারতেন। তার মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ ছিলো না। অহংকার ছিলো না। সবার সঙ্গে তার একটি সম্পর্ক ছিলো। ছোটদের অস্বাভাবিক ল্লেহ করত। সমবয়সীদের সাংঘাতিকরকম ভালোবাসতো। যারা মুরব্বি তাদের প্রতি তার ছিলো অগাধ শ্রদ্ধা।

সোলায়মান আহসান ভাইয়ের প্রতি গোলাম মোহাম্মদ ভাইয়ের অসম্ভব রকমের শ্রদ্ধা ছিলো। যেমন আমার প্রতি ছিলো। সাজ্জাদ ভাইয়ের প্রতিও ছিলো, সাজ্জাদ ভাইয়ের কাছে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, কোনো লেখক সম্পাদকীয় জীবনে সাজ্জাদ ভাইকে বেশি ভালো বেসেছে, বেশি শ্রদ্ধা করেছে। আমার মনে হয়, সাজ্জাদ ভাই বলবেন অর্থাৎ তার ছোট ভাইদের মধ্যে থেকে তিনি বাছাই করবেন গোলাম মোহাম্মদ ভাইকে। সাজ্জাদ ভাই যে গোলাম মোহাম্মদ ভাইকে কতোটা ভালো বেসেছিলেন ইস্তেকালের পরের দিনই বাংলাদেশের মানুষ তা জেনেছে। গোলাম মোহাম্মদ ভাই ইস্তেকাল করলেন। পরের সাহিত্য সংখ্যাটিই গোলাম মোহাম্মদ ভাইয়ের স্মরণিকা হিসাবে প্রকাশিত হলো। আমার আজও অবাক লাগে আমি তো দেখিনি একজন সাহিত্যিক মারা গিয়েছে, মারা যাওয়ার পরের সংখ্যা তার নামে বের করেছে। সাজ্জাদ ভাইয়ের টেবিলের সামনে বসেই চোখের পানি ঝরিয়েছে আর লিখেছে জাকির আবু জাফর, রফিক মোহাম্মদ, সোলায়মান আহসান ভাই, লিখেছেন আসাদ বিন হাফিজ, মোশাররফ হোসেন খান ভাই কয়জনের নাম বলব হয়ত এমন নাম অনেক বাদ পড়ে গেলো যাদের নাম বলাটা সঙ্গত ছিলো, উচিত ছিলো। গোলাম মোহাম্মদ ভাই লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। মৃত্যুর বেশ কিছু দিন আগে থেকে গোলাম মোহাম্মদ ভাই কবিতার বই বের করার জন্য খুব উঠে-পড়ে লেগেছিলেন। বারবার আমাকে বলতেন মল্লিক ভাই, আপনার একটা পাণ্ডুলিপি আমাকে দেন। আপনার একটা বই আমি ছাপাতে চাই। আমি বইয়ের পাণ্ডুলিপি তৈরি করার ব্যাপারে এখন পর্যন্ত প্রচণ্ড রকমের অমনোযোগী। বেশ কয়েকটি পাণ্ডুলিপি হাতে পারে, এ ধরনের লেখালেখি আমার আছে। কিন্তু পাণ্ডুলিপি তৈরি করার মত ধৈর্য মনে হয় আমার নেই। আমার ‘অনবরত বৃক্ষের গান’ বইটা বেরই হতোই না যদি কবি নাজিম মাহমুদ, আহমদ বাসির, আফসার নিজাম, রেদওয়ানুল হক পাণ্ডুলিপিটি তৈরি করে না দিত। আমার এক দায়িত্বশীল ভাই মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম। আমিনুল ইসলাম ভাই আমার একটা গানের বই বের করার জন্য কয়েক বছর ধরে তাগিদ দিচ্ছেন। সেই পাণ্ডুলিপিটি কবি আহমদ বাসির তৈরি করে দিয়েছে।

সে যাইহোক- গোলাম মোহাম্মদ ভাই হন্যে হয়ে আমার পেছনে লাগলেন কিন্তু আমার নিকট হতে পাণ্ডুলিপি তৈরি করাতে পারলেন না। ‘নাবিক’ নামে একটা সাহিত্য সংগঠন পরিচালনা করতেন, ছোট কাগজও বের করতেন, একটা সংখ্যায় গোলাম মোহাম্মদ ভাই বায়না ধরলেন আমার উপরে বের করবেন। আমার উপরে শেষ পর্যন্ত তিনি বের করেই ছাড়লেন। আমি যার-পর-নাই খুশি হলাম। কারণ আমি কাউকেই আমার জন্য লিখতে বলি না। আমি কাউকে আমার সাহিত্য সমালোচনা করতে বলি না, কাউকেই বলি না। কারণ এটা আমার জন্য অপমানকর বলে মনে হয়। আমি মনে করি, আমি যদি লিখে থাকি তারমধ্যে আলোচনা সমালোচনার কিছু থাকে, তাহলে কেউ না কেউ কোনো একদিন ভালোবেসে আলোচনা করবে। আর তাগিদ না দিয়ে যে লেখাটি বেরিয়ে আসবে সেটা ভালো হোক মন্দ হোক সেটিই তো আসলে লেখা।

হ্যাঁ বলছিলাম, যে কবি গোলাম মোহাম্মদ ভাই স্বেচ্ছায় ‘নাবিক’র একটি সংখ্যা আমার উপরে বের করেছিলেন। আমি অনেক আনন্দিত হয়েছিলাম। কারণ আমি তো তাকে আমার উপরে কোনো সংখ্যা বের করতে বলিনি। আমি মনে করি, তার এই সংখ্যাটি আমার জীবনের একটি বড় পাওয়া। গোলাম মোহাম্মদ ভাই বেঁচে থাকলে সম্ভবত আমার বইগুলো কোনো না কোনভাবে বেরিয়ে যেতো। যেভাবে আমাকে তাগাদা দেওয়া শুরু করেছিলেন, তাতে আমি তাকে পাণ্ডুলিপি না দিয়ে পারতাম না। আমার কাছে অনেকেই অনেক সময় পাণ্ডুলিপি চেয়েছেন কিন্তু নানান কায়দায় এবং কৌশলে আমি এড়িয়ে গেছি। আমি কাউকেই পাণ্ডুলিপি দিইনি। কিন্তু গোলাম মোহাম্মদ ভাইকে আমার পক্ষে এড়ানো সম্ভব ছিলো না। আমি কিছু-কিছু প্রতিষ্ঠানে পাণ্ডুলিপি দিতে চাইনি কারণ সেই সব প্রতিষ্ঠানের সাথে আমি নিজে যুক্ত। আমি যে প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত, সেই প্রতিষ্ঠান থেকে আমি আমার বই বের করার ব্যাপারে সত্যিই লজ্জাবোধ করি। সংস্কৃতি নিয়ে সোলায়মান ভাই একদিন আমার সাথে কথা বললেন, মল্লিক ভাই, বাংলা সাহিত্য পরিষদে তো একজন সংগঠক দরকার, আমরা তো কেউ সময় দিতে পারি না। নাসির হেলাল ভাই ছিলেন এখন নেই। তো আমি চিন্তা করেছি গোলাম মোহাম্মদ ভাইকে বাংলা সাহিত্য পরিষদে নিতে হবে। আমি লাফ দিয়ে উঠলাম। বললাম, সোলায়মান ভাই এতো চমৎকার চিন্তা কি করে করলেন আপনি? গোলাম মোহাম্মদ একদিকে একেবারে নিবেদিত প্রাণ ইসলামী আন্দোলনের কর্মী, অন্যদিকে নিবেদিত প্রাণ কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, আর্টিস্ট এবং একেবারে নিরহংকার, নির্লোভী একটি মানুষ। বাংলা সাহিত্য পরিষদে গেলে বাংলা সাহিত্য পরিষদের খুবই লাভ হবে। দেখেন কি করা যায়। আর মানুষ তৈরি করার ক্ষেত্রে তার যে অবদান, সেটাকে আমি সব সময় শ্রদ্ধার চোখে দেখেছি। কবি সোলায়মান আহসান ভাইয়ের হাতে

যখনই কোনো পত্রিকা থেকেছে তখনই সেই পত্রিকার মধ্যে দিয়ে তিনি কিছু নতুন মানুষ তৈরি করেছেন। যতোদিন সোনার বাংলায় ছিলেন তার হাতে নতুন মানুষ তৈরি হয়েছে। এইভাবে যখন যেখানে থেকেছেন, সিলেটে ছিলেন, সিলেটে থাকতে তার সংস্পর্শে বহু নতুন লোক তৈরি হয়েছে। তো গোলাম মোহাম্মদ ভাইয়ের ব্যাপারে একটা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সোলায়মান ভাই। গোলাম মোহাম্মদ ভাই বাংলা সাহিত্য পরিষদে গেলেন। লক্ষ্য করতে লাগলাম, গোলাম মোহাম্মদ ভাই কিভাবে প্রোথাম সাজাচ্ছেন। লক্ষ্য করলাম যে, আমাদের ভেতরে যাদের যাদের মধ্যে একটু ভুল বুঝাবুঝি আছে, সাহিত্য সভায় সবাইকে তিনি এক জায়গায় বসাচ্ছেন। দূর থেকে মিটমিট করে হাসি। মাঝে মাঝে টেলিফোন করে বলি আপনি তো খুব ভালো উদ্যোগ নিয়েছেন। শুধু ইসলামী আন্দোলনের ভেতরের কবি, সাহিত্যিক, শিল্পীদেরকে এগিয়ে দেয়ার জন্যে এবং তাদের মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরি করার জন্যে চেষ্টা চালানো না বরং বাংলা সাহিত্য পরিষদের ব্যাপ্তিকে আরো অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে দেয়ার জন্যে চেষ্টা চালানো শুরু করলেন। গোলাম মোহাম্মদ ভাইয়ের মধ্যে একটা অসাধারণ শক্তি ছিলো, এই অসাধারণ শক্তির কারণে বাইরের বড় বড় কবি, সাহিত্যিক এবং বুদ্ধিজীবীরাও বাংলা সাহিত্য পরিষদে আসা শুরু করলেন। সাহিত্য সভায় কিংবা কোনো বিশেষ দিবস উদযাপন উপলক্ষে তার এই সমন্বয়টা সত্যিই দেখবার মতো।

কবি আল মাহমুদ ভাইয়ের একটি কবিতা নিয়ে খুব বিতর্ক সৃষ্টি হলো। গোলাম মোহাম্মদ ভাই এই সময়েও সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। গোলাম মোহাম্মদ ভাইয়ের সঙ্গে যখন কথা হচ্ছিলো তখন আমি জানতে চেষ্টা করছিলাম, কবি আল মাহমুদ ভাই সম্পর্কে গোলাম মোহাম্মদ ভাইয়ের মতামতটা কি। আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম যে চিন্তাটা আমার গোলাম মোহাম্মদ ভাইয়েরও সেই চিন্তা। একটি কথা বলে নিই, সাহিত্য এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নানান ধরনের জটিলতা যখন দেখা যেতো আমি সবচেয়ে আগে গোলাম মোহাম্মদ ভাইয়ের সাথে আলোচনা করার চেষ্টা করতাম। আমি গোলাম মোহাম্মদ ভাইয়ের কাছ থেকে পরামর্শ নিতাম। আমার যে একটি চিন্তা এবং ভাবনা, সেই চিন্তা ভাবনাকে তার পরামর্শের আলোকে শাণিত করতাম। কখনো কখনো তার পরামর্শের আলোকে আমি আমার চিন্তাকে ত্যাগ করতাম।

কবি আল মাহমুদ ভাইয়ের বিষয়টি যখনই আমার সামনে এসেছে তখনই আমার মনে হয়েছে এই বিষয়টি নিয়ে এক শ্রেণির লোক হৈ চৈ করবে। এই হৈ চৈটাকে সামলাতে হবে। আল মাহমুদ ভাইয়ের বক্তব্য শুনতে হবে, নিশ্চয়ই আল মাহমুদ ভাই তাসলিমা নাসরিনের মতো কথা বলবেন না। দাউদ হায়দারের মত কথা

বলবেন না। আমি ব্যক্তিগতভাবে আল মাহমুদ ভাইকে চিনি। আল মাহমুদ ভাইয়ের সঙ্গে অনেক কবি-সাহিত্যিকের চেয়ে আমার সম্পর্ক বেশি। তার ঈমানী জয়বা সম্পর্কে আমার জানা আছে। আল মাহমুদ ভাইয়ের সঙ্গে যখনই আলাপ হলো কেঁদে দিলেন। কেঁদে দিয়ে বললেন যে, আমার দ্বারা এতো বড় ভুল হবে, এটা আমি বুঝতে পারিনি। আমি সবসময় এ ধরনের কবিতা লিখলে আবদুল মান্নান তালিব ভাইকে দেখিয়ে নিই। কিন্তু কেনো জানি এই কবিতাটা লেখার সময় একবারও আবদুল মান্নান তালিব ভাইয়ের কথা মনে পড়লো না।

আমি বিম্মিত হয়ে গোলাম, কবি গোলাম মোহাম্মদ ভাই কতো দূরের দৃষ্টি রাখেন। গোলাম মোহাম্মদ ভাই যা যা বললেন, আল মাহমুদ ভাইয়ের সাথে আলাপ করার পর দেখা গেলো ঠিক তারই প্রতিধ্বনি। গোলাম মোহাম্মদ ভাই খুব শক্ত ভূমিকা রেখেছিলেন। কে একজন আল মাহমুদ ভাইয়ের মাথা উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। গোলাম মোহাম্মদ ভাই তার জবাবে বলেছিলেন হুবহু হয়ত বলতে পারবো না, কিন্তু তার অর্থ এইরকম, ‘আল মাহমুদের গায়ে একটা টোকা দিয়ে দেখো, তারপরে কার ঘাড়ে কয়টা মাথা থাকে দেখে নেবো।’ বিভিন্ন সময় আমি গোলাম মোহাম্মদ ভাইয়ের সঠিক পন্থা অবলম্বন করতে দেখেছি। বাংলা সাহিত্য পরিষদের ব্যাপারে। তালিব ভাইয়ের ব্যাপারে সঠিক পরামর্শ উনাদেরকে দিয়েছেন। আবুল আসাদ ভাইয়ের ব্যাপারে। সোলায়মান আহসান ভাইয়ের ব্যাপারে, একটি সমন্বয়ের চিত্র ছিলো। তার আলোচনার মধ্যে দিয়ে একটি কথা উচ্চারিত হতো, মল্লিক ভাই, আমাদের তো এই কটা মাত্র শোক, এইতো আমাদের মাহমুদ ভাই, এইতো আমাদের মান্নান ভাই, এইতো আমাদের মোশাররফ ভাই, এইতো আমাদের সোলায়মান ভাই, হাতে গুনলে তো এই কয়টা মানুষই আমাদের, আমাদের বাইরে আর সম্পদ কই। এই সম্পদ যদি আমরা একটু বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজে লাগাতে না পারি, তাহলে আমাদের বই বের করার কে আছে? আমাদের লেখকদের কি বিপুল পরিমাণের বই আছে, আপনি বলেন তো দেখি আমাদের এই বইগুলো বের করার কেউ আছে কিনা? আসলেই আমাদের কেউ নাই, তাহলে এই অবস্থায় আমরা তো বিচ্ছিন্ন থাকতে পারি না। আমাদের বিচ্ছিন্ন থাকাটা ঠিক নয়। আমি আমার চিন্তাভাবনাকে গোলাম মোহাম্মদ ভাইকে দিয়ে আরো শাণিত করেছি। চিন্তা করেছি, এই সমন্বয়ের পথে আমি কাউকে পাই বা না পাই গোলাম মোহাম্মদ ভাইকে পাবো।

গোলাম মোহাম্মদ ভাই বাংলা সাহিত্য পরিষদের কাজ করছেন, তার প্রতিষ্ঠানের কাজ করছেন, এই সময়ে তিনি অজস্র কবিতাও লিখছেন। মহিলা সাহাবীদের ব্যাপারে গোলাম মোহাম্মদ ভাইয়ের কিছু কবিতা ছাপা হলো। আমি দেখে একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গোলাম, এতো শক্তিশালী কবিতা, মহিলা সাহাবীদের নিয়ে

তো আমি কোনো ভালো কবিতা লিখতে পারিনি। অথচ মহিলা সাহাবীদের নিয়ে কতো চমৎকার কিছু কবিতা তিনি লিখেছেন। আমি লক্ষ্য করলাম, তার কবিতার মধ্যে আন্তর্জাতিকতা আসছে, স্বাদেশীকতা আসছে, বিজ্ঞান আসছে, প্রযুক্তি আসছে। ভাবলাম গোলাম মোহাম্মদ ভাই তো বিজ্ঞানের মানুষ সুতরাং বিজ্ঞানের কথা তার চেয়ে আর ভালো করে কে বলতে পারবে, সংগঠনের কথা আসছে, ঐক্যের কথা আসছে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের কথা আসছে, বাংলাদেশের যথার্থ সাহিত্য এবং সংস্কৃতির কথা আসছে, গোলাম মোহাম্মদ ভাই সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে এবং তার সাহিত্যের আলোচনার মধ্যে দিয়ে আমি কখনো তাকে পরদেশী হবার প্রবণতা লক্ষ্য করিনি। তাকে আমি পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে দেখেছি। পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য তিনি পড়েছেন কিন্তু একজন যথার্থ বাংলাদেশী হিসেবে পড়েছেন, একজন ঈমানদার হিসেবে পড়েছেন, তাদের যে দর্শন সে দর্শনকে কখনও তিনি গ্রহণ করেননি। বরং আলোচনার মধ্যে দিয়ে তিনি বলেছেন যে, ‘মল্লিক ভাই পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটি লেখার মধ্যে দিয়ে তারা তাদের ধর্মীয় দর্শনকে তুলে ধরছে। আর আমাদের দেশের ছেলেরা সেগুলো গিলে ফেলেছে এই দুঃখ কোথায় রাখি। রবীন্দ্রনাথ অনেক বড় কবি, রবীন্দ্রনাথ যা কিছু করেছেন তার জাতির জন্য করেছেন। রবীন্দ্রনাথের জীবন-দর্শন আমার জীবন-দর্শন হতে পারে না। অবশ্যই তিনি একজন বড় কবি, অবশ্যই তিনি বাংলা ভাষার গৌরব কিন্তু আমাদের ছেলেরা কখন সম্মিত ফিরে পাবে যে জীবন-দর্শন একটি বিষয় আর সাহিত্য আরেকটি বিষয়। একজন লেখকের জীবন-দর্শন থাকতেই হবে কিন্তু সেই জীবন-দর্শন আরেকজন লেখকের জীবন-দর্শন হতে হবে এমনটি ভাববার কোনো দরকার নেই।’ আমাকে বলতো যে, ‘রবীন্দ্রনাথের জীবন-দর্শন বঙ্কিমের জীবন-দর্শন এক নয়। বঙ্কিম বঙ্কিমের পথে চলেছে, রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের পথে চলেছে। কিন্তু কখন কখন তাদের জীবন-দর্শন একীভূত হয়ে গেছে। কারণ সাংস্কৃতিক দিক থেকে দু’জনই হিন্দু ছিলেন।’ আমি তার বিশ্লেষণগুলো শুনে হতবাক হয়ে যেতাম। এজন্য আমি তার সাথে আলোচনা করার মধ্য দিয়ে আনন্দবোধ করতাম।

বিশ্বসাহিত্যের পড়াশোনা আমাদের মধ্যে তার সবচেয়ে বেশি ছিলো। আমাদের মধ্যে বিশ্বসাহিত্য পড়ার প্রবণতা অনেকেরই আছে কিন্তু বিশ্বসাহিত্যের ওপর তার পড়াশোনা ছিলো বেশি। আর্টিস্ট হওয়ার কারণে আমার তো ধারণা ক্যালিগ্রাফির ওপর তার যে পড়াশোনা ছিলো অনেকেরই তা ছিলো না। এইভাবে শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ক্যালিগ্রাফি, আর্ট, কালচার, ইসলামী দর্শন, ইসলামী আন্দোলন সাহাবীদের জীবন, রাসূলের জীবন, তাফসীর,

হাদীস, কোন দিকটা বাদ দেবো, যে দিকে আমাদের গোলাম মোহাম্মদ ভাই জোর দেননি এবং একটা কথা আমি পরিষ্কার বলতে চাই, গোলাম মোহাম্মদ ভাই ছিলেন বইয়ের পোকা। অনেক বই তার সংগ্রহে ছিলো। বই তিনি সংগ্রহ করতেন, অনেকদিন আমি এই বইগুলোর খবর রাখি না, জানি না, কোথায় সেই বইগুলো এখন আছে, কারা কাজে লাগাচ্ছে। ভালো লোকদের হাতে যদি পড়ে থাকে, তাহলে গোলাম মোহাম্মদ ভাইয়ের বইগুলো জাতির খেদমতে আসবে। না হয় ঐ ডক্টর শহীদুল্লাহদের বইগুলো যেমন বিলীন হয়ে যাচ্ছে, ঐ রকম গোলাম মোহাম্মদ ভাইয়ের বইগুলো একদিন বিলীন হয়ে যাবে।

সে যাই হোক গোলাম মোহাম্মদ ভাই প্রত্যেকটি দিকে দক্ষ ছিলেন এবং হুঁশিয়ার ছিলেন, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন। মৃত্যুর কয়েক মাস আগে, ফজলুর রহমান ভাই বললেন গোলাম মোহাম্মদ ভাই যে শেষ হয়ে যাচ্ছে, মল্লিক খবর আছে? শিল্লকোণের ভাড়া সে দিতে পারছে না। আট মাস নয় মাসের ভাড়া বাকী, বাসায় তার রান্না হয় না, ঋণে-ঋণে জর্জরিত। তাড়াতাড়ি ঐ শিল্লকোণ থেকে বের করে নেন, বের করে নিয়ে তাকে সংসার চালাবার মতো একটা চাকরি দিয়ে দেন, তা না হলে কিন্তু গোলাম মোহাম্মদকে আপনারা অচিরেই হারাবেন। আমি হতবাক হয়ে গেলাম, তার বাসায় রান্না হয় না? গোলাম মোহাম্মদ ভাইকে ডাকলাম। সম্ভবত এই ব্যাপারে আমাকে জাকির আবু জাফরও খানিকটা ইঙ্গিত দিয়েছিলো। গোলাম মোহাম্মদ ভাই আজ আসি কাল আসি বলে একদিন এলেন। আলাপ করলাম। ব্যবসা সে ছাড়তে চায় না, স্বাধীনচেতা মানুষ। কারো গোলামী সে পছন্দ করত না। আমাকে বলল, মল্লিক ভাই আমি আরেকটু চেষ্টা করে দেখি। তখন তাকে বললাম, ঠিক আছে এক কাজ করেন, ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনে একটা দরখাস্ত করে আরো অনুদান নেন, যদি ব্যবসায় দাঁড়িয়ে যেতে পারেন আন্তে আন্তে পরিশোধ করবেন। আর যদি ব্যবসায় মার খেয়ে যান তাহলে আপনার এই টাকাটা পরিশোধ করা লাগবে না। আমার সব কথায় সায় দিলো, হ্যাঁ হ্যাঁ করলো। মাঝে মাঝে দেখা হচ্ছে আমি দরখাস্ত চাচ্ছি। জাকিরকে তাগিদ দিই, জাকির, গোলাম মোহাম্মদ ভাইয়ের তো দরখাস্ত দেওয়ার কথা ছিল। আবার গোলাম মোহাম্মদ ভাইয়ের সঙ্গে আলাপ করলে বলে, মল্লিক ভাই, আপনি আমার জন্য দোয়া করেন। আত্মমর্যাদার কারণে আমাকে বলতে চায়নি। কি ব্যাপার ঘটেছিলো। যাই হোক, তাকে দিয়ে আমি আর দরখাস্ত উদ্ধার করাতে পারলাম না। প্রত্যাশা প্রাঙ্গণে কোনো অনুষ্ঠানে আসতে বললে সে আসত। একেবারে চলে আসতো, সাজ-পাজ নিয়ে। কতোজনকে দাওয়াত দেওয়া হয়, কতোজনই বা আসে কিন্তু গোলাম মোহাম্মদ ভাইকে দাওয়াত দিলে ফুটার ভর্তি করে নিয়ে চলে আসত আমার এখানে।

মাঝে মাঝে বাংলা সাহিত্য পরিষদে সভাপতি হতে বলতো। আমি বলতাম, গোলাম মোহাম্মদ ভাই, আমাকে সভাপতি করবেন না তাহলে আপনি বিতর্কিত হয়ে যাবেন। আপনি জানেন না, আমাকে বিপুল পরিমাণ লোক অপছন্দ করে। মুখ ফুটে হয়তো বলে না আমার বিরুদ্ধে কিন্তু বিপুল পরিমাণ লোক আমাকে বরদাস্ত করতে পারে না, আমি তো বুঝতে পারি। সুতরাং আপনি বিপদে পড়ে যাবেন। কোনো কথা শুনতো না। আমি সাজেশন দিতাম, অমুককে সভাপতি করেন, আমি আলোচক হিসেবে থাকবো।

কিন্তু অনুষ্ঠানে গিয়ে দেখলাম, ঠিকই আমাকে সভাপতি করে বসে আছে। আমার খুব রাগ হতো। আমি রেগে-মেগে গোলাম মোহাম্মদ ভাইকে জিজ্ঞেস করতাম, আপনাকে নিষেধ করলাম, তারপরেও সভাপতি করলেন? গোলাম মোহাম্মদ ভাই হা-হা করে হেসে দিতেন। রাগ করতে পারতাম না। এইভাবে যেতে লাগলো, তার অনেকগুলো বই বেরিয়ে গেলো, খুব খুশি হতে লাগলাম। বই কিন্তু বেরুচ্ছে। আমি চিন্তা করে পারি না বই বেরিয়ে যাচ্ছে। অথচ সংসার চালাতে পারছে না। একদিন মশিউর রহমান বলল। মল্লিক ভাই, গোলাম মোহাম্মদ ভাইকে আমরা গীতিকার হিসেবে নিয়ে নিয়েছি। খুব খুশি হলাম এবং আমি মানচুরকে সালাম পৌছে দেওয়ার জন্য বললাম এবং আমি এও বললাম, মানচুর বিরাট একটা ভালো কাজ করেছে এবং খুবই উপকারী একটি কাজ। দোয়া করি। কোথাও তাকে দেওয়া যায় কিনা সে চেষ্টাটাও আমার থাকলো। আমি খোঁজখবর নিতে থাকলাম, যেমন একদিন এডুকেশন সোসাইটিতে গিয়েছিলাম তেমনি কোনো প্রতিষ্ঠানে পদ খালি আছে কিনা।

একদিন প্রোফ্রাম ছিলো কিশোরকণ্ঠের। আসরের পর বাংলা সাহিত্য পরিষদের তৌহিদের টেলিফোন গেলো। মল্লিক ভাই, গোলাম মোহাম্মদ ভাই হাসপাতালে। বললাম হাসপাতালে! হ্যাঁ, আপনি আসলে একটু ভালো হতো, ডা. রফিক ভাইয়ের এখানে আছে। খুশি হলাম। ডা. রফিক ভাই আমাদের বন্ধু মানুষ। সাহিত্য এবং সংস্কৃতি অঙ্গনের মানুষ। পাঞ্জেরী শিল্পীগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, সাইমুম শিল্পীগোষ্ঠীর এক সময়ের পরিচালক এবং খুব ভালো কবি। আমাদের সাংস্কৃতিক জগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। কিন্তু আমরা সাংস্কৃতিক জগতে তাকে ধরে রাখতে পারিনি। তাকে কাজে লাগাতে পারিনি। এই ব্যর্থতা আমাদের। তো নিজে যখন অসুস্থ হই, সর্বপ্রথম পরামর্শ নিতে যাই রফিক ভাইয়ের কাছে। আমার যন্ত্রা রোগটা প্রথম ধরেছিলেন রফিক ভাই। আমরা একটা সাহিত্য বিষয়ক বৈঠকে ছিলাম। খুব কেশেছিলাম। বৈঠক শেষে বেরিয়ে এসেছিলাম, পেছনে পেছনে রফিক ভাই বেরিয়ে এসেছিলেন। ওষুধ কিনে দিয়েছিলেন, কাশির ওষুধ। বলেছিলেন সাতদিন পরে আমার ক্লিনিকে আসবেন। গেলাম,

বললেন, ওষুধগুলো কিনে দিয়েছিলাম, কাশির ওষুধ, তাতে কি কাশ কমছে। বললাম, না। তখন দেখলাম রফিক ভাইয়ের মুখটা ম্লান হয়ে গেছে। বললেন, মল্লিক ভাই, যা ভেবেছিলাম তাই। আপনাকে টি.বিতে ধরেছে। এখনই আপনার রক্ত ও পেশাব পরীক্ষা করতে হবে। তখনই রক্ত পরীক্ষা করলেন পেশাব পরীক্ষা করলেন। বললেন, কোনো সন্দেহ নেই টি.বি হয়ে গেছে। আপনি ইবনে সিনায় যান নিশ্চিত হওয়ার জন্য। নিশ্চিত হয়েছিলাম টি.বি হয়েছে। এভাবে অসুখে, শোকে-দুঃখে আমরা রফিক ভাইকে পাই।

কিশোরকণ্ঠ থেকে বেরিয়েছি। ছুটারে উঠেছি পল্টন থেকে বাসা পর্যন্ত। শেখেরটেক পর্যন্ত ঠিক করেছি। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি, সত্যিই আমি গোলাম মোহাম্মদকে ভুলে গিয়েছিলাম কিন্তু যখনই কলাবাগানের মাঠের কাছে আমি এলাম, মনে পড়লো, আমার তো গোলাম মোহাম্মদ ভাইকে দেখতে যাওয়ার কথা। অনুরোধ করলাম, বেবীটেক্সিওয়ালাকে, আমি শেকেরটেকে যেতে চেয়েছিলাম তোমার ভাড়ায় কোনো অসুবিধা হবে না, তুমি ধানমন্ডি একটা ক্লিনিকে নিয়ে চলো।

ক্লিনিকে ঢুকলাম। আগেই রফিক ভাইয়ের কাছে গোলাম, রফিক ভাই কথা বলতে-বলতে ফুলে-ফুলে কেঁদে উঠলেন, আমার গোলাম মোহাম্মদকে মনে হয় আমি বাঁচাতে পারবো না। নিজেকে সামলালাম, বললাম, আসল ব্যাপারগুলো খুলে বলেন রফিক ভাই। বললেন, এ অবস্থায় মানুষ ফিরে আসে না। তার সেপ নেই এবং তার জন্য এখন চিকিৎসা হলো সোহরাওয়ার্দীতে। গ্র্যারেজমেন্টটা শিকদারের ওখানেও আছে। শিকদার মেডিকলে আছে, ইবনে সিনাতেও নেই, রফিক ভাই খুব আক্ষেপ করে বললেন, ইবনে সিনার এই মেশিনটা সংগ্রহ করার দরকার ছিলো। বললেন, সব জায়গায় গোলাম মোহাম্মদ আসার পর, টেলিফোন করেছি কোনো সিট নেই, আমি চেষ্টা অব্যাহত রেখেছি, মুহূর্তে মুহূর্তে ফোন করছি। সেখানে নিয়ে গেলেতো, অনেক টাকার দরকার হবে, এ দায়িত্বটা কে নেবে মল্লিক ভাই। বললাম, কেউ না নিক আপনি আর আমি নিই। রফিক ভাইয়ের চোখ থেকে টপটপ করে পানি পড়তে লাগলো। কিছুই বললেন না। মুহূর্তে টেলিফোন করতে লাগলেন।

সমস্ত শরীর আমার অবশ হয়ে গেছে প্রায়। মন তবু কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলো, আমিই তো গোলাম মোহাম্মদকে ভালোবেসেছিলাম, আমিই তো এই গোলাম মোহাম্মদকে ঢাকায় নিয়ে এসেছিলাম, আমিই তো গোলাম মোহাম্মদকে বিয়ে দিয়েছিলাম, আমিই তো গোলাম মোহাম্মদের একটি চাকরির জন্য তাড়াহুড়ো করেছিলাম, আমিই তো সারা বাংলাদেশে গোলাম মোহাম্মদকে নিয়েই আমার ঘুরা। কারণ গোলাম মোহাম্মদ এমন কবি নন, যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে হাত পাতবে

বাইরে সফরে গেলে। কিম্বা বলবে আমাকে এতো টাকা দিতে হবে, আমার এতো খরচ হয়ে গেছে। গোলাম মোহাম্মদ হচ্ছে সেই কবি যার আত্মমর্যাদাবোধ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, অর্থনৈতিক কোন কলিংকারি, অর্থনৈতিক কোনো লোভ-লালসা যার জীবনে নেই।

চট্টগ্রামে কবিতা পাঠের আসর। আমি গোলাম মোহাম্মদকে এই নিয়তেই নিয়ে গলাম। সারাদেশে কবিতা পাঠের আসর হবে, গোলাম মোহাম্মদ ভাইকে সঙ্গে রাখবো, সঙ্গে রাখলে কোনো সমস্যায় পড়তে হবে না, ঠিকই গোলাম মোহাম্মদ ভাইকে নিয়ে যেখানে যেখানে গেছি, সমস্যা হয়নি। আর যাদেরকে সঙ্গে করে নিয়েছি, দু'চারজন বাদে, অন্যদের ব্যাপারে আমার এতো সমস্যা হয়েছে যে, আমি আর কাউকে সঙ্গে করে কবিতা পড়বার যে আশ্রয় পোষণ করতাম, সে আশ্রয় পরিত্যাগ করেছিলাম। আমার গ্রামে একটি সাংস্কৃতিক সম্মেলন হয়। বছরে একবার আমি সেখানেও গোলাম মোহাম্মদকে নিয়েছিলাম।

“হলদে ডানার সেই পাখিটা এখন ডালে ডাকে না, মনের কোণে রঙিন ছবি এখন সে আর আঁকে না।” এই গানটি মশিউর যখন আমাকে শুনিয়েছিলো, সুর দিয়েছে মশিউর, আমি মশিউরকে বলেছিলাম, মশিউর আমাদের গানের জগতে বিপ্লব এসেছে। আমরা একটি কালকে অতিক্রম করেছি। আর এইকালের সাক্ষী হলো গোলাম মোহাম্মদ ভাইয়ের এ গান। আমাদের ইসলামী গানের যদি কাল নির্ণয় হয়, তাহলে গোলাম মোহাম্মদের গানই এই কাল নির্ণয়ের ভূমিকা হবে। অদ্ভুত সুর, অদ্ভুত গান, এর আগে এতো সুন্দর সুর, এতো সুন্দর আধুনিক গান, সাহিত্যসম্মত গান এবং সুর আমার কানে আমাদের অঙ্গন থেকে এসেছে বলে আমি তখন মনে করতে পারিনি।

আশ্রয় ছিলো যে আমি আর কোথাও না পারি আমার গ্রামে নিয়ে গোলাম মোহাম্মদ ভাইকে পুরস্কৃত করবো। মশিউরকে পুরস্কৃত করবো। মশিউর আমার খুবই প্রিয় সুরকার। সর্বশ্রেষ্ঠ। যেমন আমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সুরকার আমাদের লিটন হাফিজ চৌধুরী। আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সুরকার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আমিরুল মোমেনীন মানিক। শ্রেষ্ঠ সুরকার, আগে বলার দরকার ছিলো চৌধুরী আবদুল হালীম, সবার আগে বলার দরকার ছিলো তাফাজ্জল হোসাইন খানের নাম, এরা সবাই আমার কাছে শ্রেষ্ঠতম সুরকার। তো এই দুইজন প্রিয়তম গীতিকার-সুরকারকে পুরস্কৃত করার একটা বাসনা আমার মধ্যে কাজ করছিলো। আমি কোনো যুক্তি খুঁজে পাচ্ছিলাম না যে ঢাকায় এদেরকে কিভাবে পুরস্কৃত করবো। চিন্তা করলাম আমার গ্রামের সংগঠনের মাধ্যমে যদি পুরস্কার দিই তাহলে কেউ কিছু বলবে না। ঢাকাকে যদি কোন সংগঠনকে প্রস্তাব দিই তাহলে নানান ধরনের কথা আসবে। আমার গ্রামের সংগঠনের কাছে প্রস্তাব দিলে তারা আমার কথা একবাক্যেই মেনে নেবে। ঠিকই তারা মেনে নিয়েছিল। গানের জন্য

গোলাম মোহাম্মদ ভাইকে আর সুরের জন্য মশিউর রহমানকে আমরা পুরস্কার দিয়েছিলাম। জাকির আবু জাফরকে সাহিত্যের জন্য পুরস্কার দিয়েছিলাম। আমাদের এই পুরস্কার প্রদানকারী খান জাহান আলী শিল্পীগোষ্ঠী। কোনো সংগঠনের কাছে, কোনো প্রতিষ্ঠানের কাছে এ পর্যন্ত পয়সা চায়নি। ছয় বছর তারা উৎসব করছে, নিজেদের পকেটের পয়সা খরচ করে। ত্রিশ-চল্লিশ হাজার টাকা খরচ হয় প্রতি বছর। এই পুরো ত্রিশ-চল্লিশ হাজার টাকাই আমাদের থ্রামের লোকদের টাকা। আলহামদুলিল্লাহ। ফলে আমার মধ্যে একটি আনন্দ কাজ করে, আমি মনের মতো করে গোলাম মোহাম্মদ ভাইকে এবং মশিউর রহমানকে পুরস্কার দিতে পেরেছিলাম। আগেই পরিকল্পনা নিয়েছিলাম, কিন্তু তার যে চাকরি, সেই চাকরিতে তাকে রেখে সারা বাংলাদেশ ঘুরানো সম্ভব নয়। সেজন্য শেষের দিকে সোলায়মান আহসান ভাই বলেছিলেন, মল্লিক ভাই, তার যে অর্থনৈতিক অবস্থা, তাকে বাংলা সাহিত্য পরিষদে ফুলটাইমার হিসেবে নিতে হবে। আমি সোলায়মান ভাইয়ের এই চিন্তাকেও স্বাগত জানিয়েছিলাম। আমি আফসোস করেছিলাম, এই চিন্তাটা তো আমার মাথায় আসতে পারতো। কিন্তু আসলো সেই সোলায়মান ভাইয়ের মাথায়। আমরা চিন্তাভাবনা করতে লাগলাম কিভাবে কি করা যায়। গোলাম মোহাম্মদ ভাইকে ফুলটাইমার করা কিন্তু চাট্টিখানি ব্যাপার নয়। কেন চাট্টিখানি ব্যাপার নয় সেটা তালিব ভাই জানেন। সেটা হয়ত তৌহিদও জানে। তো আমরা দুইজনে মিলে সিদ্ধান্ত নিলাম। সময় সুযোগ মতো সোজাসুজি তালিব ভাইকে গিয়ে বলবো। আমি জানি না ফুলটাইমার করার ব্যাপারে সোলায়মান ভাই তালিব ভাইকে বলেছিলেন কিনা। তখন দু'জনেই ছির সিদ্ধান্ত করেছিলাম, গোলাম মোহাম্মদ ভাইকে যদি বাংলা সাহিত্য পরিষদে ফুলটাইম করা যায়, তাহলে তার কাছ থেকে আমরা কাজ পাবো। আমার চিন্তাটা থাকলো গোলাম মোহাম্মদ ভাইকে যদি বাংলা সাহিত্য পরিষদে নিয়ে যেতে পারি তাহলে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে সারা বাংলাদেশ ঘুরতে পারবো।

ঐ সময় যখনই তাকে প্রস্তাব করেছি, গোলাম মোহাম্মদ ভাই চলেন আমার সাথে রাজশাহী। মল্লিক ভাই আমার তো শরীর ভালো না, আর শিল্পকোণের কিছু কাজ আছে এই কাজগুলো ফেলে দিয়ে আমি যেতে পারবো না। লোকেরা এমনই আমার ওপর খড়গহস্ত হয়ে আছে। শেষের দিকে বিপুল পরিমাণ লোক গোলাম মোহাম্মদ ভাইকে নানান ধরনের কথা শুনিয়েছে, গোলাম মোহাম্মদ ভাই ঐ সময় বলতেন, সময়মতো থাকতে হয়। তা না হলে কোম্পানি চলে না। রফিক ভাইয়ের কথা থেকেই মূলত এতোগুলো কথা বলতে হলো। বাংলা সাহিত্য পরিষদে কাজ করতে গিয়ে রফিক ভাইকে গোলাম মোহাম্মদ ভাই জয় করেছিলেন, বাংলা সাহিত্য পরিষদের যাবতীয় ব্যাপারে গোলাম মোহাম্মদ ভাইয়ের সাথে রফিক ভাইও পরামর্শ করতেন। আশ্চর্য ব্যাপার, গোলাম মোহাম্মদ ভাই অধ্যাপক মতিউর রহমান সাহেবেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

বাংলা সাহিত্য পরিষদের ব্যাপারে তারও পরামর্শ তিনি নিতেন। তো গোলাম মোহাম্মদ ভাইকে দেখতে গেলাম। রফিক ভাইও সঙ্গে গেলেন। দেখলাম সে শুয়ে আছে। তার দুটি চোখের কোণ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। সমস্ত মুখমণ্ডলে একটি বেদনা কাজ করছে। আমার কাছে মনে হয়েছিলো, সেই বেদনা মৃত্যুর জন্য নয়। সে বেদনা হলো সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে জয়ী করার জন্য এই যে স্বপ্ন সে দেখেছিলো, সেই স্বপ্ন সে পূরণ করে যেতে পারলো না। সেই বেদনা। মেয়ে অনিকার জন্য তার প্রচণ্ড মমতা ছিলো। হঠাৎ হঠাৎ সে বাসায় চলে যেতো। তার ছেলোটোর জন্য খুব দুশ্চিন্তা ছিলো, পরামর্শ করতো, মল্লিক ভাই, ছেলোটো তো পড়াশোনা করে না, কি করা যায়। বলতাম, দোয়া করেন এবং কঠোর হবেন না। কঠোর হলেই সে কিন্তু আরও নষ্ট হয়ে যাবে। বলতো, ঠিক, মল্লিক ভাই ঠিক বলেছেন।

গোলাম মোহাম্মদ ভাইয়ের বাসায় লজ্জায় যেতাম না। আমি যে মেয়েটিকে বিয়ে দিয়েছি, এই মেয়েটি আমার খুবই স্নেহের ছিলো। আমার বাছাই করা মেয়ে ছিলো। কি এক লজ্জায় যেন আমি গোলাম মোহাম্মদ ভাইয়ের বাসায় যেতাম না। বেশি বেশি যাওয়াটা আমার কাছে ঠিক মনে হতো না। গোলাম মোহাম্মদ ভাই। বাসায় যাওয়ার সময় বলতো, চলেন মল্লিক ভাই বাসায় যাবেন। আসলে আমার বাসায় যাওয়া দরকার ছিলো। আমি বছরে দু'একবার গিয়েছি, কোন কোন সময়ে দু'বছরের মধ্যে একবারও যাইনি। গোলাম মোহাম্মদ ভাই খুব আফসোস করতেন। সেই গোলাম মোহাম্মদ ভাইকে দেখলাম, শুয়ে আছেন, গম্ভীর, শুধু চোখ দিয়ে দু'টি ধারা বয়ে যাচ্ছে। আর গোলাম মোহাম্মদ ভাইয়ের পায়ের কাছে একেবারে দু'টো পা জড়িয়ে ধরে তার স্ত্রী শুয়ে আছে। এই দৃশ্য আমি সারা জীবন সইতে পারবো না। সম্ভবত গোলাম মোহাম্মদ ভাইয়ের বড় সমস্যা এবং আমি, দু'জন মিলে, তাকে অনেক অনুরোধ করলাম সম্ভবত ডা. রফিক ভাইও বলেছিলেন যে তুমি বাসায় চলে যাও, আমরা আছি। আমি মনে মনে চাচ্ছিলাম, বাসায় চলে যাক। কিন্তু তাকে কোনোক্রমেই রাজি করাতে পারলাম না। বাসায় যাবেই না। ইতিমধ্যে দায়িত্বশীল পর্যায়ে গুণ্ডু আজহার ভাই আসলেন। ঐ রাতে আর কেউ আসেননি। এটা হতে পারে, খবর সব জায়গায় যায়নি। আবার এটাও হতে পারে যে, হাসপাতালে গিয়েছে আজকেই দেখবো।

তৌহিদ বলেছিল, মল্লিক ভাই, আমাদের যতোগুলো হাসপাতাল আছে, গিয়েছিলাম। কোনো হাসপাতাল তাকে গ্রহণ করেনি। গোলাম মোহাম্মদ ভাইয়ের ব্যাপারে সমস্ত হাসপাতালকে অনুরোধ করি, আপনাদের পক্ষে যদি মূর্খ রুগীগুলোকে রিসিভ করা সম্ভব হয়, তাহলে রিসিভ করবেন। আর যদি রিসিভ করা সম্ভব না হয় তাহলে কেনো রিসিভ করা সম্ভব হচ্ছে না সেটা তাদেরকে বলবেন। অবশেষে ডা. রফিক ভাই গ্রহণ করেছেন। আমি রফিক ভাইকে কোনো দিন ভুলব না। হে রাক্বুল আলামিন তুমি চিরকাল রফিক ভাইকে মনে

রাখার তৌফিক দিও, রফিক ভাইয়ের জন্য চিরকাল যেনো দোয়া করি। কারণ আমার গোলাম মোহাম্মদ ভাইকে সর্বশেষে জায়গা দিয়েছিলেন ডা. রফিক ভাই। আমাদের চেষ্টা ব্যর্থ হলো। মহান রাব্বুল আলামীনের ডাকে সাড়া দিয়ে চলে গেলেন প্রিয় কবি গোলাম মোহাম্মদ ভাই।

সবসময় বলে এসেছি, আজও বলছি, কবি গোলাম মোহাম্মদ আশির দশকের শ্রেষ্ঠ কবি। কবি গোলাম মোহাম্মদকে শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধকার বলিনি, শ্রেষ্ঠ ছড়াকার বলিনি, কিংবা সাহিত্যের অন্যান্য অঙ্গনে তাকে শ্রেষ্ঠ বলিনি, শুধু বলেছি, কবি গোলাম মোহাম্মদ আশির দশকের শ্রেষ্ঠ কবি। আমাকে এ ব্যাপারে অনেকেই ভর্ৎসনা করেছে, বকেছেন, অনেক মুরব্বি বলেছেন, এ ধরনের চূড়ান্ত কথা না বলাই ভালো। কিন্তু আমি এই কথাটি বলেছি বুঝে-শুনে। আমারও তো একটি কথা বলার অধিকার আছে। আমি আমার মতো করে বলেছি। কেউ যদি এটা মানতে না চায় সে মানবে না। তার স্বাধীনতা আছে।

ফররুখ আহমদ ইসলামী আন্দোলনের সম্পদ। ফররুখ আহমদের যে পরিচিতি ইসলামী সাহিত্য সাংস্কৃতিক অঙ্গনের জন্যে সেই পরিচিতির তুলনা হয় না। ইসলামী সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সর্বোচ্চ গৌরব ফররুখ আহমদ। কিন্তু সাংগঠনিক দিক থেকে কবি গোলাম মোহাম্মদ এর আলাদা একটি বৈশিষ্ট্য আছে। সেই বৈশিষ্ট্য একদিন আমাদের সামনে উজ্জ্বল হবে।

কবি গোলাম মোহাম্মদ হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টির সুকান্ত যেমন। এদেশের ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের জন্যে সুকান্তের মতই কবি গোলাম মোহাম্মদ। কবি গোলাম মোহাম্মদ অমর হয়ে থাকবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকে শহীদ হিসেবে কবুল করেছেন বলে আমার মনে হয়। আমি মতিউর রহমান মল্লিক হারিয়ে যাবো। আমার মতো কতো বটতলার কবি আসবে, আবার চলে যাবে। আমরা বেঁচে থাকবো বলে মনে হয় না। আমরা কিছুই তো করতে পারিনি ইসলামী সাহিত্য-সংস্কৃতি আন্দোলনের জন্য। বেঁচে থাকার মতো আমরা কিছুই করতে পারিনি। এরকম অনেকেই হারিয়ে যাবে। জীবদ্দশায় মাতব্বরী কতোজনেই করে। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হলো মৃত্যুর পর কে বেঁচে থাকবে। আমি মনে করি, আশির দশকে সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে টিকে থাকবে গোলাম মোহাম্মদ।

কবি গোলাম মোহাম্মদ বাংলাদেশের সম্পদ। সে কেবল নিজেই কবি হিসেবে দেখতে চায়নি। সে চেয়েছে আল্লাহর বান্দা হিসেবে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করতে। আল্লাহর দ্বীনের জন্যে যথাযথভাবে কাজ করতে। শহীদ আবদুল মালেক ভাই যেমন শিক্ষা আন্দোলনের জন্যে, যুব আন্দোলনের জন্যে, ছাত্র আন্দোলনের জন্যে, সারা বিশ্বের অনুপ্রেরণা, কবি গোলাম মোহাম্মদ ভাইও একদিন সারাবিশ্বের সাহিত্য এবং সংস্কৃতির আন্দোলনের জন্যে অনুপ্রেরণা হয়ে

দাঁড়াবেন। আমি অক্ষর গুণে বিচার করেছি। শহীদ তিন অক্ষর, তিন আর চার সাত অক্ষর, মালেক তিন অক্ষর, সাত আর তিন দশ। অবিকল কবি গোলাম মোহাম্মদ পর্যন্ত ঐ একই দশ অক্ষর। কবি দুই, গোলাম তিন, মোহাম্মদ, মোহাম-মদ পাঁচ, পাঁচ আর তিন আট, আট আর দুই দশ। কবি গোলাম মোহাম্মদ পর্যন্ত দশটি অক্ষর, শহীদ আবদুল মালেক পর্যন্ত দশটি অক্ষর। আল্লাহ রাক্বুল আলামীন আমাদের এই দুই নেতাকে কবুল করুন।

অসংখ্য গান গোলাম মোহাম্মদ ভাই লিখেছিলেন, অসংখ্য কবিতা গোলাম মোহাম্মদ ভাই লিখেছেন। এই সবকিছু মিলিয়ে একটি রচনাবলী প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলা সাহিত্য পরিষদের মাধ্যমে কিংবা অন্য যেকোনো মাধ্যমেই যদি গোলাম মোহাম্মদ ভাইয়ের রচনাবলী প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশের সমস্ত মুসলমানদেরকে আমি অনুরোধ করলাম। তারা যেনো গোলাম মোহাম্মদ ভাইয়ের রচনাবলী ক্রয় করেন এবং গোলাম মোহাম্মদ ভাই গানের বিষয় আশ্রয় নিয়ে যে সব ক্যাসেট বেরিয়েছে সে সব ক্যাসেটও যেনো তারা সবাই কেনে। এটা আমার ব্যক্তিগত অনুরোধ। আমি কবি গোলাম মোহাম্মদের সবচেয়ে যে গানটি বেশি ভালোবাসি সেটি হলো-

“সেই সংগ্রামী মানুষের সারিতে
আমাকেও রাখিও রহমান
যারা কুরআনের আস্থানে নিভীক,
নির্ভয়ে সব করে দান ॥”

আর সাধারণ গানের মধ্যে “হলদে ডানার সেই পাখিটি” শ্রেষ্ঠ গান। সাতটির মতো কবিতার বই বেরিয়েছে।

কবি গোলাম মোহাম্মদ অনুপ্রেরণা, কবি গোলাম মোহাম্মদ চেতনা, কবি গোলাম মোহাম্মদ উদ্দীপনা, কবি গোলাম মোহাম্মদ উদাহরণ। সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক জগতের জন্যে কিভাবে নিজের প্রতিভাকে উজাড় করে দিতে হয় এবং সাহিত্য সংস্কৃতির জগতের জন্যে নিজের প্রতিভা উজাড় করার মধ্যে দিয়ে আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে কিভাবে ত্যাগ স্বীকার করতে হয় এর জ্বলন্ত নিদর্শন হলো কবি গোলাম মোহাম্মদ। আমি তার জ্ঞানাত কামনা করি। আল্লাহ যেনো কবি গোলাম মোহাম্মদের শূন্যতাকে পূর্ণ করে দেন। সারা বাংলাদেশে যেনো অসংখ্য কবি গোলাম মোহাম্মদের জন্ম হয়।

কিশোরকণ্ঠকে ধন্যবাদ, তারা কবি গোলাম মোহাম্মদ সম্পর্কে আমার কাছ থেকে জানতে চেয়েছে। আমি সুন্দর করে গুছিয়ে বলতে পারলাম না। আবার যদি কখনো সুযোগ হয় আরও অনেক কথা থেকে গেলো। বলারও ইচ্ছা থাকলো।

বাংলা সন : আমাদের ঐতিহ্য

[অগ্রদ্বিত]



প্রসঙ্গ কথা

‘বাংলা সন : আমাদের ঐতিহ্য’ কবির একটি গুরুত্বপূর্ণ পাতুলিপি। এতে ৭টি প্রবন্ধ রয়েছে। এই পাতুলিপির অধিকাংশ লেখা কবির জীবদ্দশায় বিভিন্ন ম্যাগাজিন, সাহিত্য সাময়িকী ও স্মারক-সংকলনে প্রকাশিত হয়। আর কিছু লেখা অপ্রকাশিত পাতুলিপি হিসেবে কবির ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ ছিল। সেগুলো এই পাতুলিপির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পাতুলিপিটির প্রচ্ছদ এঁকেছেন সাইফ আলি।

সূচিপত্র

বাংলা সন : আমাদের ঐতিহ্য/ ৩৪৯

সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক আশ্রাসন/ ৩৫৯

আমাদের সংস্কৃতি : গানের আনন্দে নাটকের ইচ্ছায়/ ৩৬৪

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণার পটভূমি: প্রকৃত ইতিহাসের সন্ধান/ ৩৭৬

কোরবানীর ঘটনা অভূতপূর্ব/ ৩৭৭

একটি সাংস্কৃতিক কর্মসূচি গ্রহণ করার আগে/ ৩৮০

কিশোরকণ্ঠ সাহিত্য পুরস্কার/ ৩৮২

বাংলা সন : আমাদের ঐতিহ্য

‘শব্দ সম্বলিতা’ বাংলা অভিধান সন বলতে বুঝিয়েছে- ১. সাল; বৎসর [আরবি]। ‘চলন্তিকা’ আধুনিক বঙ্গভাষার অভিধান বুঝিয়েছে- [আ] বৎসর। অদ্। সাল। চলন্তিকা আবার সালের অর্থ করেছে- [ফা] বৎসর।। বঙ্গান্দ, বাংলা সন [খ্রিস্টান্দ হইতে ৫৯৩ বা ৫৯৪ কম]।

‘ফ’ রহজ-ই-রক্বানী’ উর্দু-বাংলা অভিধানে বলা হয়েছে [সন্হ] সন; বৎসর, বর্ষ [আরবি]। অবশ্য সাল সম্পর্কে ‘ফ’রহজ-ই-রক্বানী ঐ বর্ষ বৎসর-ই অর্থ করেছে এবং বলেছে : শব্দটি ফারসী।

সন যে আরবি শব্দ এবং সাল যে ফারসী শব্দ এতে কোনো সন্দেহ নেই। ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী ‘শুভ নববর্ষ’ প্রবন্ধে লিখেছেন : ‘সন শব্দটি আরবি থেকে আগত, অর্থ : বর্ষ-বর্ষপঞ্জি-বৎসরের দিনক্ষণের বিবরণ।’

লেখক-গবেষক অধ্যাপক মুহম্মদ আবু তালিব ‘বাংলা সনের জন্মকথা’ গ্রন্থে লিখেছেন : ‘সন’ শব্দটি আরবি, অর্থ-বর্ষ, বর্ষপঞ্জি। সাল অর্থও বৎসর। শব্দটি ফারসী।’

সনের ইংরেজি ইয়্যার [Year]। একটি ইংরেজি অভিধানে ইয়্যারকে সৌরবর্ষ বলা হয়েছে এভাবে : The time occupied by one revolution, of the earth round the sun. ইংরেজিতে বর্ষপঞ্জি বলতে Year Book বোঝানো হয়েছে। কিন্তু পঞ্জিকা বলতে বোঝানো হয়েছে ক্যালিন্ডার [calendar]. The mode of adjusting the natural divisions of time অর্থাৎ কাল-গণনার পদ্ধতিকেও ক্যালিন্ডার বলা যায়।

ক্যালিভারের একটি আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। হবে না এই জন্যে যে, ক্যালিভারের জন্মকথা থেকে বেরিয়ে আসবে, বর্ষপঞ্জি প্রণয়নের আসল উদ্দেশ্য।

জে এ.ক্যুডন [J.A. Cudon] লিখেছেন : ইংরেজি calendar শব্দটি ল্যাটিন শব্দ calender থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। যা দিয়ে কোনো মাসের প্রথম দিন বা কোনো একটি নির্দিষ্ট দিন- যে দিন থেকে কোনো হিসেব শুরু হয় বোঝায়। অপর কথায় ল্যাটিন ভাষায় একে হিসেব-পুস্তিকাও বলা যায়। প্রকৃত অর্থে calendar বলতে বৎসরের সময় বিভাজিত ও নির্দেশিত ছককে বোঝায়। তেমনি কতোগুলো প্রধান ক্যালিভার হলো The Julian, The Gregorian, The Jewish, The Chinese, The French, Republican Ges Mohammedan এগুলো একটি বছরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন দিবস, উৎসব, ঘটনাবলী ইত্যাদি নির্দেশ করে।

অন্য এক প্রকার ক্যালিভার আছে, যাতে দিবসের বিভিন্ন সময়ের নির্দেশনা রয়েছে এবং এটা এক প্রকার প্রার্থনা পুস্তক বলে পরিচিত। মূলত রোমান-ক্যাথলিক পাদ্রীগণ এ পুস্তক ব্যবহার করতেন দৈনন্দিন ব্যবহারের সুবিধার্থে। পরে তাদের আশ্রম-সমূহে একেই দিনপঞ্জি হিসেবে নির্দিষ্ট করে। এসব প্রার্থনা-পুস্তক দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রথম প্রকাশিত হয় এবং অচিরেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ, বিশেষত ফ্রান্স ও নেদারল্যান্ডে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এগুলোর মধ্যে অতিপরিচিত একটি পুস্তক ডাক-ডি-বেরী [Duc-de-berry]-এর Tres Riches Heures যা পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রকাশিত হয়।

পঞ্চ ও ষষ্ঠদশ শতাব্দীর কোনো কোনো কবি তাঁদের কাব্যিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্যও এক প্রকার দিনপঞ্জিকা ব্যবহার করতেন। তবে এটা কোনো পুস্তক নয়, দেয়ালিকা-সদৃশ এক প্রকার চার্ট। এগুলোর মধ্যে ১৫৭৯ সালের কবি Spenser Admond-এর Shepherd's Calendar সর্বাধিক উল্লেখযোগ্যতার দাবী রাখে। এতে বছরের প্রতিটি মাসের জন্য আলাদা-আলাদা কলাম ছিলো-যা আধুনিক যুগের অন্যতম কবি Jhon Clare অনুকরণ করেছিলেন। নিবন্ধক সদৃশ আরেক প্রকার ক্যালিভার রয়েছে-যা ১৭৭৪ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। The newgate calendar হলো এ-ধরনের ক্যালিভারের মধ্যে একটি বিরল দৃষ্টান্ত। এই নিবন্ধক-সদৃশ-ক্যালেন্ডার- অর্থাৎ Register Calendar-এ ১৭৭০ থেকে শুরু করে ১৭৭৪ সাল পর্যন্ত সকল গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী নিবন্ধিত ছিলো। অন্যকথায় একে Dictionary of Incident's অর্থাৎ ঘটনাভিধানও বলা হয়েছে। ১৮২৬ সালে এর আরো একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

কৌতূহলবশত Nicholar Breton ১৬২৬ সালে পূর্বের প্রকাশিত বিভিন্ন ক্যালিভার থেকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী সংগ্রহ করে সংক্ষেপে The Fantasticks নামে নিবন্ধক-ক্যালেন্ডারের আরো একটি সংস্করণ বের করেন। এতে বছরের বিভিন্ন সময় ও মাসের পাশাপাশি ঋতুচক্রের দিক তুলে ধরা হয়েছিলো। এটা Almanac নামে বিভিন্ন সময়ে পুস্তকাকারে প্রকাশিতও হয়েছে। গ্রীক শব্দ আলমিনিকিয়েকা [Alminikhiaka] থেকে Almanac শব্দটির উৎপত্তি।

মূলত সময়ের পরিমাপের জন্যেই সন-গণনার প্রক্রিয়াকে মানুষ আবিষ্কার করেছে। আর সময়ের সূক্ষ্ম-পরিমাপের জন্যেই আবিষ্কৃত হয়েছে ক্যালিভার অর্থাৎ সময়-পঞ্জিকা। ‘সাল তারিখের ইতিহাস’ গ্রন্থে পলাশবরণ পাল লিখেছেন : ‘ভাষ্যতা এগিয়ে চললো। সমাজ যতো জটিল হলো, ততো বাড়তে থাকলো তার সমস্যাও। এই সব নানা সমস্যার সমাধানের জন্য বা সমাধানের অভ্যুত্থানে তৈরি হলো একটি শাসকতন্ত্র। প্রজাদের কাছ থেকে কবে কখন রাজনা আদায় করবে তারা, তা ঘোষণা করে দেওয়ার জন্যে তাদের দরকার হলো সময় পরিমাপের। ...নিবেদনের দিনক্ষণ ঠিক করার জন্যে... দরকার হলো সময়ের সূক্ষ্ম মাপের।’ সময়-পরিমাপের ক্ষেত্রে অথবা সন-গণনার ক্ষেত্রে আল-কোরানের আলোচনা যার-পর-নাই প্রণিধানযোগ্য। সূরা ইউনুসের ৫ নম্বর আয়াতে বলা হচ্ছে ‘তিনিই, সেই মহান সত্তা, যিনি বানিয়েছেন সূর্যকে উজ্জ্বল আলোকময়, চন্দ্রকে স্নিগ্ধ আলো বিতরণকারীরূপে এবং অতঃপর নির্ধারিত করেছেন এর জন্য মনযিসসমূহ। যাতে করে তোমরা চিনতে পার বছরগুলোর সংখ্যা ও হিসাব। আল্লাহ এই সমস্ত কিছু এমনিতেই সৃষ্টি করেননি, বরং সৃষ্টি করেছেন যথার্থতার সাথে। তিনি প্রকাশ করেন লক্ষণসমূহ সে সমস্ত লোকের জন্য যাদের জ্ঞান আছে।’ [অনুবাদ : মাওলানা মুহিউদ্দীন খান]

কাল-গণনা, সাল-গণনা উদ্দেশ্যহীন কোনো বিষয় নয়। আল-কোরানের দৃষ্টিতে, তার মধ্যেও রয়েছে কর্তব্যের দায়-ভার। সূরা আত-তাওবাহ’র ৩৬ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : ‘নিশ্চয়ই আল্লাহর বিধান ও গণনায় মাস বারটি, আসমানসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে। তন্মধ্যে চারটি সম্মানিত। এটিই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান। সুতরাং এর মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করো না। আর মুশরিকদের সাথে তোমরা যুদ্ধ করো সমবেতভাবে, যেমন তারাও তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে সমবেতভাবে। আর মনে রেখো, আল্লাহ মুত্তাকীনদের সাথে রয়েছেন এবং ৩৭ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : ‘এই মাস পিছিয়ে দেয়ার কাজ কেবল কুফুরীর মাত্রা বৃদ্ধি করে, যার ফলে কাকেরগণ গোমরাহীতে পতিত হয়। এরা হালাল করে নেয় এক-এক বছর এবং হারাম করে নেয় অন্য বছর, যাতে তারা গণনা

পূর্ণ করে নেয় আল্লাহর নিষিদ্ধ মাসগুলোর। অতঃপর হালাল করে নেয় আল্লাহর হারামকৃত মাসগুলোকে। তাদের মন্দ কাজগুলো তাদের জন্যে শোভনীয় করে দেয়া হলো। আর আল্লাহ কাকের সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না। [অনুবাদ : মাওলানা মুহিউদ্দীন খান]

উপর্যুক্ত আয়াত-দুটি কাল-গণনার সময়-সীমা চিহ্নিত করে এবং মন্দ কাজের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে। কোরান বলে : আসমান এবং জমিন সৃষ্টির দিন থেকেই শুরু হয়েছে মাস গণনা। কোরান আরো বলে : কাকেরদের জন্য মন্দ কাজগুলো শোভনীয় করে দেয়া হয়েছে। সুতরাং সময়-কাল উদ্ভাবনের বিষয়টি যেমন আল্লাহর এক অপার মহিমায় উদ্ভাসিত, তেমনি তা উদ্‌যাপনের ক্ষেত্রে তারই নির্দেশনা অগ্রগণ্য।

দুই.

সময় এবং সন-গণনার বিষয়টি কোরান ছাড়া অন্যান্য ধর্মগ্রন্থেও রয়েছে। বিভিন্ন জাতিও এ-বিষয়টির ওপর নানাবিধ কারণে নানাভাবে শুরুত্ব আরোপ করেছেন।

ব্যাবিলনীয়রা সন-গণনা শুরু করেছিলো চান্দ্রমাস এবং চান্দ্রসন দিয়ে। তাদের বারোটি মাসের নাম ছিলো : ১. নিসানু, ২. আইরু, ৩. সিমানু, ৪. দুজু, ৫. আবু, ৬. উলুলু, ৭. তাম্মুজু, ৮. আরাসাম্‌নু, ৯. কিসলিনু, ১০. তেবেতু, ১১. শাবাতু, ১২. আন্দারু।

খ্রিস্টপূর্ব প্রায় ১৭০০ বছর আগেকার এক শিলালিপি উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধার করা হয়েছে ব্যাবিলিন থেকে। তাতে হাম্মুরবির এক নির্দেশ উৎকীর্ণ রয়েছে। সশ্রুটি বলছেন : ‘এ-বছরটা একটু আগে শেষ হয়ে যাচ্ছে বলে যে মাসটা এখন শুরু হতে চলেছে তাকে দ্বিতীয় উলুলু মাস হিসেবে ধরতে হবে। তাম্মুজু মাসের ২৫শে ব্যাবিলনবাসীদের যে অর্ঘ্য দেয়ার কথা তা তারা দেবে, এই দ্বিতীয় উলুলু মাসের ২৫শে।

সময় ও সন-গণনায় ইহুদীরা সরাসরি ব্যাবিলনীয়দের অনুসরণ করেছে।

ইহুদীদের বারোমাসের নাম : ১. নিসানু, ২. ইয়ার, ৩. সিবান, ৪. তাম্মুজু, ৫. আব, ৬. এলুলু, ৭. তিশরি, ৮. হেশভান, ৯. কিস্লেভ, ১০. তেবেথ, ১১. শেবাত, ১২. আদার।

ইহুদীরা নববর্ষ পালন করে তিশরি মাসের পয়লা তারিখে। তিশরির দশ তারিখে ইহুদীদের পবিত্র উৎসব-ইয়ম্‌ কিস্কুর। কিন্তু দশ তারিখে যদি শুক্রবার অথবা সোমবার পড়ে যায়, তাহলে অবশ্য এ-উৎসব করা চলবে না-ইহুদী ধর্মের এটাই অনুশাসন।

চীনারা বারো বছরের চক্রের মাধ্যমে হিসেব করে তাদের সন-বছর। বিভিন্ন জন্তুর নামে তারা, আখ্যায়িত করে, চক্রের বছরগুলোকে। আখ্যায়িত করে- ইঁদুর, ষাঁড়, বাঘ, খরগোশ, ড্রাগন, সাপ, ঘোড়া, ভেড়া, বাঁদর, মোরগ, কুকুর এবং শুয়োরের নামে। এমনভাবে কোনো বছরের নাম দেয়- ‘ঘোড়ার বছর।’ আবার কোনো বছরকে ডাকে- ‘বাঘের বছর’ বলে।

চীনাদের নববর্ষ উদযাপিত হয় বিভিন্ন তারিখে। ১৯৮৫-তে হয়েছিলো ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৬-তে ৯ ফেব্রুয়ারি আবার ১৯৯০-তে উদযাপিত হয়েছিলো ২৭ জানুয়ারী। ১৯৯১-তে ১৫ ফেব্রুয়ারি।

যদিও ১৯১২ খ্রিস্টাব্দ থেকে গ্রেগরীয় বর্ষপঞ্জি সরকারীভাবেই চীনে চালু হয়েছে। তবুও এখানে উৎসবাদি পালিত হয় চান্দ্রসৌর বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী-যা আগেকার দিন ব্যবহার করতো তারা।

জুলীয় বর্ষপঞ্জির সংস্কারলব্ধ রূপই গ্রেগরীয় বর্ষপঞ্জি। এই বর্ষপঞ্জি সৌর অবশ্য। তাই তার মাস-তারিখ দেখে বলা যায়-শীতকাল নাকি গ্রীষ্মকাল।

গ্রেগরীয় বর্ষপঞ্জিকেই ভুল করে বলা হয়-ইংরেজি বর্ষপঞ্জি।

খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতক। রোমের কর্তৃত্বে পালাবদল ঘটে গেছে। সীজারদের দিন শেষ। রোমের হর্তাকর্তা এখন পোপ। পোপ চতুর্থ সিক্সটাস [১৪৭১-১৪৮৪]। বর্ষপঞ্জি সংস্কারের আর্জি পেশ করা হলো তাঁরই দরবারে। মঞ্জুর করা হলো আর্জি।

দ্বিতীয় দফা সংস্কার করা হলো ১৫৮২ সালে, পোপ ত্রয়োদশ গ্রেগরীর সময়ে। সিজারের নিয়ম অনুসারে সন-গণনা, ১৪-৮৩ বছরে ১১দিন বেড়ে যায়, তাই তিনি ১৫৮২ সালের হিসেব থেকে ১০ দিন বাদ দেন এবং বর্ষপঞ্জিকা সংশোধন করেন।

ইতালি, ফ্রান্স, পর্তুগাল, স্পেন এবং অন্য যেসব দেশে ক্যাথলিক ধর্ম ছিলো রাজধর্ম-অবিলম্বে সেই সব দেশে গ্রেগরীয় সংস্কারলব্ধ বর্ষপঞ্জি চালু হয়ে গেলো। ১৫৮৩-তে চালু হলো সুইজারল্যান্ডে, নেদারল্যান্ডে। ১৯৮৪-তে জার্মানীর ক্যাথলিকরাও গ্রহণ করলো এ-পদ্ধতি। সন্দেহের মধ্যে পড়ে গেলো প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টানরা। শেষ পর্যন্ত তারাও গ্রেগরীয় গণনা-পদ্ধতি গ্রহণ করলো ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে। তারা অর্থাৎ জার্মানীর প্রোটেস্ট্যান্টরা। ইংরেজরা গ্রহণ করলো ১৭০ বছর পরে। যেটাকে চলতি কথায় ‘ইংরেজি ক্যালেন্ডার’ বলা হয়ে থাকে। মূলত যা গ্রেগরীয় ক্যালেন্ডার। ১৭৫২ খ্রিস্টাব্দে। এই গণনাপদ্ধতি জাপান গ্রহণ করে ১৮৭৩-এ, চীন ১৯১২-তে, বুলগেরিয়া ১৯১৬-তে, রুমানিয়া ১৯২৩-২৪ নাগাদ এবং গ্রীসও। তুরস্ক গ্রহণ করে ১৯২৭-এ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পেয়েছে ইংল্যান্ডের কাছ থেকে। এই উপমহাদেশেও ইংল্যান্ডের মাধ্যমে।

খ্রিস্টীয় ১২ মাসের নাম : ১. জানুয়ারি-রোমান-দেবতা জানুস-এর নামে। ২. ফেব্রুয়ারি- জুনো রোমান দেবীর নামে। ৩. মার্চ-রোমানদের যুদ্ধ-দেবতা মার্স-এর নামে। ৪. এপ্রিল-ল্যাটিন শব্দ। এপ্রিও। প্রস্তুতি হওয়া। ৫. মে-মেইয়াস। এপ্রিও। প্রস্তুতি হওয়া। ৬. জুন-রোমানদেবীর নামে। জুনোর অন্য নাম ফেব্রুয়ারা। ৭. জুলাই-সম্রাট জুলিয়াস সিজারের নামে। ৮. আগস্ট-সম্রাট আগস্টাস সিজারের নামে। ৯. সেপ্টেম্বর-ল্যাটিন শব্দ সেপ্তেম থেকে। অর্থ-৭। ১০ অক্টোবর-অক্টো-৮। ১১. নভেম্বর-নভেম-৯। ১২. ডিসেম্বর- ডেকেম-১০।

একদা জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ছিলো-প্রথম পর্যায়ে-মাস-গণনার হিসেবে যথাক্রমে একাদশ এবং দ্বাদশ মাস। পরে, অর্থগত ধারাক্রম অদল-বদল হয়ে গেছে এবং এমনটি হয়েছে, দেব-দেবীর নামকে সম্ভবত অগ্রাধিকার দেবার জন্যে।

ফরাসী বিপ্লবের পরপরই বর্ষপঞ্জি সংস্কারের একটি উদ্যোগ আমরা লক্ষ্য করি। এই উদ্যোগ গ্রহণ করলেন ঐ বিপ্লবের নেতাকরাই। সপ্তাহ-গণনা পদ্ধতিও তারা মানতে চাইলেন না। তারা ধরে নিলেন ধর্মীয় অনুশাসন থেকেই এসেছে এই সাত দিনের চক্র প্রক্রিয়া। অতএব নতুন একটা চক্রের অত্যন্ত প্রয়োজন।

বিপ্লবী সরকার মাপজোকের ব্যাপারেও নতুন পদ্ধতি চালু করার প্রয়াস চালিয়ে ছিলেন। বর্তমানে আমরা যে গ্রাম-কিলোগ্রাম অথবা মিটার-কিলোমিটার ব্যবহার করি, তা ঐ বিপ্লবেরই গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

বিপ্লবী সরকার সপ্তাহের পরিবর্তে চালু করলেন দশদিনের চক্র। তিনটি দশচক্রে হবে মাস। বছর হবে ৩৬০ দিনে। বাড়তি ৫দিন হবে [চক্র বহির্ভুক্ত] ছুটির দিন। অধিবর্ষের এই বাড়তি দিনের সংখ্যা হবে ৫ থেকে বেড়ে ছয়। দশ-চক্রের প্রতিটি দিনের আলাদা নাম দেয়া হলো। আসলে এমনটি করতে হলো রবিবার অর্থাৎ ফরাসী ভাষায় যাকে 'দিমর্শ' বলে, সেই দিমর্শ নাম বাদ দেয়ার জন্যে। দিমর্শ মানে হচ্ছে প্রভুর দিন। ধর্মবিরোধী বিপ্লবী সরকার প্রভুর দিন পাল্টাতে উদ্যোগী হয়ে, পাণ্ডিত্যে ফেললেন পুরো সপ্তাহ। সুতরাং দশচক্রের নাম করলেন তারা সংখ্যার সম্বোধনে। যেমন : প্রথম [প্রমিদি], দ্বিতীয় [দুয়োদি] ইত্যাদি প্রক্রিয়ায়।

বারো মাসের নামেও তারা বিপ্লব আনলেন।

তা এই ধরনের :

১. উন্ডেমিয়েব্- আঙুর তোলা মাস।
২. ক্রমের- কুয়াশার মাস।
৩. ফ্রিমের- শিশিরের মাস।

৪. নিভোজ- তুষারের মাস ।
৫. পুভিয়োজ- বাদলের মাস ।
৬. ভঁতোজ- বাতাসের মাস ।
৭. ঝে মিনাল- মুকুলের মাস ।
৮. ফ্লোরিয়াল- কুসুমের মাস ।
৯. প্রেরিয়াল- প্রাক্তরের মাস ।
১০. মেসিদোর- ফসল কাটার মাস ।
১১. থের্মিদোর- উত্তাপের মাস ।
১২. ফ্রুজ্জিদোর- ফলের মাস ।

এই বর্ষপঞ্জি ফরাসী দেশের বাইরে তো চললোই না, কারণ ফরাসী দেশে যখন বাদলের মাস, তখন অন্যদেশে হয়তো কাঠফাটা রদ্বুরের মাস, ফরাসী দেশের ভেতরেও চললো না, কেননা ক্ষমতায় এলেন নেপোলিয়ন, ফিরে এলো ভাটিকানের অনুশাসন, সাথে সাথেই ফিরে এলো খ্রৈগরীর বর্ষপঞ্জি ।

‘সাল তারিখের ইতিহাস’ গ্রন্থে মুসলমানদের বর্ষপঞ্জি সম্পর্কে একটা ধারণা দিতে গিয়ে পলাশবরণ পাল বলেছেন : ‘বারোটি চান্দ্রমাসের তুলনায় সৌরবছর বেশ খানিকটা লম্বা । চাঁদের খোলা চোখে দেখা সহজ বলে চান্দ্রমাস দিয়েই হিসেব শুরু করেছিলো বেশির ভাগ সভ্যতার মানুষ । তারপর সেই হিসেবকে সৌরবছরের সাথে মেলাতে গিয়েইতো বিপত্তি । এক-এক সভ্যতায় এই মেলবন্ধনের কাজ করা হয়েছে একেকভাবে, তাতেই গড়ে উঠেছে আজকের পৃথিবীর ক্যালেন্ডার ।

একটি মাত্র ক্যালেন্ডারই শুধু আপসহীনভাবে রেখে গেছে তাদের চান্দ্রবছরের হিসেব, সৌরবছরের সাথে সে হিসেবকে মেলাবার কোনো চেষ্টাই করেনি । এই ক্যালেন্ডারটি হলো মুসলমানদের ক্যালেন্ডার ।

অধ্যাপক মুহম্মদ আবু তালিব বলেছেন : ‘হিজরী সনের নামকরণের বেলায় দেখা যাচ্ছে, সেখানে আধ্যাত্মবাদী চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটেছে । বাংলা ও ইংরেজী উভয় সনেই পৌত্তলিকতাসুলভ মনোভঙ্গী প্রতিফলিত, শুধু হিজরী সনে তার প্রতিফলন নেই । হিজরী সন ছিলো তৎকালীন নবজাগ্রত একেশ্বরবাদী মানব-গোষ্ঠীর ধ্যানধারণাসিদ্ধ নবতর সংস্কৃতির বাহন, তাই প্রাচীন পৌত্তলিক ধ্যান-ধারণামুক্ত হিজরী সন ছিলো সমকালীন সকল সন থেকেই বিশিষ্ট । এই হিজরী সনের উপর ভিত্তি করে রচিত বলে বাংলা সনও সমকালীন সনের ইতিহাসে বিশেষত্বব্যঞ্জক হয়ে উঠেছিলো ।

তিন.

বাংলা সন যে হিজরী সন থেকে শুরু হয়েছে, এ-ব্যাপারে সন্দেহের কিছু নেই। তবে পার্থক্য এতটুকু যে, বাংলা সনের গোড়ার দিকটা অর্থাৎ ৯৬৩ বছর পর্যন্ত হিজরীর সঙ্গে এক এবং শেষের দিকটা চান্দ্র সন থেকে সৌর সনে রূপান্তরিত হয়েছে।

সম্রাট আকবরের রাজত্বকালেই বাংলা সনের জন্ম। ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে। ৯৯২ হিজরীতে। সম্রাট আকবরের নির্দেশে, প্রচলিত হিজরী সনের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে, মহাপণ্ডিত এবং জ্যোতিষী ফতেহ উল্লাহ সিরাজী এই সনের উদ্ভাবন করেন।

ফতেহ উল্লাহ সিরাজীর বিদ্যাবত্তা সম্পর্কে সমকালীন ইতিহাসবিদ আবুল ফজল বলেছেন : ‘যদি এমন দুর্ঘটনা কোনোদিন ঘটে, দেশের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি বিনষ্ট হয়, আর শিরাজী সাহেব জীবিত থাকেন, তা’হলে একা তিনিই তার পুনর্গঠন করতে সক্ষম হবেন।’

এই প্রাজ্ঞপণ্ডিতের গবেষণায় ‘ইলাহী সন’ ছাড়াও আরো কতিপয় সৌরসন উদ্ভাবিত হয়।

‘সাল তারিখের ইতিহাস’ গ্রন্থে বলা হয়েছে : ‘আকবর শাহ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে। হিজরী সাল তখন ৯৬৩। রাজত্বের উনতিরিশ বছর পার যখন হয়েছে, তখন হিজরী ক্যালেন্ডারের কিছু দুর্বলতার বিষয় নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করেন আকবর। হিজরী ক্যালেন্ডার আগাগোড়া চান্দ্র, তা আমরা আগেই বলেছি। প্রজাকুলের অধিকাংশই কৃষিজীবী, তাদের খাজনা আদায় করতে হয় ফসল ঘরে ওঠার ঠিক পরেই। ফসল ওঠার সময় নির্ধারিত হয় ঋতুচক্রের দ্বারা, তার সঙ্গে চাঁদের কোনো সম্পর্ক নেই, সম্পর্ক সূর্যের। চান্দ্র ক্যালেন্ডারে এই ফসল কাটার সময় বছরের একই মাসে আসে না, সরে সরে যায়। তাই অসুবিধে হয় খাজনা আদায়ের নির্দেশ দিতে। এইজন্য আকবর ঠিক করেন, একটি সৌরক্যালেন্ডার চালু করবেন- তাহলে সেই ক্যালেন্ডারের অমুক মাসের অমুক সময় খাজনা নেওয়া হবে এ রকম একটা ঘোষণা করে দেওয়া যাবে। সৌরপঞ্জিকা তখন ভারতের কোনো কোনো জায়গায় হিন্দুদের মধ্যে চালু ছিলো। আকবর তাই বিধান দেন, তাঁর সিংহাসনে আরোহণের বছর, অর্থাৎ ৯৬৩ হিজরী সন থেকে সৌরমতে সব তারিখ হিসেব করতে হবে। এই হিসেবে বাংলায় যে সন চালু হলো, তা বঙ্গাব্দ। উড়িষ্যায় একই কারণে একই সময়ে চালু হলো আমলী সাল। ভারতের অন্য কোথাও-কোথাও এর নাম হলো ফসলী সন।

‘বাংলা নববর্ষ : প্রেক্ষাপট’ প্রবন্ধে ড. কাজী দীন মুহম্মদ বাংলা সনের জন্য প্রসঙ্গে বলেছেন : ‘জন্মের বছরই বঙ্গাব্দের বয়স ৯৬৩ বছর। তাই হিজরী সনের জাতক বাংলা ৯৬৩ বছর পরে জন্ম নিয়েও গণনায় উভয়ে একই সাথে এগিয়ে চলেছে। চন্দ্রের হিসেবে হিজরী সন প্রতিবছর প্রায় দশ দিন এগিয়ে যায় বলে প্রতি ৩৬ বছরে গণনায় এক বছর বেশী এগিয়ে যায়। আর সৌর-সন-বঙ্গাব্দের বর্ষসংখ্যা সে পরিমাণে কমে যায়। সে হিসেবে বর্তমান হিজরী ১৪১৩ সন হওয়া সত্ত্বেও সৌরসন-বঙ্গাব্দ ১৪০০।’ [দৈনিক ইনকিলাব : শুক্রবার ২৫শে চৈত্র ১৪০০]। ‘বাংলা সন ও তার ঐতিহ্যানুসন্ধান’ প্রবন্ধে শায়মসুজ্জামান খান লিখেছেন : ‘প্রথমত হিজরী সন ও সপ্তাটের [আকবর] সিংহাসন আরোহণের বছরকে যুক্ত করে এ সন প্রবর্তিত। হিজরী সনের সঙ্গে এ সনের পার্থক্য হলো : হিজরী চান্দ্র সন, বাংলা সৌর সন। হিজরী সনের ইসলামী ঐতিহ্যের সঙ্গে ভারতীয় সৌর সনের বৈজ্ঞানিকতা এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। চান্দ্র সনে দিন-তারিখে পার্থক্য হয়ে যায় চাঁদ দেখে গুনার ফলে।’

বাংলা সনকে যুগ-উপযোগী করার জন্যে এবং আরো সংশোধিত করার জন্যে, পাকিস্তান আমলে, বাংলা একাডেমী একটি উদ্যোগ গ্রহণ করে। এই উদ্যোগের ফলে, বাংলা সনের বিভিন্ন মাসের তারিখ নির্ধারণকল্পে ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের ১৭ ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমীতেই বাংলা পঞ্জিকা সংস্কার উপসংঘের শেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। এই বৈঠক বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যা বাংলা সন চালুর ব্যাপারে বহুবিধ সমস্যা দূরীভূত করার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরামর্শ রাখে। এ-প্রসঙ্গে অধ্যাপক মুহম্মদ আবু তালিব বলেন : ‘পঞ্জিকা সংস্কার উপসংঘ গঠিত হবার সময় বাংলা একাডেমীর পরিচালক ছিলেন সৈয়দ আলী আহসান; উপসংঘের সুপারিশ পেশকালে পরিচালক ছিলেন ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ। অতঃপর ১৩৭৭ সালে বাংলা একাডেমীর ‘রোজনামাচা’ প্রকাশিত হয় [১৯৭০]। এই সময় একাডেমীর পরিচালক ছিলেন জনাব কবীর চৌধুরী। তারপর বাংলাদেশের মুক্তি তথা স্বাধীনতা আন্দোলন চলার পর থেকে বর্তমান কাল অবধি এই বর্ষপঞ্জি প্রকাশের উদ্যোগ আর নেওয়া হয়নি।’

উপর্যুক্ত আলোচনা প্রকাশিত দেখি, ১৩৯৯ সনের [১৯৯৩] ‘বাংলা সনের জন্মকথা’ গ্রন্থের পরিশিষ্টে। এখন ১৪০৪ সন। সর্বমুঠে বাংলা সন চালুর ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত কি হয়েছে তা জাতির কাছে অস্পষ্ট। এই অস্পষ্টতা কেনো? এবং কতো দিনের জন্যে তা কেউ বলতে পারে না।

চার.

বাংলা বর্ষপঞ্জি অঙ্গীভূত হতে পারেনি এখনো আমাদের জাতীয় জীবনে। শুধু কিছু সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে বাংলা সন-তারিখের ব্যবহার আজো আমরা লক্ষ্য করি। মূলত এই অবস্থার জন্যে ইংরেজদের রাজত্ব, তাঁদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির অনাকাঙ্ক্ষিত ও অব্যাহত আধিপত্যই দায়ী। সেই সঙ্গে দায়ী আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি উদাসীনতা।

পরিমার্জিত সংস্কৃতি উদযাপনের মধ্যে অন্তর্নিহিত রয়েছে বর্ণাঢ্য ‘ঐতিহ্য’। আজকের সংস্কৃতিই আগামী দিনের ঐতিহ্য। সুতরাং আমরা যেমন অতীতের ঐতিহ্য স্বনির্ভর করবো, তেমনি অনাগত দিনের ঐতিহ্য সৃষ্টির জন্য সতর্ক থাকবো, আমাদের সংস্কৃতিচর্চার প্রতি বাহনকে কাজে লাগাবার ক্ষেত্রে।

ঐতিহ্য সংস্কৃতিরই একটি কঠোর ও কমনীয় বাহন। Dictionary of literary terms and literary theory ঐতিহ্য পরিচিতি উপস্থাপন করেছে এভাবে : ‘ঐতিহ্য মূলত সেই পূর্বজন্মকে বোঝায়, যা একজন লেখকের সামনে সর্বদা সমুপস্থিত এই অর্থে যে, সে সেই অতীতকে অধ্যয়ন করতে পারে এবং তা থেকে সে কিছু শিখতে পারে। এভাবে একজন লেখকের নিজস্ব ভাষা-সাহিত্য আঙ্গিক-সঙ্কেত-কৌশল-রীতি-নীতি-বিভিন্ন সংস্কৃতি আহরিত হয়ে যায় সেই অতীত থেকে।’

ঐতিহ্যের ঐ ব্যাখ্যা যদিও সাহিত্য-পক্ষপাতী তবু তা সবারই পাঠ্য। সুতরাং আমাদের অন্যতম বাহন-নববর্ষের উদযাপনও হবে ঠিক সেইভাবে, যেভাবে উদযাপন করলে তা হবে প্রতিটি নাগরিকের জন্যে অনিবার্যভাবে পাঠ ও পঠনীয়।

সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক আত্মসন

সংস্কৃতি মানুষের সমান বয়সী তো বটেই এবং পবিত্রও। মানুষের জীবনচর্চার একেবারে প্রারম্ভেই উদ্ভাসিত হয়েছে সংস্কৃতির প্রথম উন্নয়ন এবং সেই উৎকর্ষ সংঘটিত হয়েছে পবিত্রতম জ্ঞানাতের ভেতর দেশে বলেই তার প্রথম অভিযাত্রা অবশ্যই পবিত্র।

সংস্কৃতি মানুষের প্রাণ স্পন্দনের মতোই এক অপরিহার্য অস্তিত্ব। প্রাণ স্পন্দন না থাকলে যেমন একটি দেহের কোনো মূল্য থাকে না, তেমনি কোনো জাতির সংস্কৃতি না থাকলে সেই জাতিও একটি প্রাণহীন জাতি ছাড়া আর কিছুই নয়।

প্রতিটি মর্যাদাবান জাতিরই নিজস্ব সংস্কৃতি আছে। যে-জাতির তা নেই সে-জাতি সন্দেহাতীতভাবেই পরাধীন, সন্দেহাতীতভাবেই মর্যাদাহীন এবং অনিবার্যভাবেই পরিচয়হীন।

দুই.

সংস্কৃতি শব্দের অর্থ: সংস্কার, শোধন, পরিষ্করণ, সংজ্ঞা, উৎকর্ষ সাধন, সংশোধন, মেরামত, মার্জনা, পরিশীলন, অনুশীলন, সভ্যতা, ভদ্রতা, শিষ্টতা, শুদ্ধি। শিক্ষা অথবা চর্চা দ্বারা লব্ধ বিদ্যা বুদ্ধি শিল্পকলা রুচি নীতি। মানব সমাজের মানসিক বিকাশের প্রমাণ। একটি জাতির মানসিক বিকাশের অবস্থা। কোনো জাতির বৈশিষ্ট্যসূচক শিল্প-সাহিত্য, বিশ্বাস-সমাজনীতি ইত্যাদি।

আরবি শব্দ 'তমদ্দুনে'র অনুবাদ করলে দাঁড়ায় সামাজিক জীবন, সামাজিকতা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি। এবং ইংরেজী শব্দ Culture অনুবাদ করলে দাঁড়ায় কর্ষণ, কৃষ্টি, সংস্কৃতি।

কখনো কখনো সংস্কৃতি শব্দের বিকল্প হিসেবে চিত্তপ্রকর্ষ, চিন্তাপ্রকর্ষ, চিন্তোৎকর্ষ, মনঃপ্রকর্ষ, উৎকৃষ্টি, প্রকৃষ্টি, সমুৎকর্ষ ও ব্যবহার করেছেন কেউ কেউ।

‘শেষের কবিতা’য় (১৯২৯) রবীন্দ্রনাথ ‘কালচার’ শব্দই ব্যবহার করেছেন। ‘কালচার’, ‘ওরিয়েন্টাল কালচার’ কাজী নজরুল ইসলাম বহুবার, বহুভাবে ব্যবহার করেছেন। আবুল মনসুর আহমদ-ও ‘কালচার’ শব্দ ব্যবহার করেছেন। তাঁর একটি বিখ্যাত গ্রন্থের নাম ‘বাংলাদেশের কালচার’।

তিন.

বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে বিশিষ্ট সমাজ বিজ্ঞানী ও নৃতত্ত্ববিদ A. L. Kroeber Clyde Kluckhohn যখন সংস্কৃতির স্বরূপ নিয়ে গবেষণা শুরু করেন, তখন সারা পৃথিবীর সংস্কৃতির সংজ্ঞাসমূহের একত্রিকরণ তাঁদের অন্যতম প্রয়াসে পরিণত হয়। ১৯৫২ সালে তাঁদের এই গবেষণাকর্ম Cultural : A Critical Review of concepts and Definitions নামে প্রকাশিত হলে তাতে সংস্কৃতির ১৬৪টি সংজ্ঞা লিপিবদ্ধ পাওয়া যায়। পরবর্তী দশকগুলোতে নিশ্চয়ই আরো বিপুল সংখ্যক সংজ্ঞা যুক্ত হয়েছে এর সঙ্গে। তাছাড়া পৃথিবীর নানান ভাষায়ও এ-ব্যাপারে গবেষণার কাজ এগিয়ে গেছে।

ইউনেস্কোর একটি পরিচিতিমূলক দলীলে বলা হয়েছে :

আমরা যেমন তেমন করে যা আমাদের গড়ে তুলেছে তাই সংস্কৃতি। সংস্কৃতি আমাদের বর্তমান ও অতীতের মাঝে যোগসূত্রের রূপরেখা। এটি একটি জনসমষ্টির স্বকীয় পরিচয় দেয় এবং একই সঙ্গে অবশিষ্ট বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে। পাশ্চাত্য দার্শনিকদের অনেকেই সংস্কৃতিকে একটি Complex, জটিল এবং মনোবিকৃতির বিষয় বলে মনে করেছেন। E.B. Taylor তাঁদের একজন। তিনি তার Primitive culture গ্রন্থে লিখেছেন।

Culture is that complex whole which includes knowledge, belief art in moral law custom and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society.

অর্থাৎ সমাজের সদস্যরূপে অর্জিত আচার, আচরণ, ব্যবহার, জ্ঞান, বিশ্বাস, শিল্পকলা, নীতি, প্রথা, আইন ইত্যাদির জটিল সমাবেশই হলো সংস্কৃতি।

আমরা আমাদের কাছে প্রশ্ন রাখতে পারি আমাদেরই পরিচয় সম্পর্কে; এ-প্রশ্ন অন্য কেউও রাখতে পারে। এখন এই প্রশ্নের উত্তরে আমি তুলে ধরতে পারি আমার স্বরূপ, আমার প্রকৃত আমাকে। ম্যাকাইভার বলেছেন :

আমরা যা তা-ই আমাদের সংস্কৃতি। আর আমাদের যা আছে তা-ই সভ্যতা।
ইলয়টের ভাষায় : Way of life-ই সংস্কৃতি। এইচ. জে. লাক্সি বলেছেন :
Culture is that what we are!

সংস্কৃতি সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত তাৎপর্যপূর্ণ এবং সর্বাধুনিক কথা বলেছেন ড.
আলীয়া আলী ইজেতবেগোভিচ :

ক. সংস্কৃতি তার ধর্ম, নীতি ও দর্শনসহযোগে মানুষ ও মানুষের আদি উৎস
পারমার্থিক জগতের পারম্পরিক সম্পর্কে উচ্চকিত করে।

খ. সংস্কৃতি হলো মানুষের ওপর ধর্মের কিংবা মানুষের উপর স্বয়ং মানুষেরই
প্রভাবের ফলশ্রুতি।

গ. সংস্কৃতি হলো মানুষ হয়ে গড়ে ওঠার আর্ট।

ঘ. সংস্কৃতি হলো অনবরত নিজেকে সৃষ্টি করা।

ঙ. ধর্মাচরণ, নাটক, কবিতা, খেলাধুলা, লোকজ সংস্কার, লোককথা, পুরাণগাঁথা,
নৈতিক ও নন্দনতত্ত্বীয় ব্যবস্থা, দর্শন, থিয়েটার, গ্যালারী, যাদুঘর, গ্রন্থাগার,
রাজনীতি ও বিচার ব্যবস্থা যা মানুষের ব্যক্তিত্বের মূল্য ও তার স্বাধীনতাকে
স্বীকার ও শ্রদ্ধা করে- এগুলোই মানব সংস্কৃতির অখণ্ড ধারাচিত্র। এ হল 'এক
প্রজ্জ্বলিত আলোক শিখার সাহায্যে গাঢ় অন্ধকার ভেঙে ভেঙে অনতিক্রম্য
সেই পবিত্র পর্বতে মানুষের আরোহণ প্রচেষ্টার ছবি।

চ. সংস্কৃতি হলো মানবিক স্বাধীনতারই নির্বাচন ও প্রকাশন।

ছ. প্রতিটি সংস্কৃতি তার ধর্মীয় প্রকৃতির কারণে মানুষের চাহিদা ও যোগানের
পরিমাণকে হ্রাস করতে চায়। সে চায় মানুষের অন্তর্গত স্বাধীনতার সুরকে
জোরালো করতে।

জ. সংস্কৃতির বাহক মানুষ, সভ্যতার বাহক সমাজ। সংস্কৃতির অর্থ সহজাতবোধের
পরিচর্যার মাধ্যমে আত্মশক্তি অর্জন। সভ্যতার সংযোগ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি,
নগরী ও রাষ্ট্রের সাথে- এর মাধ্যম হলো চিন্তা, ভাষা ও লেখনী।

ঝ. সংস্কৃতি মানুষকে আলোকিত করে।

ঞ. আমরা কেনো এ-সংসারে বেঁচে আছি এ- প্রশ্ন সংস্কৃতির, আমরা কিভাবে
বেঁচে আছি এ-প্রশ্ন সভ্যতার। একটা জীবনের অর্থ সম্পর্কিত, অপরটি
জীবনযাপনের প্রশালী সম্পর্কিত।

ট. যে কোনো সংস্কৃতির কেন্দ্রীয় বিষয় হলো মানুষ, ব্যক্তি হিসেবে, ব্যক্তিত্ব
হিসেবে।

ঠ. সকল সংস্কৃতি মানুষেরই লালিত সন্তান।

চার.

সংস্কৃতির গুরুত্ব অনুধাবন করা যায় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মানুষ ও মনীষা মরিয়ম জামিলার ভাবনা থেকে। তিনি তাঁর একটি গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন : বিদেশী রাজনৈতিক শাসনের চেয়ে সাংস্কৃতিক অধীনতা অনেক বেশী ক্ষতিকর। লর্ড ক্রোমার [Loard cromer] যিনি ২৫ বছর পর্যন্ত মিসর শাসন করেছিলেন। এই বৃটিশ শাসক Modern Egypt নামে একটি গ্রন্থও রচনা করেছিলেন। তাতে একটি ভয়াবহ চিত্র আছে এই রকম : রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের চাইতে সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্য বিস্তারের নীতিই গুরুত্বপূর্ণ। সংস্কৃতিগত অসর্তকতা আমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে বারবার। এই ব্যাপারে মৌলিক কথা বলেছেন এক বিশ্ববরণ্য পণ্ডিত ইবনে খালদুন। যা গভীর অর্থবোধক বিষয় এ-সময় ও আগামী-সময়ের জন্যেও। প্রতিটি দেশই তার বৃহৎ প্রতিবেশীর অনুকরণের চেষ্টা করে থাকে। স্পেনের মুসলমানরা একদা অনুকরণ করেছিলো প্রতিবেশী বিজয়ী খ্রিস্টানদের পোশাক, অলঙ্কার, আচার, আচরণ এমন কি ঘরে ছবি রাখার ব্যাপারেও মুসলমানরা খ্রিস্টানদের অনুসরণ করেছিলো এ-এক স্পষ্ট হীনমন্যতা ছাড়া আর কিছু নয়।

পাঁচ.

সাংস্কৃতিক আত্মাসন হচ্ছে এমন এক ভয়াবহ রণকৌশল-যার মাধ্যমে অন্য একটি জাতির অস্তিত্বকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেয়া সম্ভব। অথচ রক্তপাতের প্রশ্ন উঠবে না, জবর দখলের প্রশ্ন উঠবে না, প্রয়োজন পড়বে না মুখোমুখি লড়াইয়ের।

আধুনিক সংস্কৃতিবিশেষজ্ঞদের ভাষায় :

ক. এ-হচ্ছে A victory without war.

খ. সাংস্কৃতিক আত্মাসন হচ্ছে বর্তমান বিশ্বে আধিপত্যবাদের এক নতুন রণকৌশল।

গ. অন্যের দেশ দখলের এমন মাধ্যম যার প্রতিরোধে কেউ এগিয়ে আসে না।

ঘ. এ-আত্মাসনের দৃশ্যটি সাধারণত চোখে পড়ে না। এই ব্যাপারে আবুল মনসুর আহমদ বলেছেন : রাজনৈতিক আত্মাসনের চাইতে সাংস্কৃতিক আত্মাসন অধিক মারাত্মক কারণ রাজনৈতিক আত্মাসন সাধারণ চোখে ধরা যায় সাংস্কৃতিক আত্মাসনের বেলায় তা সম্ভব নয়। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সাংস্কৃতি আত্মাসন চালায় নানাভাবে, নানান কৌশলে। তবে প্রধানত তিনটি বিষয়ের প্রতি তাদের থাকে কড়া নজর : তারা-

১. ঐতিহ্য সংরক্ষণের সমস্ত মাধ্যমই ধ্বংস করে দেয়। সেই সঙ্গে যথার্থ মানুষ গড়ার আঙ্গিনাগুলোকে অকার্যকর করার ক্ষেত্রে কঠোর ভূমিকা পালন করে।
২. মানুষকে একান্তভাবে স্বার্থপর করার জন্যে নিছক বস্তুবাদী বানাবার, সব রকমের ষড়যন্ত্র চালাতে আদৌ কার্পণ্য করে না এবং প্রয়োজনীয় আধ্যাত্মবাদ থেকে দূরে রাখার সব আয়োজনই সম্পন্ন করে।
৩. ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টির জন্যে সর্বাধুনিক কলাকৌশল অবলম্বনে চাতুর্যের আশ্রয় নেয়। কখনো সরাসরি আক্রমণও করে বসে।

ছয়.

সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সাংস্কৃতিক আত্মাসনের জন্যে সুস্থ সংস্কৃতি-বিকাশের সমস্ত মাধ্যমের উপরই নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। নানান পদ্ধতিতে হস্তক্ষেপ করে সব রকমের সামাজিক নিরাপত্তার ওপরও। এবং নৈতিকতার সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার ওপর চাপিয়ে দেয় চরিত্রহীনতার দুট্ট দেয়াল। তখন :

১. জাতীয় শিক্ষা হয়ে যায় বিজাতীয় শিক্ষা।
২. জাতীয় প্রচার মাধ্যমগুলো আর জাতীয় থাকতে পারে না।
৩. জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলো দখল করে নেয় বিজাতীয় ধ্যান-ধারণার অধিকারী বুদ্ধিজীবীরা।
৪. জাতীয় ভাষায় শুরু হয় বিজাতীয় ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির শব্দের দাপট।
৫. জাতীয় স্মরণক্ষেত্রগুলো পরিণত হয় বিজাতীয় সংস্কৃতির চারণক্ষেত্রে।
৬. জাতীয় সাংস্কৃতির বাহনগুলোয় আসন গেড়ে বসে বিজাতীয় সংস্কৃতির দৈত্য-দানব।
৭. তারপর পরাজিত হয় মুক্তির তিতুমীর স্বাধীনতার সিরাজুদ্দৌলা। জয়, জয় বলে চিৎকার করে ওঠে ক্লাইভ, মীরজাফর আর ঘষেটি বেগম।

আমাদের সংস্কৃতি গানের আনন্দে নাটকের ইচ্ছায়

“বিজিতরা সব সময় বিজয়ীদের পোশাক, প্রতীক, বিশ্বাস এবং অন্যান্য আচার-প্রথা অনুকরণ করতে চেষ্টা করে। এর কারণ হচ্ছে মানুষ সব সময় বিজয়ীদের কাছে প্রিয়পাত্র হতে আগ্রহী হয়। এটা দুই কারণে হয় প্রথমত: বিজয়ীদের প্রতি শ্রদ্ধা, দ্বিতীয়ত : বিজয়ীদের মত যোগ্যতার অধিকারী হলে তাদের পরাজয় হতো না এই মনোভাব হেতু যোগ্যতা অর্জনের জন্যে। এই বিশ্বাস দীর্ঘস্থায়ী হলে এটা একটা ব্যাপক আত্মার ভাব সৃষ্টি করে। বিজয়ীদের সকল কিছু অনুকরণে বিজিতরা অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। এই বিশ্বাস অজ্ঞাতভাবে অথবা বিজয়ের জন্যে বিজয়ীদের শারীরিক ও অস্ত্রের শক্তির চাইতে আচার-আচরণ প্রাধান্য বিস্তার করেছে এই বিশ্বাস থেকে সৃষ্টি হতে পারে। এই অবস্থায় তখন এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, বিজয়ীদের অনুকরণ পরাজয়ের কারণ দূরীভূত করবে। এই ভাবে দেখা যায়, বিজিতরা পোশাক অস্ত্রধারণ যন্ত্রপাতি এবং জীবন ধারণের সকল পদ্ধতিতে বিজয়ীদের অনুকরণ করে। বস্তুত: প্রতিটি দেশই তার বৃহৎ বিজয়ী প্রতিবেশীকে অনুকরণের চেষ্টা করে। স্পেনের মুসলমানেরা বিজয়ী প্রতিবেশী খ্রিস্টানদের অনুকরণ করেছে। খ্রিস্টানদের পোশাক, অলঙ্কার এবং আচার-আচরণে বিভিন্ন দিক এমনকি ঘরে ছবি রাখার ব্যাপারে মুসলমানরা তাদের অনুকরণ করেছে। সমগ্র পর্যবেক্ষণে এই হীনমন্যতা সম্পূর্ণ ভাবে ধরা পড়বে।”

আমরা আমাদের বক্তব্যের শুরুতে বিশ্ববিখ্যাত চিন্তাবিদ মরিয়ম জামিলার “সাংস্কৃতিক দাসত্বও রাজনৈতিক দাসত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন নয়” প্রবন্ধ থেকে উল্লেখ করেছে। উদ্ধৃতিটি অমর চিন্তানায়ক ইবনে খালদুনের মূলত:। এখানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, সাংস্কৃতিক দাসত্ব কতোটা ভয়াবহ এবং স্পেনের মুসলমানেরা কি কারণে শেষ পর্যন্ত পরাজয় বরণ করেছে।

গোটা দুনিয়ায় এখন আধিপত্য বিস্তারের যে লড়াই নতুন করে শুরু হয়েছে, তলিয়ে দেখতে গেলে, সে লড়াই যতটা না রাজনৈতিক, তার চেয়ে অনেক বেশী সাংস্কৃতিক। সেই কারণে সাংস্কৃতিক বিষয়ে শুধু মামুলি ধারণাই কাম্য নয়। বরং কাম্য হচ্ছে আন্তর্জাতিক ধারণার। জাতিসংঘ অনেক আগে থেকেই সংস্কৃতির ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান করেছে। এক্ষেত্রে পৃথিবী বিভিন্ন দেশে দেশে সাংস্কৃতিক নীতিমালা চিহ্নিত করতে গিয়ে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ইউনেস্কো গ্রহণ করেছে কতোগুলো সিদ্ধান্ত। ১৯২২ সালে মেক্সিকো শহরে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন ঘোষণা করে: “ব্যাপকতর অর্থে সংস্কৃতি হচ্ছে একটি জাতির অথবা সামাজিক গোত্রের বিশিষ্টার্থক আত্মিক বস্তুগত, বুদ্ধিগত এবং আবেগগত চিন্তা এবং কর্মধারার প্রকাশ। শিল্প ও সাহিত্যই এক মাত্র সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত বস্তু নয়, মানুষের জীবন ধারাও সংস্কৃতির অঙ্গ। মানুষের অধিকার, মূল্যবোধ, ঐতিহ্য এবং বিশ্বাসও সংস্কৃতির অঙ্গ।”

“সংস্কৃতি মানুষকে নিজের সম্পর্কে চিন্তা করার অধিকার এবং ক্ষমতা প্রদান করে। আমরা যে বিশেষভাবে যুক্তিবাদী মানুষ যে মানুষের বিচার-বুদ্ধি আছে এবং ন্যায়ের প্রতি আনুগত্য আছে তা আমরা অনুভব করতে পারি সংস্কৃতির মাধ্যমে; সংস্কৃতির মাধ্যমেই আমরা মূল্য নিরূপণ করি। এবং ভালো-মন্দের মধ্যে নির্বাচন করতে শিখি। সংস্কৃতির মাধ্যমেই মানুষ নিজেকে প্রকাশ করে, আত্মসচেতন হয়, নিজের অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে বোধ জন্মে, নিজের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে প্রশ্ন করতে শেখে। অনবরত নিজের সীমা অতিক্রম করার দক্ষতা অর্জন করে।”

ঐ সম্মেলনে সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞান বা আইডেন্টিটি সম্পর্কেও কতিপয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। আমরা তার থেকে দু'একটি এখানে উপস্থাপন করছি।

ক. প্রত্যেক সংস্কৃতি জাতিসত্তার ঐতিহ্যকে প্রকাশ করে এবং কতোগুলো অপরিবর্তনীয় মূল্যবোধকেও প্রতিষ্ঠিত করে। প্রত্যেক জাতি তার সংস্কৃতির মাধ্যমে পৃথিবীতে তার উপস্থিতিতে সূচিহ্নিত করে।

খ. সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞানের সুনিশ্চয়তার মাধ্যমে একটি জাতি তার স্বাধীনবোধকে প্রমাণিত করে, অপর পক্ষে বিরোধী সংস্কৃতির আত্মসন জাতিসত্তার অভিজ্ঞানকে ধ্বংস করে।

গ. সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞানের মাধ্যমে মানুষ তার অতীতকে আবিষ্কার করে, অতীতের প্রত্যয়ে বলিষ্ঠ হয় এবং বাইরের পৃথিবীর কাছ থেকে কল্যাণপ্রদ বস্তু গ্রহণ করার জন্যে প্রস্তুত হয়। একটি জাতি তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ণ রেখে পৃথিবীর সকল অঞ্চল থেকেই শুভ কল্যাণকে গ্রহণ করে সৃষ্টিধর্মিতার মধ্যে অত্মসর হতে পারে।

ঘ. একটি জাতির সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা এবং অভিজ্ঞান সংস্কৃতির দ্বারাই চিহ্নিত হয়। মনে রাখতে হবে সংস্কৃতির মাধ্যমে আত্মিক, মানসিক এবং পার্থিব ইচ্ছার বিকাশ ঘটে থাকে। যথার্থ উন্নয়নের লক্ষ্য হচ্ছে প্রতিটি মানুষের কল্যাণ। মনে রাখতে হবে সকল উন্নয়নের মূলে রয়েছে মানুষ। সুতরাং কোনো দেশের জন্য সাংস্কৃতিক নীতি-নির্ধারণ করতে গেলে আশা-আকাঙ্ক্ষাকে এবং জীবনযাপনের ব্যবস্থাকে সম্মান করতে হবে।

ঙ. একটি জাতির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে যে সমস্ত বিষয় গ্রাহ্য হবে তা হচ্ছে শিল্পীদের শিল্প সংস্কৃতি, সাহিত্যিকদের সাহিত্য সাধনা, স্থপতিদের নির্মাণ কর্ম, সঙ্গীত শিল্পীদের সঙ্গীত, নৃত্য শিল্পীদের নৃত্য-ব্যঞ্জন, বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার এবং অনুসন্ধান কর্ম, মানুষের ধর্মবোধ এবং সেই সমস্ত মূল্যবোধের সুকৃতি যা জীবনকে অর্থদান করে। অধিগম্য এবং অনধিগম্য সকল কর্ম, মানুষের ভাব প্রকাশের ভাষা, সামাজিক রীতি-নীতি, বিশ্বাস, ঐতিহাসিক নিদর্শন, নৃতত্ত্ব, গ্রন্থাগার সব কিছুই সংস্কৃতির অন্তর্গত।

সংস্কৃতি সম্পর্কিত এসব আন্তর্জাতিক বিবেচনাগুলোর আলোকে এখন আমরা আমাদের সংস্কৃতি নিয়ে সংক্ষিপ্তভাবে পর্যালোচনা করতে পারি। একটি কথা মনে রাখতে হবে সংস্কৃতি হচ্ছে স্বাধীনতার রক্ষা কবজ। স্বাধীনতা যেখানে অবাধ আচরণের দিকে ঝুঁকি পড়ে। সংস্কৃতি সেখানে রক্ষণাবেক্ষণের, সোজা কথায় আত্মনিয়ন্ত্রণের ভূমিকা পালন করে। একটি গাড়ির অবাধ যন্ত্রগতির সাথে স্বাধীনতা তুলনীয়। অন্যদিকে সংস্কৃতি ঐ যন্ত্রযানের যন্ত্রপরিচালকের ভূমিকা পালন করে। অর্থাৎ একটি জাতির প্রতিবন্ধকহীন গতিই হলো তার স্বাধীনতা আর সংস্কৃতি হচ্ছে তার যথার্থ নিয়ন্ত্রণের প্রহরা।

আমাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে আমাদের সচেতনতাই আমাদের রক্ষাকবচ এবং আমাদের সংস্কৃতির রক্ষণাবেক্ষণের অর্থই হলো আমাদের স্বাধীনতার রক্ষণাবেক্ষণ।

Lord Cromer ছিলেন আরব বিশ্বে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দোদard প্রতাপশালী ব্যক্তিত্ব। ১৮৮৩ থেকে ১৯০৭ সাল পর্যন্ত ২৫ বছর ধরে একটানা তিনি মিশর শাসন করেন। তাঁর বিরূপ Modern Egypt গ্রন্থ পড়লে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কৌশল সম্পর্কে সম্যক ধারণা নেয়া যায়। Modern Egypt গ্রন্থে সর্বত্রই তার একটি কথা ঘুরে ফিরে এসেছে, সে কথাটি হচ্ছে-

“সরাসরি রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের চাইতে.... সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ বিজ্ঞানের নীতি গুরুত্বপূর্ণ।”^{৩০} আমরা আমাদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যতো কথাই বলি না কেনো, সাংস্কৃতিক অসচেতনতাই সর্বোপরি আমাদের স্বাধীন অস্তিত্বকে একদা তছনছ করে দেবে, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। আমাদের সাংস্কৃতিক

অসচেতনতা সেই গভীর খাল কাটারই নামান্তর, যে খালের শ্রোতথারায় সঁতারিয়ে সঁতারিয়ে একদিন চলে আসবে সাম্রাজ্যবাদের নানা বর্ণের কুমির। হয়তো শাঁওলী মিত্রই হচ্ছে সেইসব কুমিরের কোন একটির নাম।

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যবোধ সাংস্কৃতিক সচেতনতার অপরিহার্য একটি দিক। মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী বলেছেন :

“বর্তমানে বাঙলার মুসলমান সমাজকে দুইটি বিরাট বিসদৃশ সভ্যতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। প্রথম, ইউরোপীয় সভ্যতা; দ্বিতীয়ত ভারতের হিন্দু সভ্যতা। ইউরোপীয় সভ্যতার কয়েকটি বাহিরঙের সহিত ইসলামী সভ্যতার বিরোধ থাকিলেও অনেক বিষয়ে সুসাদৃশ্যও দেখিতে পাওয়া যায়। ইতিহাস পাঠক মাত্রই অবগত আছেন যে, যে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ফলে ইউরোপ আজ বিশ্বজয়ী হইয়াছে আরব বা ইসলামী সভ্যতাই সে বিষয়ে তাহার শিক্ষাগুরু। একথা ছাড়িয়া দিলেও বাংলা সাহিত্যের সেবা ক্ষেত্রে ইউরোপীয় সভ্যতার সহিত আমাদের তেমন প্রত্যক্ষ ও নিকট সংঘর্ষ বিদ্যমান নাই। পক্ষান্তরে হিন্দু সভ্যতার সহিত ইসলামী সভ্যতার বিন্দু মাত্রও মিল বা সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না। হিন্দু সভ্যতার ভিত্তি হইতেছে, পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ; ইসলামী সভ্যতার স্বরূপ ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত, পৌত্তলিকতার উচ্ছেদ সাধনপূর্বক এক অদ্বিতীয়, নিরাকার, সর্বগুণাকর, সর্বশক্তিমান আল্লার উপাসনা জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতেই ইসলামের উদ্ভব। ইসলাম জাতিভেদ স্বীকার করে না। প্রত্যেক মুসলমান অন্য মুসলমানের ভ্রাতা এবং সকল মানুষই এক মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত- ইহাই কোরআনের অভিমত। এমন দুইটি পরস্পর বিরোধী সভ্যতার মধ্যে প্রতিদিন প্রতিনিয়ত সাংসারিক জীবন কর্মের সংঘর্ষ হইতেছে। সাহিত্য- সেবা ক্ষেত্রেও এই সংঘর্ষ অবশ্যস্বাবী, এজন্য মুসলমানকে আত্মরক্ষার জন্য পূর্ব হইতেই সাবধানতা অবলম্বন করতে হইবে।”^{১৪}

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতি যদিও ‘সাহিত্যে স্বাতন্ত্র্য কেনো?’ এই নামের প্রবন্ধে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী উল্লেখ করেছেন। তবুও “সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য” প্রসঙ্গেও এ বক্তব্য প্রযোজ্য। কেননা সভ্যতার প্রসঙ্গ উদ্ধৃতিটির মধ্যে উদ্ঘাপিত হয়েছে। পক্ষান্তরে সংস্কৃতি ও সভ্যতার সম্পর্কতো সুগভীর। আলীয়া আলী ইজ্জতবেগভিচ এ ব্যাপারে তাঁর ‘ইসলাম বিটুইন ইস্ট এন্ড ওয়েস্ট’ গ্রন্থে চমৎকার ভাবে বলেছেন :

“সংস্কৃতির বাহক মানুষ, সভ্যতার বাহক সমাজ। সংস্কৃতির অর্থ সহজাতবোধের পরিচর্যার মাধ্যমে আত্মশক্তি অর্জন, সভ্যতার সংযোগ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, নগরী ও রাষ্ট্রের সাথে- এর মাধ্যম হলো চিন্তা ভাষা ও লেখনী। সংস্কৃতি ও সভ্যতার সম্পর্ক

স্বর্গজগত ও ইহজগতের বা Civitas de-ism I Civitas solip.ip.sism এর সম্পর্কের অনুরূপ। একটি নাটকীয়তার প্রতিনিধিত্ব করে, অপরটি প্রতিনিধিত্ব করে ইউটোপিয়ার।

বস্তুর উপর মানুষের নির্ভরতা বেড়েই চলেছে। এক হিসেব মতে প্রত্যেক মার্কিনী প্রতিবছর অন্তত আট টন বিভিন্ন ধরনের বস্তুগত দ্রব্যাদি ব্যবহার করে থাকে। প্রতিনিয়ত নতুন চাহিদা সৃষ্টি ও সেই চাহিদা পূরণের ব্যাপক আয়োজনের মধ্যে দিয়ে সভ্যতা মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে বস্তুগত আদান-প্রদান ত্বরান্বিত করে; সেখানে বাহ্যিক জীবন-যাপনে ছন্দ উচ্চকিত হয়, কিন্তু অন্তর্নিষ্ঠ জীবনের সুরটি চাপা পড়ে যায় সভ্যতার যান্ত্রিকতার তলে।”^৫

“Produce to gain, gain to squander” সভ্যতায় এই ভাবনা সহজাত। অপরদিকে প্রতিটি সংস্কৃতি তার ধর্মীয় প্রকৃতির কারণে মানুষের চাহিদা ও যোগানের পরিমাণকে হ্রাস করতে চায়। সে চায় মানুষের অন্তর্গত স্বাধীনতার সুরকে জোরালো করতে।”^৬

পূর্বের উল্লেখ করা হয়েছে, আমাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করাই উদ্দেশ্য। আমাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে যথার্থ এবং মৌলিক বক্তব্য রেখেছেন আবুল মনসুর আহমদ তাঁর “বাংলাদেশের কালচার” গ্রন্থে। তিনি বলেছেন :

“পাক-বাংলার সভ্যতা ও শিল্প-বাণিজ্যকে আমরা মুসলমানরা... উন্নত করিয়াছিলাম। সেই সাথে পাক-বাংলার কালচারকেও আমরা নানা ফুলে-ফলে ও রূপে-গন্ধে সুসজ্জিতও সুরভিত করিয়াছিলাম। এটা আমরা একদিনে করি নাই। বাংলার মাটির সাথে আমাদের সম্পর্ক হাজার বছরেরও বেশী কালের। পুরা সাড়ে ছয়শ’ বছর আমরা এই দেশের শাসক ছিলাম, তার মধ্যে প্রায় তিনশ’ বছর আমরা স্বাধীন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা শাসন করিয়াছি। এই মুদতে আমরা বাংলাকে নিজস্ব জাতি নাম, ভাষা ও সাহিত্য দিয়াছিলাম। সে ভাষা ও সাহিত্যের মধ্য দিয়া বাঙ্গালীত্বকে নতুন মর্যাদা, তার ভাষায় নতুন সুর, তার গলায় নতুন জোর দিয়াছিলাম। কৃষ্টি সভ্যতা, শিল্প-বাণিজ্য ও শিক্ষা-সাহিত্যে সভ্য জগতের দরবারে বাংলাদেশকে করিয়াছিলাম সুপ্রতিষ্ঠিত। পাক-বাংলার শিল্প-সাহিত্যে ও কৃষ্টি সভ্যতায় হাজার বছরের এই মুসলিম ছাপ সুস্পষ্ট দীপ্তিমান।”^৭

উদ্ধৃতির শেষের দিকে আবুল মনসুর আহমদ যে ছাপের কথা বলেছেন ঐ ছাপই মূলত: আমাদের সাংস্কৃতিক পরিচয়ের অন্য নাম। অর্থাৎ হাজার বছর ধরে আমাদের সার্বত্রিক জীবনজুড়ে যে স্বতন্ত্র ছাপের উজ্জ্বলতা বিদ্যমান ঐ উজ্জ্বলতাই আমাদের সংস্কৃতি। প্রখ্যাত গবেষক ও সম্পাদক আবুল আসাদ উল্লেখ করেছেন:

“একটি জাতির জাতীয় স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষার মূল রক্ষা কবচ হলো দুটি: এক. তার বিশ্বাস ভিত্তিক স্বাতন্ত্র্য যা তার সাংস্কৃতিক ত্রিনয়াকর্মের মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকে এবং বিকশিত হয়, দুই. তার ভাষা ও আঞ্চলিক পরিচয় সূচক আবেগ। উপরোক্ত দুটি বিষয়ের মধ্যে প্রথমটিই মৌলিক। প্রথমটির যদি বিলুপ্তি ঘটে, তাহলে দ্বিতীয়টি কোনো জাতির স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষায় কোনো বাধা হয়ে দাঁড়ায় না।”

আমাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে একটি জাঙ্জল্যমান ধারণা দিয়েছেন ড. আসকার ইবনে শাইখ। ‘বাংলাদেশের বহমান সংস্কৃতি-ধারা’ প্রবন্ধে। তিনি বলেছেন : “মুসলিম-প্রধান বাংলাদেশে বহমান সংস্কৃতির প্রাধান্য পরিলক্ষিত হবে- এটাই স্বাভাবিক। তাই বলে এদেশীয় অন্যান্য সংস্কৃতি হারাতে বসবে তার স্বকীয় পরিচয়, তা কারও কাম্য হতে পারে না। ইসলাম এমন কোনো পরিস্থিতি সৃষ্টির ঘোর বিরোধী। জীবন-বিশ্বাস নির্বিশেষে সকল মানুষ সমান সুযোগ লাভ করে সত্য সুন্দর কল্যাণের পথে অগ্রসর হবে, সর্বজনীন মানবিক ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যাভিসারী হবে ইসলামের তা-ই স্পষ্ট বিধান। এই বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত পরিচয়ে চিহ্নিত হয়েই বহমান আমাদের এতোদিনকার সংস্কৃতি-ধারা।”

সুতরাং পৌত্তলিক সংস্কৃতি যে আমাদের সংস্কৃতি নয়, আমাদের সংস্কৃতি যে আমাদের একান্ত বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত- সে কথা না বললেও চলে। অন্যদিকে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিও যে আমাদের সংস্কৃতি নয়, সে ব্যাপারে একটি ঐতিহাসিক বিবেচনা উপস্থাপনা করেছেন মার্মেডিউক পিকথল। তিনি বলেছেন :

“কয়েক বছর আগে ইংল্যান্ডের সংবাদপত্র মহলের একটি আলোচনার কথা আপনাদের কারো নিশ্চয়ই স্মরণ আছে। প্রশ্নটি ছিলো এই: মনে করুন একটি কক্ষে একটি জীবন্ত শিশুর সঙ্গে একটি সুবিখ্যাত ও অনুপম সুন্দর গ্রীক ভাস্কর্য মূর্তি রয়েছে; সমপর্যায়ের মূর্তির মধ্যে এ মূর্তিটি অসাধারণ ও অতুলনীয়, সুতরাং এর স্থান পূরণ অসম্ভব। এখন ধরুন, কক্ষটিতে আগুন লেগেছে, আর মূর্তি ও শিশুটির মধ্যে একটিকেই বাঁচানো সম্ভব। এ অবস্থায় কাকে বাঁচাতে হবে?

আমার মনে আছে, প্রায় অধিকাংশ সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী ও পদস্থ ব্যক্তি হতভাগ্য শিশুটির সামনে মৃত্যুর দ্বার উন্মুক্ত করে সেই অনুপম গ্রীক ভাস্কর্য মূর্তিটি রক্ষার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের যুক্তি ছিলো, প্রতিদিন লাখ লাখ শিশুর জন্ম হয়, পক্ষান্তরে প্রাচীন গ্রীক ভাস্কর্য শিল্পের সেই শ্রেষ্ঠতম নিদর্শনটির স্থান পূরণ কখনো সম্ভব হবে না।

কোনো মুসলমান কখনো এই অমানবিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রসূত অভিমত গ্রহণ করতে পারে না কিংবা এ দৃষ্টিভঙ্গির পরিপোষক হতে পারে না। এই দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে প্রতীকবাদিতা তথা প্রতিমা পূজার সর্বশেষ মার্জিত রূপ।”

মনে রাখতে হবে, আমরা যে সংস্কৃতিকে আমাদের সংস্কৃতি বলছি, তা ইসলামী সংস্কৃতি ছাড়া আর কিছুই নয়। আর এ সংস্কৃতি চর্চার মধ্য দিয়েই কেবল সম্ভব উৎকর্ষের বহুবর্ণিল আনন্দ ও ইচ্ছাকে স্পর্শ করা। দার্শনিক-চিন্তাবিদ অধ্যাপক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ঠিকই বলেছেন :

“ইসলামের এ আদর্শ জীবনে গ্রহণ করলে মুসলিমেরা যে কেবল নিজেরাই উন্নতির সুউচ্চ শিখরে আরোহণ করতে পারবে তা নয়, বিশ্ব-সভ্যতার রূপও পরিবর্তন করতে পারবে-দুনিয়ায় এক নতুন সংস্থা [order] পত্তন করতেও হবে সমর্থ।”

সেই জন্যে, যে-সংস্কৃতি আমাদের, তা চর্চা করার অর্থ হলো, উন্নতির উচ্চ শিখরে আমাদেরই আরোহণ এবং শুধু তা-ই নয় বরং সে-সংস্কৃতি চর্চার মধ্য দিয়েই কেবল বিশ্ব-সভ্যতার রূপ পরিবর্তন করা সম্ভব। অর্থাৎ বিশ্ব-বিজয়ের উল্লাস এবং অভিপ্রায়ও সন্নিহিত রয়েছে ঐ আমাদের সংস্কৃতি চর্চার ঐশ্বর্যে।

দুই.

সংস্কৃতির সবগুলো পর্বত-চূড়াই আজ আমাদের স্পর্শ করতে হবে, সবগুলো সমুদ্রেই ছোটাতে হবে জাহাজ এবং সবগুলো দিগন্তেই মেলে দিতে হবে ডানা। আলীয়া আলী ইজ্জতবেগোভিচ বলেছে : “ধর্মাচরণ, নাটক, কবিতা, খেলাধুলা, লোকজ সংস্কার, লোক কথা, পুরাণগাঁথা, নৈতিক ও নন্দনতত্ত্বীয় ব্যবস্থা, দর্শন, থিয়েটার, গ্যালারী, যাদুঘর, গ্রন্থাগার, রাজনীতি ও বিচার ব্যবস্থা যা মানুষের ব্যক্তিত্বের মূল্য ও তার স্বাধীনতাকে স্বীকার ও শ্রদ্ধা করে এগুনোই মানব সংস্কৃতির অখণ্ড ধারাচিত্র, যার শুরু স্বর্গে, স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্ট মানুষের মধ্যকার আদি যোগাযোগের সূত্রে। এ হলো, “এক প্রজ্জ্বলিত আলোক শিখার সাহায্যে গাঢ় অন্ধকার ভেঙে ভেঙে অনতিক্রম্য সেই পবিত্র পর্বতে মানুষের আরোহণ প্রচেষ্টার ছবি।”

হ্যাঁ, সংস্কৃতি চর্চার বৈধ-বাহনের কোনো একটিকেও আজ আর অবহেলা করার সুযোগ নেই। সুযোগ নেই, গাঢ় অন্ধকার ভেঙে ভেঙে যারা পর্বতে আরোহণ করতে চায়, তাদের জন্যে। তাদের জন্যে সুযোগ নেই, যারা প্রজ্জ্বলিত আলোকশিখার সাহায্য নিতে চায়।

তবুও আবহমান বাংলার সৌজন্যে আজ গানের ভূমিকাকে করা উচিত আরো বিচিত্র, আরো সমৃদ্ধ। কেননা প্রথমাবধি গানই আমাদের চেতনাকে করেছে অধিকতর শাণিত এবং অধিকতর জাগ্রত। প্রখ্যাত সাংস্কৃতিক-ব্যক্তিত্ব, চিন্তাবিদ-বুদ্ধিজীবী ওবায়দুল হক সরকার বলেছেন :

“বলাবাহুল্য কাজী নজরুল ইসলাম রচিত ও আব্বাস উদ্দীন আহমদের গাওয়া ইসলামী গানগুলি মুসলমান সমাজে যুগান্তর ঘটিয়েছিলো। বিত্ত ও চিন্তা উভয় দিক দিয়ে রিক্ত ও নিঃশব্দ মুসলমান মৃতপ্রায় জাতিতে পরিণত হয়েছিলো। কলের গানের রেকর্ডে বেজে উঠলো :

‘জাগে না সে জোশ লয়ে আর মুসলমান,
করিল জয় যে তেজ লয়ে দুনিয়া জাহান।’

মুসলমান সমাজে জোশের সঞ্চারণ হলো। মুসলমানের ঘরে ঘরে কলের গানের রেকর্ডে শোনা গেলো-

‘বাজিছে দামামা, বাঁধরে আমামা শির উঁচু করি মুসলমান

দাওয়াত এসেছে নয়া জামানার ভাঙা কেন্দ্রায় ওড়ে নিশান।’

‘মুসলমানদের পৃথক আবাসভূমির জন্য মুসলমানের আত্মসচেতনতার মূলে কাজী নজরুল ইসলাম ও আব্বাস উদ্দীন আহমদ। বাংলার গ্রামে-গঞ্জে ইসলামী গানের রেকর্ডগুলি জনসাধারণের রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছিলো।’^{১০}

স্বাধীনতার চেতনা সঞ্চারণের জন্য গান একটি বৃহৎ মাধ্যম। দেশের সর্বস্তরের মানুষের এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক হচ্ছে গান এবং সুরের সঙ্গে। সেই অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক এড়িয়ে চলার মধ্যে আত্মহনন থাকতে পারে, আত্মমর্যাদা নেই। তাই জারী-সারি-কাওয়ালী ডাওয়াইয়া-পল্লীগীতি এবং গম্ভীরা-র মতো লোকসঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য গণসঙ্গীতের গুরুত্ব ও অনুধাবন করতে হবে অধিকতর। একজন গবেষক বলেছেন :

“কাগজ-কলমের সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকে লোক সঙ্গীতের নানা বৈশিষ্ট্যগুলোকে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। কারণ শুধু রচনা নয় তার সুরারোপ, উচ্চারণ-ভঙ্গিমা, ছন্দপ্রয়োগ এবং বিভিন্ন আঙ্গিকের প্রশ্নগুলি একান্তভাবেই শ্রবণের সঙ্গে জড়িত।”^{১১}

লোক সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্যগুলি হচ্ছে

- ক. লোকসঙ্গীতের বহমানতা গুণ
- খ. আঞ্চলিক সুরগত বৈশিষ্ট্য
- গ. বিশেষ ধরনের প্রয়োগ রীতি
- ঘ. বিভিন্ন ধরনের কণ্ঠ প্রয়োগ

সবচেয়ে বড় কথা হলো, লোকসঙ্গীত জীবনেরই সম্পদ। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন:

“তারা কেবল দেশের জনসাধারণেরই উপভোগ্য ও আয়ত্তগম্য; সেখানে বাহিরের লোক প্রবেশের অধিকার পায় না।”^{১২}

[রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : লোক সাহিত্য, পৃষ্ঠা : ৯১]

তিন.

এরিস্টটল বলেছেন : “নাটক মহাকাব্যের চেয়ে বৃহত্তর ও মহত্তর সৃষ্টি।”^{১৬}

বহু-বহু দিন আগে এরিস্টটল ঐ কথাটি উচ্চারণ করেছিলেন। এখন নদীর শ্রোতের মতো সময় যতোই গড়িয়ে যাচ্ছে ততোই যেনো ঐ বক্তব্যের প্রতি সমাজ-নির্মাতাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হচ্ছে এবং নাটকের ব্যাপারে যত্নবান হচ্ছেন।

একদা ‘ইংরেজরা তাদের অবসর বিনোদন এবং ব্যবসায়িক কারণে এ দেশে থিয়েটার আমদানি করে।’

তারপর থিয়েটার স্থাপনে এগিয়ে আসেন এ দেশেরই হিন্দুরা। প্রতিষ্ঠিত হয় ‘হিন্দু থিয়েটার।’ আরো পরে, ‘হিন্দু নাটককে দৃঢ় ভূমিতেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন গিরিশচন্দ্র।’ তিনি “হিন্দু জাতীয়তাবাদ”কে দর্শক-মনে ছান করে দিতে সাহায্য করলেন।’

গিরিশচন্দ্রের হাতে তৈরী হয়েছে অন্য অনেক নাটক। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস অবলম্বনে যে সব নাটক তিনি মঞ্চায়ন করেছিলেন, তাতে হিন্দু-জাতীয়তাবাদের ভাবধারাই আরো বলিষ্ঠতা অর্জন করেছিলো।

বঙ্কিমচন্দ্র নব-হিন্দুবাদ প্রতিষ্ঠাকল্পে-পাশ্চাত্যের প্রগতিশীল ভাবধারার বিরুদ্ধাচারণই করেছিলেন। নবহিন্দুত্ববাদ প্রচারের মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র সনাতন হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনের যে কাজ আরম্ভ করে যান, তাকেই স্বামী বিবেকানন্দ অনেকটা অগ্রসর করে দেন। বিবেকানন্দ ছিলেন এই ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের মুখপাত্র। তরুণদের প্রতি স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশ ছিলো: “বঙ্কিমের রচনা বারংবার পাঠ করো, আর তাঁহার দেশভক্তি ও সনাতন ধর্মের অনুসরণ করো।” [বাংলা মঞ্চ-নাট্যের পশ্চাত্তমি: পৃষ্ঠা ৬৯]

নাটকের মাধ্যমে হিন্দু-জাতীয়তাবাদের উজ্জীবন প্রয়াসের উদ্যোগকাল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। তবু এতোটুকু বলা যায়, নাটকের মাধ্যমে শুভ হোক কি অশুভ হোক, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের কর্মসম্পাদন হতে দেখা গেছে। খুব বেশী দিনের কথা নয় ১৯৪২ সালের দিকে, নাটক নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করলেন কিছু সংখ্যক বুদ্ধিজীবী-বাম রাজনীতিবিদ। তাঁরা বুঝলেন, ‘নাটক তো হচ্ছে সমাজ বিপ্লবের অন্যতম এক হাতিয়ার-যা দেশকে তার রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামো বদলাতে সাহায্য করবে। তাঁদের বিশ্বাস জন্মালো, থিয়েটারকে হতে হবে জীবন ঘনিষ্ঠ।’

‘ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের’ একটি শাখা- নাম তার: ‘ভারতীয় গণনাট্য সংঘ’- গঠিত হলো।

নাটক যে সমাজ বদলাবার হাতিয়ার তা অনুধাবন করেছিলেন ইবরাহীম খাঁ, ফররুখ আহমদ, আসকার ইবনে শাইখরাও। অন্যতর এক দৃষ্টিভঙ্গিতে এবং শুদ্ধতর আরেক দৃষ্টি-ভঙ্গিয়ায়। সম্ভবত সুর-সশ্রুটি আব্বাস উদ্দীন আহমদও অপরিহার্য ঐ বিষয়টিকে অনুধাবন করতেন এবং করতেন বলে তিনিও একদা যুক্ত হয়েছিলেন নাট্য-আন্দোলনের সঙ্গে। “পূর্ব-পাকিস্তানের নাট্য-আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ের... স্মরণীয় পরিবেশনা হলো ‘ছেঁড়া তার’।” ছেঁড়া তারের উদ্যোক্তা ছিলেন আব্বাস উদ্দীনই।

১৯৪৯ সালে মঞ্চস্থ হয়েছিলো আসকার ইবনে শাইখ-এর ‘বিরোধ’। “নাট্যরঙ্গ হলে প্রভোষ্ট ড. আবদুল হালিম মঞ্চে এসে হাত জোড় করে দর্শকবৃন্দের কাছে অনুরোধ জানালেন: এই প্রথম মুসলমান সমাজের উপর একজন মুসলমান নাট্যকারের পূর্ণাঙ্গ নাটক মঞ্চস্থ হতে যাচ্ছে। দর্শকদের চোখ-কানের অভ্যাসে হয়তো বিসদৃশ নাড়া লাগবে। তাঁরা যেনো ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি দিয়ে নাট্যাভিনয়ের পুরোটাই দেখে যান।”

মজার ব্যাপার ‘বিরোধ’-এর নির্বাচন করেছিলেন ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ।

অসামান্য নাট্য-প্রতিভা ড. আসকার ইবনে শাইখ জাতীয় সমাজ-চরিত্র এবং ইতিহাস-ঐতিহ্যের প্রেক্ষাপটে নাট্যাঙ্গনে আজো সচঞ্চল।

ফররুখ আহমদ এর কাব্যনাট্য ‘নৌফেল ও হাতেম’ সম্পর্কে কে না জানে? ‘১৯৫১ সালের ১৬ জানুয়ারি ‘সলিমুল্লাহ মুসলিম হল সংসদ’ মিলনায়তনে মঞ্চস্থ হয় ফররুখ আহমদের ব্যঙ্গ-নাটিকা ‘রাজ-রাজড়া’।

কবি ফররুখ আহমদ ছিলেন সত্যিকার অর্থেই সাধক। সাধক-জীবন-উদযাপন; সাধক-সাহিত্য-সংগ্রামে; সাধক-সমাজ-নির্মাণ-চিন্তায়। সম্ভবত সেই কারণে তিনিও নাট্য প্রয়াসে দ্বিধাহীন হতে পেরেছেন।

বহুত নাটকের এক বিপ্লবী ভূমিকা আমরা ভাষা-আন্দোলনের প্রেক্ষিতে লক্ষ্য করি। এ-প্রসঙ্গে ড. আসকার ইবনে শাইখ বলেন : সুদিন

“আমাদের জীবন এলো ১৯৫২। একুশে ফেব্রুয়ারি। আমাদের জাতিসত্ত্বার বিবেচনায় সংযুক্ত হলো এক নতুন চেতনা। স্ব-পরিচিতি অন্বেষার এক অনিবার্য প্রক্রিয়া। সাতচল্লিশের অনেক প্রত্যাশা মারণাঘাতে মুমূর্ষু হলো মাত্র বছর পাঁচকে যেতে না যেতেই। মাতৃভাষার দাবীতে জীবন-দান, যে কোনো দেশের ইতিহাসে এ যে অভাবিত-পূর্ব, অভিনব। ফলত এর প্রভাব সংস্কৃতি ক্ষেত্রেই প্রতিফলিত হতে আরম্ভ করে বেশী করে। তদানুযায়ী নাট্যক্ষেত্রেও। বিশেষ করে নাটক রচনার ক্ষেত্রে।”

সব নাটকেই প্রচলিতভাবে স্বাধিকার-সংগ্রামী চেতনার সুর। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের উদ্বোধন।”^{১৭} সত্যি কথা বলতে কি? সংস্কৃতির বাহন হিসেবে নাটকের শক্তিমত্তা সম্পর্কে আজ সবাই ওয়াকিবহাল। কিন্তু তাকে আত্মহুঁ করার প্রবণতায় আসক্ত বুদ্ধিমান লোকের সংখ্যা নেই বললেই চলে। অন্তত ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রপথিকদের মধ্যে যে, খুবই কম, তা নির্বিধায় বলা চলে।

শিল্পী লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি তাঁর রাজার এক যুদ্ধের প্রয়োজনে একটি নদীর গতিপথকে সম্পূর্ণ নতুন পথে প্রবাহিত করার জন্য খাল কাটিয়েছিলেন। যুদ্ধও হয়েছিলো, নির্ধারিত হয়েছিল জয়-পরাজয়ও। কিন্তু নতুন পথে খাল প্রবাহিত হয়নি। সুতরাং দায়িত্ব পালনই বড় কথা ছিলো দ্য ভিঞ্চির জন্য এবং পরিণতির নিরানন্দ-দায়ভাগ তার একার ছিলো না।

সম্পূর্ণ নতুন পথে নদী তার গন্তব্য খুঁজবে কি না, সেই সংশয়ের কারণে, আজ অনেক মহাজনই আর নদী খননের খরচ চালাতে উদ্যোগী হন না। যুদ্ধও করেন না। মেনে নেন অপরিহার্য পরাজয়। দূরদর্শী এক নাট্য-প্রতিভা ড. আসকার ইবনে শাইখ আমাদের নাট্য-জগতের ভবিষ্যৎ নিয়ে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ অনুধ্যান করেছেন। তিনি বলেছেন :

“শিল্প যুগ স্বাভাবিকভাবেই এ-দেশেরও জীবন-যাত্রা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আনবে। নবজাতকের বয়স একটু বাড়লেই তা আশা করা যায়। নতুন যুগের সমস্যা-সমাধানে তখন মানুষ জীবনকে অনুভব করবে নতুন করে। নাট্যকার এই অনুভূত জীবনকেই তুলে ধরবেন নতুন আঙ্গিকে।

এখন এখানে শিল্প যুগের আরম্ভ। কিন্তু আমরা এই নতুন দিনকে গ্রহণ করতে কতোটা তৈরী হচ্ছি, এ প্রশ্ন স্বাভাবিক।”^{১৮}

অর্থ-সম্পদের মতো শিল্প-সম্পদের ইতিহাসও হাতবদলের ইতিহাস। অর্থ-সম্পদ যেমন একটি মানুষ, একটি পরিবার এবং একটি সমাজের হাতেই বন্দিত্ব বরণ করে না; তেমনি শিল্প-সম্পদ অথবা সংস্কৃতি-সম্পদও একটিমাত্র অবস্থানে কেন্দ্রীভূত হয় না। জায়গা বদল করে। কিন্তু প্রত্যয়দীপ্ত বিপ্লবীরা কি অর্থ-সম্পদের মতো শিল্প-সম্পদ থেকেও বঞ্চিত থাকবে অনন্তকাল? অনন্তকাল বঞ্চিত থাকবে নাট্য-বিশ্ব থেকেও? নতুন দিনের সম্পদ-সমৃদ্ধ হবার কোনই প্রস্তুতি নেবে না?

দৌড়ানো এক কথা। আর দৌড়ে জেতা আর এক কথা। আমাদের সংস্কৃতির বিজয়ের লক্ষ্যে প্রস্তুতি কালটা শেষ হয়েছে এইমাত্র এবং শুরু হয়ে গেছে প্রতিযোগিতার সময়-কাল, দৌড়ে জেতার প্রতীক্ষিত ওয়াক্ত। গানের আনন্দে এবং নাটকের ইচ্ছায় তার শুভ সূচনা হোক।

তথ্য নির্দেশ:

১. ইসলাম ও আধুনিকতা: মরিয়ম জামিল্লা
২. আমাদের আত্মপরিচয় এবং বাংলাদেশী জাতীয়বাদ: সৈয়দ আলী আহসান
৩. ইসলাম ও আধুনিকতা: মরিয়ম জামিল্লা
৪. বাংলাদেশের কালচার: আবুল মনসুর আহমদ
৫. প্রাচ্য, পশ্চাত্য ও ইসলাম
৬. অগ্রপথিক ১৯৮৮: অধ্যাপক আবদুল গফুর সম্পাদিত
৭. আমাদের সংস্কৃতি: আবুল আসাদ
৮. বাংলা সাহিত্য পরিষদ সম্মেলন স্মারক
৯. ইসলামী সংস্কৃতির রূপরেখা: শাহেদ আলী সম্পাদিত
১০. ঐ
১১. ড. আলীয়া আলী ইজ্জতবেগোভিচ
১২. সেকালে আমাদের নাট্যচর্চা: ওবায়দুল হক সরকার
১৩. সংগীত মূল্যায়ন বক্তৃতামালা: ড. উৎপলা গোস্বামী সম্পাদিত
১৪. ঐ
১৫. নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা: ড. সাধন কুমার ভট্টাচার্য
১৬. বাংলা মঞ্চ-নাট্যের পশ্চাত্তমি: আসকার ইবনে শাইখ
১৭. মধ্যযুগের বাংলা নাট্য : সেলিম আল দীন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

ঘোষণার পটভূমি: প্রকৃত ইতিহাসের সন্ধান

১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর, ইউনেস্কোর ৩০তম কমিশন মিটিংয়ে, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে, ২১ ফেব্রুয়ারি প্রস্তাবকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করার কথা আজ কে না জানে? তবে সচেতন বিশ্ব নাগরিকরা জানে সবচেয়ে বেশী এবং এও জানে যে, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণার প্রস্তাব প্রথম করেছে এবং এ-আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছে মাদার ল্যাংগুয়েজ অব দ্যা ওয়ার্ল্ড [বহুভাষিক ও বহুজাতিক মাতৃভাষা প্রেমিক গ্রুপ] নামের একটি আন্তর্জাতিক ভাষা সংগঠন। শুধু জানে না ঐ মহান আন্দোলন ও সংগঠনের মহান নেতৃবৃন্দের যথার্থ পরিচয়।

সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার হলো, ঐ নেতৃবৃন্দের যথার্থ পরিচয় উদ্ঘাটনের জন্যে এ পর্যন্ত কোনো মহলই তেমন কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। সরকারের ঔদাসিন্যই হচ্ছে এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে মর্মান্তিক। সাহিত্য-সাংস্কৃতিক সংগঠনের অভাব নেই এদেশে, সংগঠকেরও অভাব নেই কিন্তু এ ব্যাপারে তাদেরও কারো কোনো মাথা ব্যথা আছে বলে মনে হয় না।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে, ২১ ফেব্রুয়ারিকে, জাতিসংঘ স্বীকৃতি দেবার পর তিন বছরেরও বেশী সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, উচিত ছিলো এই সময়ের মধ্যেই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা আন্দোলনের মহান নেতাদেরকে জাতীয়ভাবেই সংবর্ধনা দেয়ার এবং জাতীয় বীরের মর্যাদায় খোশ আমদেদ জানানোর।

কোরবানীর ঘটনা অভূতপূর্ব

হযরত ইব্রাহীম (আ.) বিয়ে করেছিলেন সারাহকে। কিন্তু তার কোন সন্তান না হওয়ায় হাজেরাকে বিয়ে করেন। হাজেরার গর্ভেই ইব্রাহীম (আ.)-এর প্রথম ছেলে ইসমাইলের জন্ম। ইসমাইল (আ.)-কে ইব্রাহিম (আ.) অত্যধিক ভালোবাসতেন। ঐ অত্যধিক ভালোবাসাটা সহ্য হলো না সারাহ'র। তবুও ক্রমে ক্রমে বড় হতে থাকল ইসমাইল।

কতোইবা হবে তখন ইসমাইলের বয়স। আল্লাহ ইব্রাহীম (আ.)-কে হুকুম করলেন : 'যাও উপত্যকা বাক্কায় [মক্কার তখনকার নাম]। হাজেরার সঙ্গে ইসমাইলকে রেখে এসো।' ইব্রাহীম (আ.) হচ্ছেন আল্লাহর বন্ধু। বন্ধু কি তার বন্ধুর কথা অমান্য করতে পারেন? যতই প্রিয়তম হোক না কেনো আপন কলিজার টুকরা সন্তান! তিনি তাকে এক শুকনো ঠনঠনে শূন্য পাহাড় ঘেরা কঠিন জমিনে রেখে এলেন। অর্থাৎ বাক্কায় [মক্কা] রেখে এলেন। শূন্য প্রান্তরে রেখে আসা অসহায় মা ও সন্তানের প্রতি একটার পর একটা রহমত বর্ষিত হতে থাকল। একসময় সেখানে অন্য কোথাও যাবার সময় হাজির হয়ে গেলো হযরত নূহ (আ.)-এর ছেলে শামের বংশের কিছু লোক। তারা হাজেরার অনুমতি চাইলেন সেখানে বসবাসের জন্য। হাজেরা অনুমতি দিলেন। 'জুরহুম' নামের ঐ দলটি নিজেরা বাড়ি বানালা, বাড়ি বানালা হাজেরা ও ইসমাইলের জন্যও। জুরহুমদের ভাষা ছিলো আরবি। ইসমাইল বড় হতে হতে রপ্ত করে ফেললেন আরবি ভাষা। সুন্দর এবং সৎ স্বভাবের জন্য তিনি জুরহুমদের প্রিয় পাত্র হিসেবে বেড়ে উঠতে লাগলেন। বেড়ে উঠতে লাগলেন মা হাজেরার পরম প্রেমে, যত্নে ও একান্ত শিক্ষায়।

৯ অথবা ১০ বছর বয়স হবে তখন ইসমাইলের। হযরত ইব্রাহীম (আ.) স্বপ্নে দেখলেন, আল্লাহ তাকে তার সবচেয়ে প্রিয় বস্তু কোরবানী করতে বলছেন। ইব্রাহীম (আ.) স্বপ্নের ইঙ্গিত বুঝতে পারলেন। বুঝতে পারলেন, ইসমাইল যেহেতু তার সবচেয়ে প্রিয় সূতরাং তাকেই কোরবানী করার নির্দেশ এসেছে। ইব্রাহীম (আ.) থাকতেন কেনানে। সেখান থেকে মক্কায় এলেন। হাজেরা এবং ইসমাইলকে দেখে তিনি খুবই খুশি হলেন। খুশি হলেন তাদের ঘরবাড়ি দেখে। তারপর একসময় ইসমাইলকে নিয়ে বেড়াতে বের হলেন। একথা সে কথা কতো রকম কথা হলো দু'জনের মধ্যে। কথা হলো- আল্লাহ কোরবানী করার যে নির্দেশ দিয়েছেন তা নিয়েও।

ঐ বয়সেই ইসমাইল তার মা হাজেরার কাছ থেকে যে শিক্ষা পেয়েছিলেন সে শিক্ষা হলো আল্লাহকে সবচেয়ে ভয় করার শিক্ষা, সবচেয়ে ভালোবাসার শিক্ষা এবং আক্বা-আম্মার প্রতি শতহীন শ্রদ্ধা রাখার শিক্ষা। তাই তাঁকে আল্লাহর নির্দেশ কোরবানী করার কথা বলার সাথে সাথেই বলে উঠলেন : ‘আল্লাহ যা হুকুম করেছেন তা-ই করুন আক্বা। ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে ধৈর্যধারণকারী হিসেবে পাবেন।’

কি আশ্চর্য ব্যাপার, ইসমাইলের সম্মতি পাবার পর ইব্রাহীম (আ.) পরম প্রিয় সন্তান ইসমাইলকেই বললেন ছুরি আনার জন্য।

ইসমাইল বুদ্ধি করে ছুরির সাথে দড়িও নিয়ে এলেন। এবার পিতা এবং পুত্র চললেন সাবির পাহাড়ের দিকে। পথে মানুষের চেহারা ধারণ করে শয়তান এসে ইব্রাহীম (আ.)-কে বলল : “নিশ্চয়ই স্বপ্নে আপনি যা দেখেছেন তা শয়তানই আপনাকে দেখিয়েছে এবং দেখিয়েছে যে, আপনার ছেলেকেই জবাই করতে হবে। এটা কোনো দিন হয়। এ কাজ শয়তানই কেবল করতে পারে।’ ইব্রাহীম (আ.) শয়তানকে চিনতে পেরে ভীষণ রকম রেগে গেলেন এবং পাথর ছুঁড়ে মারলেন। সেই সঙ্গে চিৎকার করে বলে উঠলেন : ‘দূর হয়ে যা শয়তান কোথাকার। মানুষের আন্ত দুশমন দূর হ।’ জাতির পিতা ইব্রাহীম (আ.)-এর কাছে পাস্তা না পেয়ে শয়তান ছোট ভেবে পিছু নিল ইসমাইলের এবং বলল : ‘জানো খোকামণি, তোমার আক্বার কাছে শুনলাম, আল্লাহ নাকি তাঁর ওপর তোমাকে হত্যা করার দায়িত্ব দিয়েছেন। যন্তো সব আজগুবি কথা।’

বুদ্ধিমান-মেধাবী ইসমাইল মুক্তকণ্ঠে বলে উঠলেন : ‘আল্লাহ যা চান তাই হবে, তাতে তোর কি? তুই দূর হয়ে যা।’

ইসমাইলের কাছেও সুবিধা করতে পারল না শয়তান। শেষমেশ হাজেরার কাছে গিয়ে বলল : ‘শুনছো ইসমাইলের মা, সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে, তোমার ছেলেকে কিন্তু হত্যা করার জন্য সাবির পাহাড়ের দিকে নিয়ে যাচ্ছে ইব্রাহীম।’

নির্ধায় তিনি বলে উঠলেন : ‘তা কখনই হতে পারে না। খুবই ভালোবাসেন তিনি তাকে।’ কিন্তু ইব্রাহীম তো বলছে: ‘আল্লাহই নাকি তাঁকে কোরবানী করার জন্য হুকুম করেছেন।’

হাজেরা (আ.) বললেন : ‘তাহলে আল্লাহর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।’ শয়তান সবার কাছেই পরাজিত হলো এবং হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো। প্রিয়তম সন্তান ইসমাইলকে সাথে করে ইব্রাহীম (আ.) উঠলেন সাবির পাহাড়ে। কোরবানী করার জন্য মানসিকভাবে তৈরী হয়েছেন আগেই। নির্দিষ্ট জায়গায়ও বেছে

নিয়েছেন। এখন শুধু ছুরি চালানোই বাকী। এমন সময় ইসমাইল বলে উঠলেন : 'আব্বা, আমি ছুরির সাথে দড়িও নিয়ে এসেছি। ঐ দড়ি দিয়ে আচ্ছা করে বেঁধে নিন আমাকে, তাহলে হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি করার সুযোগ পাবো না, আপনার গায়েও রক্ত লাগবে না। তাছাড়া আপনি আমাকে উপড় করে কোরবানী করুন। নয়তো আমার মুখের দিকে আপনার চোখ পড়লে মায়া লেগে যেতে পারে।'

তাই করলেন ইব্রাহীম (আ.)। এবার ছুরি চালানোর পালা। হঠাৎ অদৃশ্য থেকে আল্লাহর নির্দেশ ভেসে এলো : 'ইব্রাহীম, তুমি তোমার স্বপ্ন মোতাবিক সব কাজই করেছো। তাই ইসমাইলের পরিবর্তে দিলাম অন্য একটি বস্তু।' আল্লাহর নির্দেশ শুনেই চোখ খুলে দেখলেন, অদূরে দাঁড়িয়ে আছে নাদুস-নুদুস একটি দুম্বা।

তারপর খুলে দিলেন এক মহান পিতা তাঁর মহান পুত্রের বাঁধন এবং দু'জনে মিলেই কোরবানী করলেন আল্লাহর পাঠিয়ে দেয়া দুম্বাটিকে।

মানবজাতির চিরকল্যাণের জন্য ও সার্বিক কল্যাণের জন্য সেই সময় থেকে চালু হয়ে গেছে কোরবানী, কোরবানীর ঈদ, আল্লাহর রাহে সবকিছু ত্যাগ করার মহান উৎসব। ঈদুল আযহা উপলক্ষে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাই বলেছেন : 'ওরে হত্যা নয় আজ সত্যাহ্ব শক্তির উদ্বোধন।' অর্থাৎ অতীত দিনের সেই মহান ত্যাগের কথা স্মরণে করে আত্মশক্তিতে বলীয়ান হওয়া এবং আল্লাহ-জাতি-দেশ ও দ্বীনের জন্য ত্যাগের পথে ধাবিত হওয়াই মহান কোরবানীর আদর্শ।

একটি সাংস্কৃতিক কর্মসূচি গ্রহণ করার আগে

প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও বিশিষ্ট চিন্তাবিদ মরহুম ড. হাসান জামান ‘সমাজ সংস্কৃতি ও সাহিত্য’ গ্রন্থে সমাজ সংগঠন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন :

‘আমরা যদি আমাদের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ বাদ দিয়ে আমাদের সমাজ সংগঠন করতে অগ্রসর হই, তবে আগে চলার ধাপ্পা আমাদের পেছন দিকে টেনে নিয়ে যাবে; তা হবে গতির নামে বিকৃতি ও পরের ধনে পোদারি।’... সাংস্কৃতিক উন্নয়নে সহনশীলতা, ধৈর্য ও আত্মনির্ভরতা আমাদের বিকাশের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

আমাদের তমদ্দুন ও জীবনদর্শনের যোগসূত্র সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন ধারণা গঠনের ব্যাপারেও তিনি গুরুত্ব আরোপ করে বলেছিলেন :

‘অজ্ঞানতা, অশিক্ষা-কুশিক্ষার কুয়াশা আমাদের জীবন ও জীবনবোধের আসল রূপ সম্পর্কে একটা ঘোলাটে ভাব তৈরি করেছে; তাছাড়া ইসলামী সমাজও আমাদের দেশে এতোদিন কয়েম হয়নি। কাজেই সাহিত্য, তমদ্দুন ও সমাজের সঙ্গে আমাদের জীবন দর্শনের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ যোগসূত্র সম্পর্কে স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন ধারণা গঠনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে অপরিসীম।’

সাংস্কৃতিক কার্যক্রমকে সুষ্ঠু পরিকল্পনার ভিত্তিতে এগিয়ে নেবার ক্ষেত্রে উল্লিখিত উদ্ধৃতি অনুপ্রেরণাবহ, সন্দেহ নেই।

কলা বাহুল্য, গত কয়েক দশকে আমাদের মূল্যবোধ ও শিক্ষাব্যবস্থার যে ব্যাপক অধঃপতন ঘটেছে তা আমাদের জাতির ভবিষ্যতকে এক ভয়াবহ শূন্যতার সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে। আমাদের জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই আজ অশিক্ষা ও নৈরাজ্যের শিকার। এই অশিক্ষা ও নৈরাজ্যের অর্থাৎ সর্বৈব শূন্যতার আশু মোকাবেলা না করলে আমাদের দেশ ও সংস্কৃতি সম্পূর্ণ অভিভাবকহীন অরাজকতার মধ্যে অচিরেই বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে বলে ধরে নেয়া যায়।

সুতরাং একটি দুঃখজনক অঙ্ককারকে প্রতিবাদহীনভাবে মেনে নেয়া শুধু অন্যায় নয়, অপরাধও।

‘মানুষ বাঁচে না, সে কিছু বাঁচিয়েও রাখে, তার বেঁচে থাকার রূপময়তা এবং বাঁচিয়ে রাখার ফলশ্রুতি নিয়েই গড়ে ওঠে সংস্কৃতি। দীর্ঘদিনের জীবনচর্চার নিয়ম ও জীবনচর্চার ফসল একত্রিত হয়ে সাংস্কৃতিক বুনিন্দা নির্মিত হয়। মানুষের

স্বাধীন সত্তা তার সাংস্কৃতিক তৎপরতার মধ্য দিয়েই প্রতিফলিত হয়। নিজস্ব সাংস্কৃতিক সত্তা বজায় রেখে চলতে না পারলে জাতীয় অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। জাতি হিসেবে টিকে থাকা যায় না। আর জাতি হিসেবে টিকে থাকতে না পারলে দেশ থাকে না, দেশের স্বাধীনতা থাকে না।’

সত্যিকার অর্থে, সাংস্কৃতিক বিজয় ছাড়া রাজনৈতিক ও সামরিক বিজয়ও ক্ষণস্থায়ী হয়ে পড়ে। বাংলাদেশে যদি আমরা মুসলমানদের স্বাভাবিক বজায় রেখে ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় বিকশিত হতে চাই তাহলে আমাদেরও অবশ্যই অচলায়তনের দ্বার ভেঙে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে উচ্ছল হতে হবে।

আজকাল আমরা প্রায়ই অপসংস্কৃতির কথা শুনে থাকি। অপসংস্কৃতির জয়-জয়কারে আমরা এখন ভীত ও আতঙ্কিত। সুস্থ ও নিরাপদ জীবনযাপন এখন আমাদের কাছে আকাঙ্ক্ষার বিষয়। কিন্তু আমরা কি কখনো ভেবে দেখেছি কেনো সমাজের অপসংস্কৃতি ও অসুস্থতার আবির্ভাব? আসলে সমাজে যদি সুস্থ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড জোরদার হতো এবং পত্র-পল্লবে বিকশিত হতো, তাহলে অপসংস্কৃতির বদলে সুস্থ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের স্পন্দনে আমাদের মন-মানস ও সমাজ হতো স্পন্দিত। পৃথিবীতে কোনো কিছুই শূন্য থাকে না। পৃথিবীর যে কোনো অঙ্গনেই, ভালো বা মন্দ এ দুয়ের যে কোনো একটি আসন গেড়ে বসবেই। এ দৃষ্টিভঙ্গিতে এখন আমাদের অপসংস্কৃতির সয়লাবে ভীত ও আতঙ্কিত না হয়ে সুস্থ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে উদ্বীণ হওয়া প্রয়োজন। মুসলিম জাহানের গৌরব ড. ইকবাল একদা বলেছিলেন : “শুধু অর্থনৈতিক সমস্যাই দেশের একমাত্র সমস্যা নয়। সাংস্কৃতিক সমস্যা মুসলিমদের পক্ষে আরো বেশী গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রশ্ন অর্থনৈতিক সমস্যা থেকে কোনোক্রমেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।”

১৯৩২ সালের ২১ মার্চে এক বক্তৃতায় তিনি আরও স্পষ্ট করে বলেছিলেন : ‘আমি সবগুলো বড় বড় শহরে সাংস্কৃতিক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব করি।’ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামও চট্টগ্রামের এক সম্বর্ধনা সভায় আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন :

“আমাদের ইসলামাবাদ [চট্টগ্রাম] হোক ওরিয়েন্টাল কালচারের পীঠস্থান আরাফাত ময়দান। দেশ-বিদেশের তীর্থযাত্রীরা এসে এখানে ভীড় করুক।” ব্যাপকতর একটি পরিকল্পনা, একটি প্রস্তাবনা, একটি কর্মসূচি গ্রহণ করবার আগেভাগে অবশ্যই আমাদের উল্লিখিত বক্তব্য গভীরভাবে অনুধাবন করার চেষ্টা করতে হবে।

কিশোরকণ্ঠ সাহিত্য পুরস্কার কেন

বাংলাদেশে শিশু-কিশোর সাহিত্য পত্রিকা খুব যে কম প্রকাশিত হচ্ছিলো, তা নয় এবং সে-সব পত্রিকার মানও যে, খুব খারাপ ছিলো, তাও নয়। কিন্তু ঐ যে, কবি ফররুখ আহমদ যেমন করে ডাক দিয়েছিলেন, সরাসরি, রাখ-ঢাক না-করে:

আমরা সকল দেশের শিশু যাবো

নবীর মদিনায়

আয় আয় আয় তোরা

সঙ্গে যাবি আয়...

ঠিক ঐ রকম করে, সরাসরি, রাখ-ঢাক না করে, নির্দিষ্ট মঞ্জিলের দিকে ডাকার মত কোনো পত্রিকা সত্যিই ছিলো না। মূলত কিশোরকণ্ঠ প্রকাশিত হবার মধ্য দিয়ে ঐ শূন্যতারই পূরণ হলো।

কিশোরকণ্ঠ প্রকাশিত হলো তো, সারা দেশের অভিভাবকরা পুলকিত হলেন এই ভেবে যে, যাক, বহুকাল পরে হলোও পড়বার মতো, পড়বার মতো অন্তত একটি পত্রিকা নিয়মিতভাবে ছেলেমেয়েদের হাতে তুলে দেয়া যাবে। আর শিশুকিশোররা আনন্দিত হলো এই ভেবে যে, তারা যা-যা চায়, তার প্রায় সবই তো কিশোরকণ্ঠে আছে।

সত্যি কথা বলতে কি, কিশোরকণ্ঠ হচ্ছে, সচেতন জনগণের দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষার ফসল এবং কিশোরকণ্ঠ হচ্ছে, পুষ্পের মতো পবিত্র শিশু-কিশোরদের বহুকালের দাবি-দাওয়ার একান্ত ফল্গফল। তাই যদি না-হবে, তাহলে, দেখতে-দেখতে কিশোরকণ্ঠের প্রচার রেকর্ড সৃষ্টি করতে পারতো না; সৃষ্টি করতে পাবতো না-শিশু-কিশোর পত্রিকার জগতে বিন্ময়!

বাংলাদেশে এমন কোন গ্রাম আছে, যেখানে কিশোরকণ্ঠ পড়া হচ্ছে না! এমন কোনো মহল্লা আছে যেখানে কিশোরকণ্ঠ পৌছে যায়নি। নিঃসন্দেহে এ-রকমটি হবার পেছনে কারণ একটাই- তা হলো কিশোরকণ্ঠের আদর্শনিষ্ঠা।

কিশোরকণ্ঠে আদর্শনিষ্ঠা আছে বলে, কিশোরকণ্ঠের দেশপ্রেম আছে, মানুষ গড়ার পরিকল্পনা আছে।

দুই.

বহুত কিশোরকণ্ঠ প্রকাশনার সাথে যারা জড়িয়ে আছেন, সবাই আদর্শের জন্যে, মানুষের জন্যে এবং দেশের জন্যে সব-সবকিছু উৎসর্গ করার অঙ্গীকার নিয়ে তৈরি হয়ে আছেন বলেই, শিশুকিশোরদের মানসগঠনের বিষয়টিকে তাঁরা প্রাধান্য দিতে পেরেছিলেন। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, নানাবিধ সামাজিক ব্যাধি এবং অপসংস্কৃতির ছোবল থেকে শিশু-কিশোরদের বাঁচাতে না-পারলে-এ জাতিকে, এ দেশকে বাঁচানো যাবে না। সুতরাং মানুষ গঠনের হাতিয়ার হিসেবে, যে কোনো মূল্যে কিশোরকণ্ঠকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তাঁরা আরো বুঝেছিলেন যে, কিশোরকণ্ঠকে এগিয়ে নেয়ার অর্থ হলো- সারা দেশের শিশু-কিশোরদের এগিয়ে দেয়া, অসংখ্য দায়িত্বশীল লেখক-লেখিকাকে নেয়া, সর্বোপরি সাংস্কৃতিক আত্মসনবিরোধী একটি নীরব আন্দোলনকে এগিয়ে দেয়া।

কিশোরকণ্ঠ কর্তৃপক্ষ তাই প্রথম থেকেই ঔদার্যের পন্থা অবলম্বন করেছেন:

ক. দলমত নির্বিশেষে সমস্ত শিশু-সাহিত্যিকের লেখা সংগ্রহ করেছেন এবং প্রকাশ করেছেন এবং তাঁদের লেখার সম্মানীও দিয়েছেন।

খ. তরুণ লেখকদের ব্যাপারেও ঐ একই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। বরং তরুণদের একটু বেশি যত্ন করেছেন।

গ. একদল শিশু-কিশোর যাতে, শুরু থেকেই লেখক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে, সে-ব্যাপারে একান্তভাবে সতর্ক থেকেছেন।

ঘ. কিশোরকণ্ঠে প্রকাশিত সমস্ত গল্পগুলো বাছাই করে সংকলন করেছেন, কিশোরকণ্ঠ গল্পসমগ্র নামে এবং প্রকাশিত সকল উপন্যাস একত্রিত করে উপন্যাসসমগ্র প্রকাশ করেছেন।

ঙ. বড় আকারে বিশেষ বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছেন।

চ. সম্পাদনার ক্ষেত্রে স্বনামখ্যাত কবিদের এবং সাহিত্যিকদের কাজে লাগিয়েছেন এবং কাজে লাগিয়েছেন প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের।

ছ. কিশোরকণ্ঠের সাথে জড়িত ঢাকার লেখক-লেখিকাদের প্রতিবছর রমজান মাসে সমবেত করেছেন এবং তাঁদের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়েছেন।

বলা বাহুল্য, কিশোরকণ্ঠ কর্তৃপক্ষের বহুবিধ ঔদার্যের মাত্র কয়েকটি এখানে উল্লেখ করলাম। বহুত কিশোরকণ্ঠ কর্তৃপক্ষের ঐতিহাসিক উদারতা হচ্ছে- 'কিশোরকণ্ঠ সাহিত্য পুরস্কার ২০০২'।

তিন.

কিশোরকণ্ঠ সাহিত্য পুরস্কার ২০০২ ঐতিহাসিক গুরুত্বের দাবি রাখে এই কারণে যে,

১. এতবড় উদ্যোগ আগে কখনো অন্য কোনো শিশু-কিশোর পত্রিকা গ্রহণ করতে পারেনি।
২. কিশোরকণ্ঠ সাহিত্য পুরস্কার ২০০২ প্রদানের জন্যে যে-সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে, সে-সাহিত্য সম্মেলনও ঐতিহাসিক। কেননা, কোনো পুরস্কার প্রদানের জন্য এতবড় শিশু-কিশোর সাহিত্য সম্মেলনও আগে কেউ করেনি।
৩. বাংলাদেশে এই প্রথম এমন কয়েকজনকে কিশোরকণ্ঠ সাহিত্য পুরস্কার প্রদানের জন্যে বেছে নেয়া হয়েছে; যারা সত্যিকার অর্থেই শিশু-কিশোরদের জীবন-গঠনের জন্যে অনবরত কাজ করেছেন এবং যাদের লেখা আলোর সহযাত্রী হবার জন্যে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করে। উদ্বুদ্ধ করে সত্যের উন্মুক্ত পতাকা হবার জন্য এবং যারা কেউই সাহিত্য পুরস্কারের প্রত্যাশী নন। মূলত যারা নিঃস্বার্থভাবে একটি মহান আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্যে অর্থাৎ আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠান জন্যে কলমকে বানিয়েছেন সর্বস্বশী হাতিয়ার।
৪. আর রসূলে খোদা (সা.) সাহাবী-কবিদের পুরস্কার প্রদান করতেন- সেই ধারার বলিষ্ঠ অনুসরণ শুরু হলো কিশোরকণ্ঠের পক্ষ থেকে।

চার.

কিশোরকণ্ঠ সাহিত্য পুরস্কার ২০০২ প্রদানের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে সং-লেখকদের উৎসাহিত করা। বস্তুত তাঁদেরকে এই কথা বলা যে-প্রকৃত অর্থে যারা শিশু-কিশোরদের সুন্দরের পথে পরিচালিত করার জন্যে, নিঃস্বার্থভাবে কাজ করেন তাঁরা একা নন, গোটা জাতি তাঁদের পেছনে আছে।

ঐ নিঃস্বার্থ লেখকদের কেউ স্বীকৃতি দিক আর না-দিক, গোটা জাতি স্বীকৃতি দেবে-এ কথাও বলা।

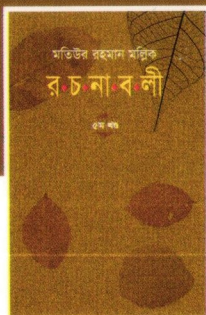
এবং এ কথাও বলা যে, কিশোরকণ্ঠ সাহিত্য পুরস্কার ২০০২ যারা পেলেন, ঠিক তাঁদের আদর্শ অনুসরণ করে, অন্যান্য যারাই এগিয়ে আসবেন, তাঁদের জন্যও কিশোরকণ্ঠ সাহিত্য পুরস্কার অপেক্ষা করছে। কিশোরকণ্ঠ সাহিত্য পুরস্কার ২০০২ প্রদানের একটি ঐতিহাসিক মুহূর্তে তাই কামনা:

তোমার পতাকা যারে দাও

তারে বহিবারে দাও শকতি;

তোমার সেবার মহান দুঃখ

তারে সহিবারে দাও ভকতি।



Motiur Rahman Mollik
Rachanabali- 5th Part
Published on September 2024
Price: 620 Tk only



ISBN: 978-984-98985-3-5